কিন্নর মিথুন

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

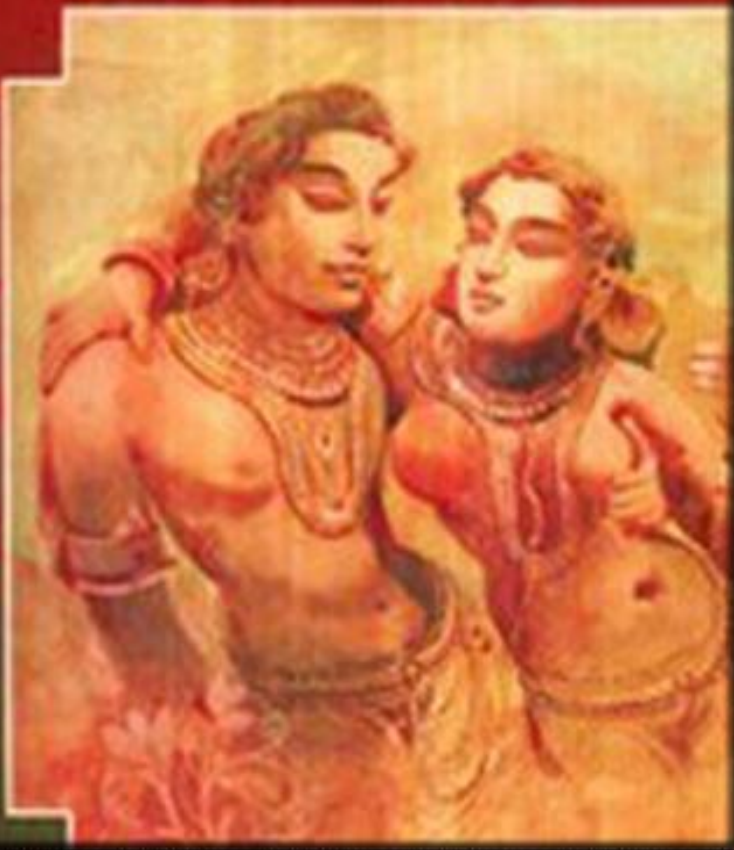

কিন্নর মিথুন

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬১

❑ প্রকাশক ❑
সমীরকুমার নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রক ❑
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

নগ্ন হৃদয়ে

আমি
আমার মত করে পেতে চেয়েছি তোমাকে,
তুমিও তোমার মত আমাকে,
আমাদের ভালবাসায়
আমরা হয়েছি সিক্ত
দহনে হয়েছি উদ্বুদ্ধ,
অশ্রুতে শুদ্ধ
মননে বিদগ্ধ।

এমন করে পরস্পরকে
পাওয়ার প্রান্ত কোথায় জানা নেই,
তবু
হাতে হাত দিয়ে অশেষ এই যাত্রায় আছে
দুজনায় দুজনকে নিখুঁতভাবে
নিত্য আবিষ্কারের একটা আনন্দ;
যেন পৃথিবীর প্রথম দুই নিরাভরণ নরনারী
নগ্ন-হৃদয়ে
মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে—
চোখের সামনে জ্বলছে ধ্রুবতারা।

দীপাঞ্জন বসু

এতে আছে

রাজার রাজা/১২
বীজের উৎস/৬৪
কিন্নরী/৭৮
কিন্নর মিথুন/১১০
ভালবাসার রসায়ন/১৮০

সৃষ্টির চালচিত্র

নর নারীর মিলনমূর্তি মিথুন।
কিন্নর-মিথুন কিন্নর কিন্নরীর যুগলমূর্তি।

বর্তমান হিমাচল প্রদেশ ভারতের অন্যতম একটি রাজ্য। তার অন্তর্গত দূর দুর্গম শৈল বেষ্টিত স্বপ্নের দেশ কিন্নর। এই কিন্নরভূমির বহুপ্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এর লোক কথা, বিচিত্র সমাজব্যবস্থা, এর উৎসব অনুষ্ঠান একেবারেই ভারতভূমির অন্যান্য প্রদেশের থেকে স্বতন্ত্র।

কিন্নর কৈলাস এবং ধৌলাধার পর্বত, এই দেবভূমিকে পরম সমাদরে ঘিরে রেখেছে। এর শ্যামল অরণ্যভূমি, সবুজ শস্যক্ষেত্র, খরস্রোতা নদ নদী এই সৌন্দর্যলোকের অনন্য সম্পদ।

কলেজে অধ্যাপনার সুযোগে সে সময় আমরা দুটো বড় ছুটি পেতাম। গরমের ছুটি থাকত দুমাসের ওপর আর পুজোর ছুটি প্রায় দেড় মাস।

এই ছুটিগুলোকে আমরা উপভোগ করতাম ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ভ্রমণের স্বাদ নিয়ে।

কিন্নর আমার যৌবনের বহু রত্নখচিত মণিমুকুট।

হিমাচল প্রদেশের এই অঞ্চলটিতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি মনের খুশিতে। আমি যখন কিন্নরে যাই তখন আজকের মত পথঘাট রাজ্যটির প্রায় সর্বত্র জাল বিস্তার করে নি। কখনও জিপ, অধিকাংশ সময় পায়ে হেঁটে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি। থাকার জায়গা সর্বত্র ছিল না, খাওয়ার ব্যবস্থাও তথৈবচ। প্রায়ই উঁচু পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর নিচে গড়িয়ে পড়ত। ভেঙে যেত চিহ্নিত সরু পথ, পাথরগুলো গড়িয়ে চলে যেত একেবারে নদী শতদ্রুতে।

কুলি কামিনরা প্রায় চব্বিশঘণ্টা নিযুক্ত থাকত পথ থেকে পাথর সরানোর কাজে। এরা ছোটো ছোটো ডেরা বেঁধে পাহাড়ের গায়ে রান্নাবান্না করত। কালো কালো খোসাসহ চানা সেদ্ধ, রুটি কিংবা ভাত। সঙ্গে প্রধান খাদ্য পেঁয়াজ। ভাতের ওপর যখন মাছি বসত তখন সাদাভাতের দানাগুলো আর চেনা যেত না। সেখানেই আমরা শালপাতা পেতে ভাত আর ওই ডাল পেঁয়াজ দিয়ে আহার সমাধা করতাম।

এমন দিন গেছে যখন মাথা গোঁজার জন্য ডাকবাংলোর দেখা পাইনি। তখন পাহাড়ি গুহায় ভেড়াচাবক পালসদের সঙ্গে আগুনের ওম নিতে নিতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছি। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

খল খল খুশিতে ছুটে চলা বাসপা কিংবা শতদ্রুর গান শুনেছি নিরন্তর।

তুষারশুভ্র ধৌলাধার কিংবা উল্টোদিকে কিন্নর কৈলাসের রূপ দেখেছি পরম বিস্ময়ে। সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের শোভাও অভাবনীয়। পাহাড়ের কোলে নদীতীর বরাবর সবুজ অরণ্যের অপরূপ মহিমা। কিছুদূরে দেখা যেত গোলাকার বৃহৎ চৈত্যগুলি। নীল আকাশের নিচে শুভ্র বৌদ্ধস্তূপগুলি অন্তরে এক প্রশান্তির সৃষ্টি করত।

কিন্নরে অবস্থান কালে আমি দুটি উৎসব দেখেছি। তার ভেতর প্রধান উৎসবটি ছিল ইউ-খিয়াং বা ফুলেচ উৎসব। শুধু ফুল নিয়ে এমন একটি প্রেমের উৎসব সারা ভারত ভ্রমণকালে কোথাও দেখিনি। কিন্নরের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন তারিখে এই উৎসব সম্পন্ন হয় ভাদ্রমাসে, কোথাও দুদিন কোথাও বা তিনদিন। ইংরাজি অগাস্ট সেপ্টেম্বর এই উৎসবের কাল। সাংলায় অবস্থান কালে এই উৎসব আমি দেখেছি প্রাণভরে।

এই সাংলারই কামরু পাহাড়ে রামপুর বুশেহারের রাজার একটি সুউচ্চ কাঠের দুর্গ আছে। সেই পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে একটি তিনতলা কাঠের বাড়ি আছে, সেটি দুদান বা প্রধান মন্ত্রীর পরিবারের।

সম্পূর্ণ অচেনা সাংলা অঞ্চলে প্রবেশের মুখে আমাদের জিপ খারাপ হয়ে যায়। ওই সঙ্কীর্ণ পথে পেছনের জিপটি আর এগোতে পারে না। সেই সময়ে যিনি পরিত্রাতার ভূমিকায় আমাদের জিপের সামনে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি একজন বিংশতিবর্ষীয়া কুমারী কন্যা। অতি সুদর্শনা এই কিন্নরী কন্যাটির পরণে কিন্নর দেশীয় পোশাক ছিল না। পরণে ছিল সাহেবী কোট প্যান্ট।

পরে জেনেছিলাম ওর বাবা কর্মসূত্রে মেয়েদের নিয়ে পাঞ্জাবে চলে যান। সেখানে তিনি ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তাই মেয়েরাও সাহেবী আদব কায়দায় রপ্ত। মেয়েটি পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ.।

মেয়েটির আর একটি পরিচয়, বুশেহারের মহারাজের প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের কন্যাও সে। সাংলার কামরু পাহাড়ের দুদানদের বিরাট বাড়ির এক বিশাল অংশে থাকে ওরা। যেখানেই থাক ওরা ইউ-খিয়াং উৎসবের সময় দেশের বাড়িতে আসবেই আসবে।

মেয়েটি সেদিন জিপের ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে জিপটাকে সারিয়ে দিল।

সেই প্রথম সুনীলা নেগীর সঙ্গে আমার পরিচয়।

তার কামরুর বাড়িতে আমি গেছি, চমরি গাইয়ের ঘন দুধ মেশানো চা খেয়েছি। তার ততোধিক অপরূপা ছোটবোন চঞ্চল হরিণীর মত সুন্দর চপল নীলমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে দিদির আগেই সাংলায় নিজবাড়িতে এসে গিয়েছিল। তাই প্রথমেই তাকে কিন্নরীদের পোশাক আর অলংকারে সুসজ্জিতা দেখেছিলাম।

সুনীলার মায়ের আপ্যায়ন ভোলা যায় না। হলঘরের একটু দূরে দুতিনজন বয়স্ক মানুষকে আর্ম চেয়ারে বসে গড়গড়া টানতে দেখেছিলাম। পরে জেনেছিলাম ওরাও সুনীলার বাবা। যদিও জন্মদাতা পিতা তখন পাঞ্জাবে শাসনকাজে বিশেষভাবে ব্যাপৃত।

ওদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভাই মিলে একজন মেয়েকে বিয়ে করে। সকল সন্তানের বাবাই ওরা সকলে।

এই সমাজ বৈচিত্র্যের কথা আমি আমার কিন্নর নিয়ে লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলোতেও বলেছি।

বৌদ্ধ লামাদের পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি সুনীলা ওই অঞ্চলে দুটো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলে দিয়েছিল। তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতায় জেনেছিলাম, সে আর পাঞ্জাবে ফিরে যাবে না, এখানকার ছেলেমেয়েদের ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে।

আরও জেনেছিলাম, সব ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রথাটা সে মেনে নেবে না। বহুকালের প্রথাটাকে সে ভেঙে দেবে।

আমি এই কিন্নরকে নিয়ে তিনটি উপন্যাস লিখেছি। রাজার রাজা, কিন্নরী আর কিন্নর-মিথুন। পটভূমি এক হওয়ায় উৎসব কিংবা সমাজ ব্যবস্থায় বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আভ্যন্তরীণ ভাববস্তু সম্পূর্ণ পৃথক।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি কাহিনিমূলক কাব্য নাট্য, সেগুলোতেও বহু প্রাচীন রোমান্টিক গন্ধ মিশে আছে। মনে হবে কিন্নরের কল্পলোকের গন্ধ সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে।

কাব্যনাট্য দুটি কিন্তু সংগৃহীত হয়েছে মহাভারত থেকে।

কিন্নর একটি সংরক্ষিত এলাকা। এখানে যাবার সময় সিমলা থেকে আমরা পারমিট যোগাড় করেছিলাম। এখনও সম্ভবতঃ সেই ব্যবস্থাই আছে।

কৃষিকর্ম ছাড়া কিন্নরবাসীদের প্রধান উপজীবিকা মেষ-চারণ। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে মেষের জন্য একটি বড় ছাওনি নির্দিষ্ট থাকে। মেষের দুধ, মাংস, চামড়া ও উল কিন্নরবাসীদের অমূল্য সম্পদ।

পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে নদীর ধার বরাবর দেখা যায় পাল পাল মেষ চলেছে আর মেষ চারক পালসরা হাতের খচ বা ছড়ি তুলে মুখে চিতরং ধ্বনি তুলে মেষেদের পরিচালনা করছে। লোমওয়ালা কুত্তর ঘ্যাঁক ঘোঁক করে ভেড়াদের লাইন সোজা রাখছে।

সে এক আনন্দদায়ক শোভাযাত্রা। কোথাও বা যুবক যুবতীরা নাচছে দল বেঁধে। কিন্নর কণ্ঠের সুর ভেসে চলেছে হাওয়ায় ভর করে।

কোথাও বা বৌদ্ধগুম্ফার থেকে পথে উঠে আসছে লামা অথবা শ্রমণীরা।

এদের সবাইকে নিয়েই রচিত হয়েছে আমার উপন্যাসের কাহিনি।

সংকোচে আড়ষ্ট কিশোরটি তাঁদের পেছনে পেছনে নেমে গিয়ে সামনের চাতালে বসল।

ভিক্ষুণীরা তাঁদের যে যার কুটিরে চলে গেলেন।

পেছনে পায়ের সাড়া পেয়ে কিশোর পালসটি ফিরে তাকাল।

যাঁর হাতে দুধের পাত্রটি তুলে দিয়েছিল তিনি শূন্যপাত্রটি নিয়ে ছেলেটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গলার স্বরে করুণা নাকি অপার স্নেহ তা বোঝা গেল না। তিনি বললেন, তুমি কোথা থেকে নিয়ে এলে এ দুধ?

আমি ভেড়, বক্‌রি চরাই, আমার নিজের বক্‌রির দুধ।

কোথায় থাকো তুমি?

ওই বাস্‌পা নদীর ঝুলা পেরিয়ে ওপারে যে পাহাড়, তারই একটা গুহায় আমি থাকি। এ সময় আমার নিচে থাকার কথা নয়, ভেড়-বক্‌রি নিয়ে এর অনেক আগেই আমার ওপরের পর্বতে বুগিয়ালে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমার এক বুড়ি দাদি বিমারে পড়ে গিয়েছিল তাই ঠিক সময়ে যেতে পারিনি। আগামীকাল পাহাড়ে উঠব। তার আগে প্রভুকে দুধটুকু নিবেদন করে গেলাম।

ভিক্ষুণী দশ টাকার একখানি নোট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার দেওয়া দুধ প্রভুকে নিবেদন করেছি, এ টাকাটা তুমি নিয়ে যাও।

কিশোর বলল, আমি দুধ বেচতে আসিনি মা, প্রভুর সেবার জন্য নিয়ে এসেছিলাম।

ভিক্ষুণী বললেন, এটুকু বাজারে বেচলে তুমি অনেক পয়সা পেতে। তোমারও তো অনেক পয়সার দরকার হয়, তাই মনে কর তোমাকে মিঠাই খাওয়ার জন্য এই টাকাটুকু দিলাম।

ছেলেটি তখনও গোঁ ধরে বলল, টাকা আমি নেব না। যদি প্রভুর সামান্য কিছু প্রসাদ থাকে তাই দিন আমাকে।

বলা শেষ হতে না হতেই একটি রেকাবিতে কিছু ফল আর মিষ্টি নিয়ে এক ভিক্ষুণী এসে দাঁড়ালেন।

তুমি এটুকু খেয়ে নাও।

ছেলেটি প্রসাদের পাত্র মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদটুকু খেয়ে নিল, তারপর পাশেই একটা ঝোরা দেখে এঁটো রেকাবিটা ধোওয়ার জন্য পা বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে প্রথম ভিক্ষুণী রেকাবিটা টেনে নিয়ে বললেন, তুমি ওখানে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, এটা তোমাকে ধুতে হবে না।

যিনি প্রসাদ নিয়ে এসেছিলেন তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

প্রথম ভিক্ষুণী কিন্তু কিশোরটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত নড়তে পারলেন না। তাঁর চোখে তখন একটা বিস্ময়ের ঘোর,—এ কার মুখ দেখছেন তিনি! কিন্নরের নারী-পুরুষ প্রায় সকলেই সুদর্শন কিন্তু একজন সামান্য পালসের মুখের আদল কী করে এত সুন্দর হয়!

কিশোরটি যাওয়ার সময় বলল, ওপরে ভেড় চরানোর পাট চুকলে শীতের সময় নিচে নেমে তোমাকে দেখে যাব মা।

মা শব্দটি শুনে শ্রমণীর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল, ছলছলিয়ে উঠল দুটো চোখ। তিনি দুহাতের পাতায় ছেলেটির মুখখানা চেপে ধরে তার মাথায় চুম্বন করলেন।

ছেলেটি শ্রমণীকে প্রণাম জানিয়ে বাস্‌পা নদীর তীর লক্ষ্য করে চলে গেল।

দুই

পাহাড়ের ঢালে কেলুগাছের তলায় একটা ঝোপড়ি। এই দেওদার গাছটি বহুকালের পুরানো।

স্লেটপাথর দিয়ে ছাওয়া ঝোপড়িটি বিশাল গাছের গুঁড়িতে যেন ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা ঝরনা, তার জল ব্যবহার করেন ঝোপড়ির একমাত্র বাসিন্দা সুরজ সিং-এর বউ কুশলা।

কুশলা এখন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন। স্বামীর মারা যাওয়ার পর তাঁর জীবনে ঘটে গেছে বহু বিপর্যয়। তাঁর মুখের প্রতিটি রেখায় যেন সেই বিপর্যয়ের ছাপ।

যৌবনে সুরজ সিং কিন্নর থেকে কাজের সন্ধানে সিমলা চলে গিয়েছিলেন। সিমলা ছিল গভর্নর জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস। পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে ছোট-বড় অজস্র বাড়ি পাহাড়ি গাছপালার ভেতর ইন্দ্রপুরীর মতো সেজে উঠেছিল।

নতুন নতুন পথঘাট আর সরকারি অফিস কাছারিতে এই গ্রীষ্মাবাসটি সাময়িকভাবে রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল।

তখন ইংরেজ শাসকরা শাসনকার্যের সুবিধের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা শিক্ষা করত। কিন্নরের জন্য নিযুক্ত এক ইংরেজ অফিসার কিন্নৌরি ভাষা শেখার জন্য উপযুক্ত কোনও কিন্নরবাসীর সন্ধান করছিলেন। সে সময় সুরজ সিং-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়ে যায়। সুরজ সিং সাহেবকে তাঁদের অঞ্চলের ভাষা শেখাতে থাকেন। এতে কিন্নরবাসী সুরজের আশাতীত অর্থাগম হতে থাকে।

সিমলায় থাকতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সুরজ সিংয়ের পরিচয় ঘটে।

সুরজ সারা সিমলা শহর পরিক্রমা করে খ্রিস্টানদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি দেখে বেড়াতেন। এই সময় তাঁর নিজের এলাকায় আধুনিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত স্কুল প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগে।

কিছুকাল পরে কিন্নর অঞ্চলের জন্য ভারপ্রাপ্ত সাহেবটি নিজ দেশে চলে যান।

সাহেবের বড় ভালো লেগে গিয়েছিল উদ্যমী, কর্তব্যনিষ্ঠ এই মানুষটিকে।

যাওয়ার আগে পিটার হেপবার্ন বললেন, লন্ডন থেকে জরুরি ডাক পেয়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে পণ্ডিত। আমি তোমার কাছ থেকে একটা নতুন ভাষা শিখলাম। তাই দেশে ফেরার আগে তোমাকে কিছু দিয়ে যেতে আমার মন চাইছে সিংজি।

সুরজ বললেন, আপনার এই ভাষা শিক্ষা তো কোনও কাজে লাগল না মিস্টার হেপবার্ন। এ অবস্থায় আপনার দান আমি কী করে গ্রহণ করতে পারি সাহেব।

কী বলছ সিংজি! আমি একটা অঞ্চলের ভাষা শিখলাম, এ তো আমার জীবনের একটা সঞ্চয়। আর তোমার জন্যেই আমি এই অমূল্য বস্তু লাভ করলাম, তাই তোমাকে কিছু দিতে পারলে আমি মনে বড় শান্তি পাব।

সুরজ বললেন, আপনি যদি আমাকে কিছু দিয়ে তৃপ্তি পান তাহলে আমার আপত্তি করার কিছু নেই।

এবার সাহেব চিন্তা করে বললেন, বল কত অর্থ পেলে তুমি দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দে তোমার সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে? ফলের বাগিচা, কিংবা চাষের জমি কিনে ফসল ফলাতে পার তুমি। নতুন কোনও দোকানও খুলতে পার। যে কোনও ব্যবসার জন্য আমি থোক একটা টাকা তোমাকে দিতে চাই।

বড় নির্লোভ মানুষ ছিলেন সুরজ সিং। তিনি বললেন, আমার সংসারের চাহিদা বড় কম। একটা ছোট্ট বাড়ি, সংলগ্ন একটুকরো খেতিও আছে আমার। স্ত্রী ভালো পোশাক তৈরি করতে পারেন। হাটে-বাজারে বিক্রি হয় সেসব পোশাক। তাতেই আমার ছোট্ট সংসার চলে যায়।

এই সিমলাতে এসে আমার চোখ খুলে গিয়েছে সাহেব। এখানে কত সুন্দর সুন্দর স্কুল রয়েছে, ছেলেমেয়েরা সেইসব স্কুলে পড়াশুনো করে কত কিছু শিখছে। আমার বড় কষ্ট হয় যখন দেখি, কিন্নরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনোর কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। যাদের অর্থ আছে, তাদের বাড়ির দু-চারজন ছেলেমেয়ে লামাদের কাছে তিব্বতি ভাষা শেখে। আমি কি সাহেব একটা ইংরেজি স্কুল আমাদের অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে পারি? আমি সঠিক জানি না, এ কাজে কত অর্থ লাগে।

এই নিঃস্বার্থ মানুষটির দিকে তাকিয়ে অভিভূত হলেন সাহেব। বললেন, তুমি সিমলাতে থেকে বেশ ভালো ইংরেজি শিখেছ। তাছাড়া এখানে আমার অফিসে সৎ যে দু-চারটি কিন্নরের যুবক কাজ করে তাদের নিয়ে গিয়ে তুমি একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা কর। এর জন্য যত অর্থ দরকার হবে তা আমি তোমাকে দেব। এখন একটা ভালো অ্যামাউন্ট আমি দিয়ে যাচ্ছি, জমি কিনে স্কুল শুরু করে দাও। স্কুলের সামনে থাকবে একটা ফলের বাগান, তার পাশে সবজির খেত। অবসর সময়ে ওখানে খেলার ছলে ছেলেরা বাগান আর সবজির খেতে কাজ করবে। ওই বাগান থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে তোমরা স্কুলের জন্য একটা ফান্ড তৈরি করবে। স্কুলের রোজকার খরচ-খরচা চলবে ওই ফান্ডের টাকা থেকে।

আমি যেখানেই থাকি প্রতিমাসে কিছু কিছু টাকা তোমাদের পাঠিয়ে যাব। তোমাদের স্কুল ফান্ডে ওই টাকা জমা রাখবে। ওর থেকে টিচারদের মাইনে হয়ে যাবে। পরে আমি থোক একটা টাকা পাঠাব, সেই টাকায় দূরের ছেলেমেয়েদের থাকার জন্য পাশাপাশি দুটো বোর্ডিং-হাউস তৈরি করবে।

সুরজ সিংয়ের হাতে এককালীন বহু অর্থ দিয়ে সাহেব দেশে ফিরে গেলেন।

সেই অর্থে সাহেবের পরিকল্পনামতো স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন সুরজ সিং। পাশাপাশি দুটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল,—একটি ছেলে আর অন্যটি মেয়েদের জন্য। সেইসঙ্গে দুটি বোর্ডিং-হাউসও তৈরি হল। মহা উৎসাহে মাস্টারমশায়রা পড়াতে শুরু করে দিলেন। চারদিকে যেন একটা আলোর জোয়ার বয়ে চলল।

সুরজ সিং-এর ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে নিলম। প্রতিটি ক্লাসে সে প্রথম হয়ে উঠতে লাগল। সাহিত্য ছাড়া অঙ্ক, ইংরেজি, ভূগোল সবই ইংরেজি মাধ্যমে শিখল সে। কেবল মাতৃভাষায় গল্প কবিতা ইত্যাদি পড়তে হত তাদের। তাছাড়া ইংরেজি গল্পের বইও পড়ত তারা।

সিমলা থেকে কিন্নর যাওয়া-আসা করতে হত সুরজকে। সিমলার স্কুলগুলোর সঙ্গে তাকে যোগাযোগ রেখে চলতে হত।

যাওয়া-আসার পথ সেসব দিনে বড় দুর্গম ছিল। পাহাড়ি উঁচুনিচু পথ কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও বা পায়ে হেঁটে পার হতে হত। পরিশ্রমী মানুষটি নতুন নতুন স্কুল গড়ার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

একসময় সিমলা থেকে ফিরে আসছিলেন সুরজ সিং। শতদ্রুর তীর বরাবর টাট্টুতে আসার সময় ওপর থেকে পাহাড় ভেঙে পাথর বৃষ্টি শুরু হল। সেই আকস্মিক বিপর্যয়ে ক্ষত-বিক্ষত সুরজ সিং টাট্টু সমেত ছিটকে পড়লেন শতদ্রুতে। প্রবল স্রোতে লাট খেতে খেতে ভেসে চললেন তিনি। নদীর ওপারে খেতির কাজ করছিল যারা তারা চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখেও সুরজ সিংকে বাঁচাতে পারল না। একটি মহৎ প্রাণ এইভাবে শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু সুরজ সিং-এর শুভ কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত হল না। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সহকর্মীরা কিন্নরে শিক্ষাবিস্তারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

নিজের আর্থিক উন্নতির জন্য সুরজ সিং কখনও কোনও চেষ্টা করেননি, সেজন্য তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী কুশলা আর একমাত্র কন্যা নিলমকে পরিশ্রম করে সংসার চালাতে হত। এতে কোনও ক্ষোভ ছিল না তাদের মনে। সুরজ সিংয়ের জন্য তারা মনে মনে গর্ব অনুভব করত। স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুদান দিতে চাইলে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন কুশলা।

কিশোরী নিলম ছিল সাংলা তহশিলের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সে যেমন সুন্দরী তেমনই নাচে-গানে অত্যন্ত পারদর্শী। তাকে ছাড়া সামাজিক প্রায় কোনও উৎসবই সম্পন্ন হত না।

পুরাণে স্বর্গীয় নরনারীরূপে বর্ণিত হয়েছে কিন্নর-কিন্নরীর দল। কিন্নর দেশটা যেন দেবভূমি। একদিকে সুউচ্চ কিন্নর-কৈলাস, অন্যদিকে তুষারশুভ্র ধৌলাধার। খরস্রোতা শতদ্রু, বাস্‌পা নদীর জলধারায় সুস্নাত পাহাড়ি মৃত্তিকা। তাদের কোলজুড়ে সবুজ শ্যামল অরণ্যভূমি।

পথ চলতে দেখা যায় বৌদ্ধ গুম্ফা, হিন্দু মন্দির আর গৃহস্থের দেউল ছাট্‌কাং।

মন্দির ঘিরে বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগে আছে। প্রতি উৎসবে মন্দিরে চলে নাচ আর গান। মন্দির প্রাঙ্গণ,—সম্বৎ-এ যখন জ্যোৎস্না ঝরা রাতে কিন্নর-কিন্নরীদের নাচ-গান শুরু হয় তখন মনে হয় যেন দেবনর্তকীরা নেমে এসেছেন মর্ত্যভূমিতে। কিন্নরীদের সুরেলা কণ্ঠস্বর বাতাসে ভর করে উঠে চলেছে নীল নভস্থলি পেরিয়ে আনন্দমুখর ইন্দ্রলোকে। সেখানে সুরলোকে সভা সাজিয়ে দেবদেবীরা তন্ময় হয়ে শুনছেন সেই অমৃত-নিস্যন্দী, সুরধ্বনি।

এই কিন্নরীকুলের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করে কিশোরী নিলম।

পরনে মায়ের হাতে তৈরি কাজ করা অঙ্গবাস তাপ্ক-সে-দোরি, তার ওপর একটি সুচিত্রিত শাল,—তাপ্ক-সে-ছান্‌লি।

তিন

কিন্নর জুড়ে বারোমাসে কত যে পার্বণ তার লেখাজোখা নেই। প্রতিটি পার্বণেই নাচগানের সমারোহ।

চৈত্রে নবরাত্রির উৎসব চাত্রল। বৈশাখে বিশ। এই সময় নববর্ষের সূচনা। কিন্নরের কৃষকরা হলকর্ষণের সময় বলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ভূমিপূজা করে। জীবনধারণের উপাদানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই উৎসব। ফুল ছাড়া কোনও উৎসবই সম্পন্ন হয় না কিন্নরে। এ সময় খুবানির গাছ ভরে পিঙ্ক রঙের ফুলকলির সমারোহ। সেই ফুলই নিবেদন করা হয় দেবতার চরণে আর সেই ফুল খোঁপায় গুঁজে নাচে কিন্নর নর্তকীরা।

আষাঢ়ে কিন্নরবাসী নরনারী সাধারণত কোনও বৌদ্ধ মন্দিরের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করে। অথবা কিন্নর কৈলাস পর্বতে গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করে।

শ্রাবণে ডাখরেইন উৎসব শুরু হয়। এ সময় ঘরে ঘরে ভোজ্যবস্তুর প্রাচুর্য। আনন্দে মাতে কিন্নরবাসীরা। প্রত্যেক গ্রামদেবতাকে মন্দিরের বাইরে আনা হয়। তাঁর সামনে নাচগানের আসর বসে,—গ্রামের অধিবাসীরা সারাদিন তাঁকে ঘিরে মেতে থাকে।

ভাদ্রমাসের একটি উৎসব বুঝি সব উৎসবকে ছাড়িয়ে যায়। এ উৎসবে শুধুই ফুলের সমারোহ। তাই এ উৎসবের নাম ফুলেচ্ বা ইউখিয়াং। ইউ অর্থে ফুল আর খিয়াং অর্থে দেখা। অর্থাৎ ফুলের ভেতরের সৌন্দর্যটুকু দেখা।

এ সময় সারা গ্রামজুড়ে যেন মাতন লেগে যায়। বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা ঘরের শাসনের বাইরে আনন্দে মেতে ওঠে। নাচ-গান-হাসি-কৌতুকে কিন্নর তখন যৌবনের উপবন।

ভাদ্রের উনিশ তারিখে কিন্নরের প্রায় প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে যুবক বেরিয়ে চলে যায় পর্বতের সানুদেশে অরণ্যলোকে পুষ্প সংগ্রহের জন্য। তারা সারারাত ধরে তাদের ঝাঁপিতে রঙল, লোসকার্চ, খাসবল, গাল্‌চি ইত্যাদি দুর্লভ ফুল ভরে আনে।

মেলাপ্রাঙ্গণের একদিকে পাহাড়ের গুহায় তারা সেই ফুলের ঝাঁপি রেখে দেয়। সেই গুহাকে বলে উদাব্রো।

পুরোহিতরা দেববিগ্রহ নিয়ে আসে মেলায়। সেখানে উপস্থিত থাকেন রামপুর বুশেহারের মহারাজা।

পুরোহিত পুষ্পসংগ্রহকারীদের ঝাঁপি থেকে শ্রেষ্ঠ ফুল সংগ্রহ করে মহারাজের হাতে দেন। এরপর শুরু হয় পূজাপাঠ আর নাচগানের উৎসব। অনুষ্ঠান শেষে ফুল সংগ্রহকারী যুবকেরা তাদের ফুলের ঝাঁপিগুলি নিয়ে চলে যায়। সেই ফুলে তারা সাজায় তাদের ভালোবাসার জনকে।

পাহাড়ের ওপরে অরণ্যের ভেতরে কিন্নরবাসীরা এক একটি ছোট্ট কুঠি বানিয়ে রাখে। সেগুলোকে বলা হয় ডোগ্‌রি। এগুলি কিন্নরবাসীদের গ্রীষ্মাবাস। জ্যোৎস্নারাতে দেখা যেত আনন্দমগ্ন প্রেমিক-প্রেমিকা উৎসব প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সেইসব ডোগ্‌রিতে উপস্থিত হয়েছে। প্রেমিক যুবকটি নানারকম ফুলের অলংকার তৈরি করে সাজিয়ে তোলে তার প্রেমিকাকে। সেই বনদেবী তখন তার প্রেমিকের হাত ধরে আলোছায়ার আলপনা আঁকা বনের পথে গান গাইতে গাইতে হারিয়ে যায়। তাদের গানের স্বর্গীয় সুর ভেসে বেড়ায় আকাশে-বাতাসে।

এই ফুলের উৎসবের রাতেই ঘটনাটা ঘটল।

সে বছর বুশেহারের মহারাজ স্বয়ং এলেন সাংলায় ফুলেচ্ উৎসবে যোগ দিতে। মহারাজের সঙ্গে এসেছিল তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী যুবরাজ প্রীতম সিং। মহারাজ ছিলেন বাস্‌পা সংলগ্ন কামরু পাহাড়ের পঞ্চতল দুর্গে। কাষ্ঠ-নির্মিত এই সুদৃশ্য দুর্গটি দূর থেকে দেখা যায়। পাহাড়ের একপ্রান্তে দুর্গ অন্যপ্রান্তে বাস্‌পা নদীর দিকে দুদান পরিবারের ত্রিতল প্রাসাদ। এটিও কাষ্ঠ-নির্মিত। দুদানরা রাজপরিবারের প্রধানমন্ত্রীর বংশ।

সে বছর একটি ঘটনা ঘটল প্রায় সবার অলক্ষ্যে। তরুণ যুবরাজ প্রীতম নাচের আসরে এক তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হন। সেই তরুণীটি আমাদের পূর্ব পরিচিত সুরজ সিং-এর একমাত্র কন্যা নিলম। তরুণী নিলম অসম্ভব জেনেও মনে মনে যুবরাজকে তার ভালোবাসা নিবেদন করেছিল।

কোনও এক মধুলগ্নে প্রেমের দেবতা দুজনের হৃদয়ে হেনেছিল তাঁর পুষ্পশর। ফুলেচ্ উৎসবের অবারিত উন্মাদনার মুহূর্তগুলিতে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল কয়েকবার। রাজ পরিবারের কোনও মানুষের সঙ্গে একজন সাধারণ কিন্নরবাসিনীর এরূপ মিলন ছিল অকল্পনীয়। তবু প্রেমের যুগল প্রজাপতি উড়ে বেড়াতে লাগল ধৌলাধার পর্বতের সানুদেশে পুষ্পিত অরণ্যবৃক্ষের আড়ালে আড়ালে। পুষ্পগন্ধ রেণুমাখা সমীরণ তাদের আকুল করে তুলল। তাদের প্রণয়ের গোপন সংবাদ বাস্‌পা নদী বয়ে নিয়ে চলল তার কলধ্বনির সঙ্গে। এক মায়াময় জ্যোৎস্নারাতে অরণ্যের আড়ালে এক ডোগ্‌রিতে ঘটল তাদের গোপন মিলন। জ্যোৎস্নারাত্রি, পুষ্পিত অরণ্য আর কলধ্বনি মুখর বাস্‌পা ছাড়া এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন মিলনের কথা কেউ জানল না।

উৎসব শেষে পিতার সঙ্গে যুবরাজ ফিরে গেলেন রাজধানী রামপুর বুশেহারের প্রাসাদে।

অদর্শনে আকুল হলেও নিলমের কোনও উপায় ছিল না প্রেমিক যুবকের সঙ্গে মিলনের। রামপুর বুশেহারের পথ তার কাছে ছিল দুর্গমতম।

সহসা একসময় শঙ্কিত হয়ে উঠল নিলম নিজের দেহের পরিবর্তনের কথা জেনে। সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

কন্যার অবিবেচনার কথা জানতে পেরে শিরে করাঘাত করতে লাগলেন কুশলা। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কোনও অস্ত্র তাঁর কাছে ছিল না।

অবশেষে কুশলাকে সাংলার সরপঞ্চের শরণাপন্ন হতে হল।

কিন্নরদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল, অবৈধ প্রণয়ে যদি কোনও কুমারীকন্যা সন্তানসম্ভবা হয় তাহলে একটি বিচারসভা বসে। সেই সভায় গ্রামের যুবক-যুবতীসহ প্রায় সকল মানুষকে উপস্থিত থাকতে হয়। সরপঞ্চ সন্তানসম্ভবা মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন, সভামধ্যে কোন্ যুবক তোমার সন্তানের জন্মদাতা?

কুমারী কন্যাটি তখন তার প্রেমিক যুবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

পঞ্চায়েত প্রধান যুবকটিকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি এই অনাগত সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার কর?

সাধারণত কিন্নরভূমিতে অসত্য ভাষণের আশ্রয় কেউ নেয় না। যুবক সত্য হলে স্বীকার করে নেয়।

তখন সরপঞ্চের প্রশ্ন, তুমি কি কন্যাটিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে?

যদি যুবকটি সত্য স্বীকার করে কিন্নরীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সমস্যাটির সহজ সমাধান হয়ে গেল। আর যদি সে সন্তানসম্ভবা কন্যাটিকে গ্রহণ করতে না চায়, তাহলে সরপঞ্চের নির্দেশমতো কিছু মুক্তিপণ দিয়ে সে রেহাই পেয়ে যায়। ওই মুক্তিপণের অর্থ কন্যাটির মায়ের কাছে জমা থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখন তার দায়িত্ব গ্রহণ করে শিশুটির দিদিমা।

এ ব্যবস্থায় অবৈধ সন্তানের জননীর বিবাহে কোনও বাধা থাকে না। সমাজও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাড়া করে ফেরে ওই শিশুসন্তানটিকে। ওরা সমাজে স্থান পায় না। ওদের বলা হয় পুগ্‌লাং। এইভাবে পুগ্‌লাং ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা সমাজ তৈরি হয়। তারা সমাজের মূলস্রোতের বাইরে থাকে। ছেলেরা সাধারণত ভেড়াচারকের বৃত্তি গ্রহণ করে অথবা খেত খামারের কাজে নিযুক্ত থাকে। মেয়েরা গৃহস্থালির কাজকর্ম করে, এইভাবে তাদের অন্নসংস্থান হয়।

পুগ্‌লাং মেয়ে পুরুষরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংসারধর্ম পালন করে। সমাজের মধ্যে থেকেও তারা সমাজবহির্ভূত।

সরপঞ্চের কাছে যাওয়ার আগে কুশলা মেয়ের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন এসে গেল মা, আর তো বসে থাকা যায় না।

দুদান পরিবারে খোঁজ নিয়ে জানলাম, যুবরাজের এখন এদিকে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই এ ব্যাপারে যা করণীয় এখন আমাদের তা করতে হবে।

নিলম বলল, তুমি প্রচার করেছ, একবছর ট্রেনিং-এর কাজে আমি সিমলা চলে গেছি। এখন তুমি সরপঞ্চের সঙ্গে এ বিষয়ে গোপনে পরামর্শ কর। তিনি একসময় আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। সাংলায় তিনি যদি পঞ্চায়েত সভা ডাকেন তাহলে কথাটা জানাজানি হয়ে যাবে, তখন মহারাজের সম্মান রক্ষাও হবে না। তার চেয়ে উনি যদি রামপুর বুশেহারে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করেন তাহলে এ ব্যাপারে হয়তো একটা সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে।

কথাটা মনে ধরল কুশলার। সে নিজের হাতে তৈরি উলের একটা থেপাং বা টুপি নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি হাজির হল।

সরপঞ্চ বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর বন্ধুর স্ত্রী কুশলা এসেছেন জেনে তিনি তাঁকে মহাসমাদরে ঘরের ভেতর ডেকে নিলেন।

কী সৌভাগ্য, এতদিন পরে আপনার মুখোমুখি হলাম। এখনও বিচারসভায় বসলে সুরজ ভায়ার কথা মনে পড়ে। তিনি সভায় এলে মনে হত দেবগুরু বৃহস্পতি এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর যুক্তি, বিচারপদ্ধতি অনুকরণ করার মতো। অতি অল্পসময়ের ভেতর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত সুষ্ঠুভাবে।

সহসা সরপঞ্চ বলে উঠলেন, নিলম মা নাকি সিমলার কনভেন্টে ট্রেনিং নেবার জন্য চলে গেছে। তার কোনও কুশলসংবাদ কি পেয়েছেন? নিয়ম করে বেটি চিঠ্‌ঠি পাঠায় তো?

মাথা নিচু করে সসংকোচে বলতে লাগল কুশলা, আপনি আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনাকে আমি আমার সাগা ভাইয়া বলে মনে করি। আজ বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে একটা পরামর্শ করতে ছুটে এসেছি।

সরপঞ্চ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, বলুন বহিন আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?

মাথা তুললেন কুশলা। অসংকোচে বললেন, সবাই জানে নিলম সিমলায় রয়েছে কিন্তু সে লোকচক্ষুর আড়ালে আমার কাছেই রয়েছে ছয়-সাত মাস।

বিস্মিত হয়ে সরপঞ্চ বললেন, আমি আপনার কথাটার মর্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একটু খোলসা করে বলুন।

সমস্ত সংকোচ সরিয়ে দিয়ে কুশলা বললেন, নিলম সন্তানসম্ভবা।

চমকে উঠলেন সরপঞ্চ। শিশুকাল থেকে সুন্দর একটা মুনাল পাখির মতো বেড়ে উঠতে দেখেছেন এই বন্ধু কন্যাটিকে। নাচে গানে লেখাপড়ায় সাংলা তহশিলে সে অদ্বিতীয়া। কাজ করে তহশিলের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। এই তহশিলে এমন কোনও যোগ্য যুবকের মুখ তাঁর মনে পড়ল না যার সঙ্গে নিলমের তুলনা চলে।

সরপঞ্চ উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন, কে সেই যুবক যে আমার নিলম মায়ের যোগ্য?

স্পষ্ট উত্তর দিলেন কুশলা, আপনি বরং বলুন কোন্ সেই কান্তিমান, সদ্বংশজাত যুবক যে অতিসাধারণ ঘরের এই কন্যাটিকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল।

এই হেঁয়ালির ভেতর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন সরপঞ্চ। তিনি এই ধাঁধার কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না।

এবার সব কুয়াশা, সব সংকোচ দুহাতে সরিয়ে দিয়ে কুশলা বললেন, যুবরাজ প্রীতম সিং সেই প্রেমিক পুরুষ যিনি আমার কন্যা নিলমকে স্পর্শ করেছিলেন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে কতকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন সরপঞ্চ।

একসময় বললেন, এ যে বানানো কথা নয় এ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ঘটনাটা কীভাবে কখন ঘটল তা আমার জানা দরকার।

কুশলা সবিস্তারে বলতে লাগলেন কন্যার প্রণয়পর্বের সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান পরিণতি পর্যন্ত।

সরপঞ্চ বললেন, যুবরাজ সাংলা ত্যাগ করার আগে কি জানতে পেরেছিলেন, নিলম সন্তানসম্ভবা?

ফুলেচ্ উৎসব শেষ হওয়ার সাতদিন পরেই মহারাজের সঙ্গে যুবরাজ রাজধানী বুশেহারে ফিরে গেছেন। এ সংবাদ তাঁর অজ্ঞাত।

একসময় গভীর চিন্তা থেকে উঠে দাঁড়ালেন পঞ্চায়েত প্রধান।

বললেন, যিনি যত বড়ই হোন বিচার সকলের ক্ষেত্রেই সমান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে একটা ফলপ্রদ আলোচনায় বসব আমি।

উদ্বিগ্ন কুশলা বললেন, কিন্তু প্রকাশ্য আলোচনায় বিষয়টি তোলা কি সঠিক হবে? এখানে বিচারসভায় যুবরাজকে আনা তো আর সম্ভব হবে না।

আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে সবার অজ্ঞাতে রামপুর বুশেহারে চলে যাব। সেখানে মহারাজের কাছেই বিচার চাইব আমরা।

মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনাটা শুনে প্রথমে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল নিলম, কিন্তু উপায়ান্তর নেই জেনে সম্মত হতে হল সরপঞ্চের প্রস্তাবে।

সম্পূর্ণ গোপনে এক সন্ধ্যায় সরপঞ্চের সঙ্গে রামপুর বুশেহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল মা ও মেয়ে।

তাপ্‌রি পর্যন্ত হেঁটে যেতে তাদের প্রায় দু'দিন লাগল। বিশ্রামের সুব্যবস্থা পথে প্রায় কোথাও নেই। কুহলের ওপর যারা কাঠের পুল তৈরি করছিল তাদের তাঁবুতে কাটাতে হল তিনজনকে। প্রচণ্ড শীতে কাঠের আগুন জ্বেলে রাখতে হল সারারাত।

ভোরের আলো ফোটার আগে কম্বলের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ত মা আর মেয়ে। সকালে খাবার জন্য রুটি বানিয়ে ফেলত। পথ চলতে চলতে তারা কখনও ভেড়-বক্‌রি অথবা চমরি গাইয়ের দুধ সংগ্রহ করে রাখত। মেষচারক পালসদের মতো দুধ গরম করে তাতে তারা হাতে তৈরি রুটি চুবিয়ে চুবিয়ে খেত। আটা ছিল তাদের বস্তায়। সরপঞ্চের ঝোলায় থাকত শুকনো ফল।

পাছে সাংলা অঞ্চলের পরিচিত লোকেরা তাঁদের উদ্দেশ্য জানতে পারে সেজন্য গোপনে তাঁরা গ্রাম ছেড়েছিলেন। বাহন হিসেবে টাট্টুর ব্যবস্থা করতে পারলেও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সেকাজ করেননি তাঁরা।

এখন গ্রাম থেকে দুদিনের পথ চলে আসার ফলে পরিচিত জনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেল।

তাপ্‌রি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনটে টাট্টু জোগাড় করলেন তারা। তিনটি টাট্টুর দুজন মালিকও তাঁবু আর আটার বস্তা ইত্যাদি বয়ে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে চলতে লাগল।

এই দুঃখের যাত্রা শেষ হল আরও দুদিন পর।

রামপুর বুশেহার এলাকার পাশ দিয়ে বইছিল একটা নদী। তার কূলে তাঁবু ফেলে রাত কাটাল পাঁচজন যাত্রী। ভোরের সূর্য সোনালি তির ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুবের উঁচু পাহাড়টার মাথায় উঠে এল।

কুশলা তাঁর এলাকায় সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বড় ভালোবাসতেন। নিজের হাতে নানারকম খাবার তৈরি করে খাওয়াতেন অসহায় দীন দুঃখীদের।

আজও টাট্টুর মালিকদের বিদায় দেওয়ার সময় নিজের হাতে রুটি আর পিঠে তৈরি করে খাওয়ালেন। তাদের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বললেন, স্ত্রী পুত্র নিয়ে তোমরা সুখে থাক বাবা। দিনে দিনে তোমাদের ব্যবসার উন্নতি হোক।

নদীতীর থেকে মা আর মেয়ে বেশ কিছুটা সবুজ ঘাস তুলে এনে টাট্টুগুলোকে খেতে দিলেন।

টাট্টুওয়ালারা বলল, মাইজি ওদের তো বিচালি বস্তায় ভরা আছে।

কুশলা বললেন, আহা কত কষ্ট করে জীবগুলো আমাদের দুর্গম পাহাড়ি পথে বয়ে এনেছে। ফিরে যাবার সময় নিজের হাতে সামান্য কিছু খেতে দিতে মন চাইল। জানি এটুকুতে ওদের পেট ভরবে না। তবু ওদের খাইয়ে আমাদের আনন্দ।

টাট্টুওয়ালারা টাট্টু নিয়ে চলে গেল। নদীর ধারে একটা গাছের তলায় বসে রইলেন মা ও মেয়ে।

সরপঞ্চ বললেন, আমি পরিস্থিতিটা বুঝে আসি, আপনারা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। রাজারাজড়ার ব্যাপার, জানি না কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

কুশলা বলল, ভাইসাব আমি বরং এই গাছতলায় বসে দুপুরের খাওয়ারটা বানিয়ে রাখি, আপনি ততক্ষণে রাজদর্শন সেরে আসুন।

দুই নারীর উন্মুখ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নদীতীরের গাছতলায় ফিরে এলেন সরপঞ্চ। তখন অপরাহ্নকাল।

কুশলা প্রধানের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতির শুভাশুভ আন্দাজের চেষ্টা করতে লাগলেন।

ভাইসাব আপনার ফিরতে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ?

সরপঞ্চ বললেন, সে অনেক কথা, আগে বলুন আপনাদের ভোজনাদি হয়েছে তো?

আপনি অভুক্ত থাকলে আমরা কী করে খাবার মুখে তুলতে পারি।

সরপঞ্চ বললেন, কোনও দোষ নেবেন না বহিন, রাজবাড়ির অতিথিশালায় মধ্যাহ্নভোজ সেরে আসতে হয়েছে আমাকে। আমাদের কামরু দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তপোনাথ নেগী। প্রায় বিশ বছর তিনি সাংলা ছেড়ে রামপুর এস্টেটে চলে এসেছেন। তিনি এখন রয়েছেন রাজবাড়ির অতিথিশালার দায়িত্বে। সেই প্রবীণ মানুষটির অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি, তাই আহারপর্ব ওখানেই শেষ করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওর সাহায্যে আমি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি সুযোগ সংগ্রহ করেছি। আপনাদের ভোজন শেষ হলে আমরা আলোচনায় বসব।

একরাশ উদ্বেগ মনে নিয়েও দিনের আহার শেষ করতে হল মা ও মেয়েকে।

আহারান্তে সরপঞ্চ বললেন, রাজবাড়িতে আজ রাতে থাকার আমি একটা ব্যবস্থা করে এসেছি।

কুশলা বললেন, ভাইসাব অশান্ত হয়ে আছে আমার মন। ভালো কিছু খবর পেলে অন্য বিষয়ে ভাবা যাবে।

মহারাজের সঙ্গে অনেক কষ্টে নিভৃত সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি। অবশ্য তপোনাথ নেগী মহাশয়ের চেষ্টায়। এখন মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় রয়েছেন।

সবিস্ময়ে সরপঞ্চের মুখের দিকে তাকিয়ে কুশলা জিজ্ঞেস করলেন, রাজপরিবারের সকলের শারীরিক কুশল তো?

শরীর সুস্থ থাকলেও মানসিক দিক থেকে মহারাজ একেবারে বিপর্যস্ত।

বিচলিত কুশলা জানতে চাইলেন, মহারাজের এতখানি উদ্বেগের কারণ?

সংবাদ এসেছে গুর্খারা রাজ্যের দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে ক্ষুদ্র একটি মিত্ররাজ্য। খবর পাওয়া গেছে, এত অধিকসংখ্যায় গুর্খাসৈন্য নেমে আসছে যাতে ওই ক্ষুদ্ররাজ্যের সৈন্যরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই মহারাজ মিত্ররাজ্যটির সাহায্যের জন্য কিন্নরবাসী দক্ষ কিছু গেরিলা সৈন্য যুবরাজের নেতৃত্বে পাঠিয়েছেন।

বিস্ফারিত দৃষ্টি, কুশলার মুখে উচ্চারিত হল এই কটিমাত্র শব্দ,—যুবরাজ যুদ্ধে গেছেন!

হ্যাঁ, যুদ্ধে গেছেন যুবরাজ প্রীতম সিং। খবর এসেছে ইতিমধ্যেই তিনি গেরিলা সৈন্যদের সাহায্যে বুশেহারের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী কয়েকটি সেতু ধ্বংস করে ফেলেছেন। শত্রুদের সহজ প্রবেশের সুযোগটি প্রথমেই তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন। অবশ্য এইটুকু কাজ শেষ করেই যুবরাজ রাজধানীতে ফিরে আসবেন না।

তবে?

উনি মিত্রপক্ষের সাহায্যের জন্য দুর্ধর্ষ কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেছেন। তাই শেষ পরিণতি কী হল তা জানার জন্য মহারাজ বিশেষ উদ্বিগ্ন।

কুশলা বললেন, এ অবস্থায় মহারাজের সঙ্গে দেখা করলে কি শুভফল পাওয়া যাবে?

সরপঞ্চ বললেন, এতখানি বিপর্যয়ের ভেতরেও মহারাজ যখন সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন তখন সাগ্রহে আমাদের সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা উচিত।

আপনি যা ভালো বোঝেন তাই হবে।

সে রাতে রাজপ্রাসাদের অদূরে এক অতিথিনিবাসে মা ও মেয়ের থাকার ব্যবস্থা হল। তপোনাথের বাড়িতে রইলেন সরপঞ্চমশায়।

অতিথিনিবাসে আহারাদির সুব্যবস্থা ছিল। মা ও মেয়ে রাতের আহারপর্ব শেষ করে নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে চলে গেলেন। ঘরখানি প্রশস্ত, পিলসুজের ওপরে পঞ্চমুখী একটি প্রদীপ জ্বলছিল। তার আলোতে কুশলা দেখলেন, পাশাপাশি দুখানা শয্যা পাতা রয়েছে। পরিচ্ছন্ন বালিশ কম্বল ইত্যাদি রাজমহিমা প্রকাশ করছে।

গৃহ পরিচারিকা শয়নকক্ষটি দেখিয়ে দিয়ে কর্মান্তরে প্রস্থান করল।

কয়েকদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিল শরীর। একরাশ উদ্বেগ মনে নিয়েও তাই উত্তপ্ত শয্যায় গা এলিয়ে দিল মা আর মেয়ে। সহজেই এসে গেল নিদ্রা।

কিন্নরীরা দারুণ পরিশ্রমী। তাই এতদূরের পথ সন্তানসম্ভবা একটি মেয়ের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল।

চার

শয্যায় ভেঙে পড়লেও ঘুম এল না নিলমের চোখে। আধোঘুমের ভেতর সে ভাবতে লাগল তার ফেলে-আসা দিনগুলির কথা।

ফুলেচ্ উৎসবের শেষে জ্যোৎস্নারাত্রে বাস্পা নদীতীরের অরণ্যে একটি ছোট্ট সুন্দর ডোগ্‌রিতে ফুলে ফুলে তাকে সাজিয়ে দিয়েছিল তার স্বপ্নের রাজপুত্র প্রীতম। নিশি জাগরণের সেই রাত্রির সকল চিহ্ন সে আজ বহন করছে তার সমস্ত দেহমনে।

আর একটি দিনও তারা চলে গিয়েছিল সবার দৃষ্টির অলক্ষ্যে সাংলা তহশিল থেকে বেশ খানিক দূরে।

জ্যোৎস্নাঝরা রাতে সম্পূর্ণ ছদ্মবেশে তারা চলেছিল একটা নদীকূল বরাবর। কয়েকটা ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল তারা। ভেড়াচারক পালসদের পোশাক পরে তারা এগিয়ে চলেছিল। যুবরাজের হাতে ছিল ভেড়া তাড়ানোর একটা ছড়ি—খচ্। তার পাশে থেকে নিলম মুখে চিতরং আওয়াজ তুলে ভেড়াদের সোজা পথে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিল।

সেই রাতের জীবনটুকু অনাস্বাদিত আনন্দে উপভোগ করেছিল যুবরাজ।

শেষরাত্রে তারা এসে পৌঁছল একটা ছোট্ট কুঠির সামনে। শেউগাছের তলায় স্লেটপাথরে ছাওয়া কুঠির সামনে বেড়া দেওয়া একটুকরো খেতি। কাছেপিঠে কোনও জনবসতি নেই। কিন্তু সেই শেষরাতের অপার্থিব আলোতে তারা দেখতে পেল এক অলৌকিক দৃশ্য। তরঙ্গিত দু'সারি পাহাড়ের পেছনে কিন্নর-কৈলাসের চূড়া।

কণ্ঠ পর্যন্ত শুভ্র তুষারের আবরণ, ত্রিকোণ শীর্ষদেশ মহাদেবের অলৌকিক মহিমায় তুষারশূন্য। বিশাল শুভ্র উপবীতের মতো একটি জমাটবাঁধা জলধারা নিচে কোনও গিরি প্রবাহিণীতে গিয়ে পড়েছে।

এই পটভূমির কোলে যিনিই গৃহটি রচনা করুন, তিনি যে একজন রূপদর্শী কবি তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। ভেড়া নিয়ে প্রেমিক যুগল কুঠির সামনের পথে ভোর হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্নর-কৈলাসে প্রথম সূর্যের আলো পড়লে মনে হল, পার্বতীর প্রণামের সিন্দূর বিন্দু রাঙিয়ে দিল মহাদেবের শুভ্র বক্ষদেশ। এরপর স্বর্ণবর্ণের আলোকে ঝলমল করে উঠল হর-পার্বতীর অপার আনন্দমূর্তি।

কুঠি থেকে বেরিয়ে এল এক দম্পতি। মেয়েটির কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে আছে একটি শিশু। তারা কিন্নর-কৈলাসের দিকে তাকিয়ে প্রভাতী-প্রণাম নিবেদন করল।

অভিভূত যুবরাজ বললেন, এ দৃশ্য ভোলার নয় নিলম। মহাদেবের হাত ধরে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন গণেশ-জননী।

প্রণাম শেষ করে পথের দিকে তাকাতেই ওদের চোখ পড়ল সস্ত্রীক ভেড়াচারকের ওপর।

যুবরাজ পালসের পোশাক পরলেও তাঁর কান্তি ঢেকে রাখা যাচ্ছিল না।

ওরা পায়ে পায়ে রাস্তায় নেমে এসে নিলমদের মুখোমুখি দাঁড়াল।

কুঠির মালিকের গলার বিস্ময়, এত ভোরে তোমরা ভাই এই পথে! কোনও পালস তো তাদের ভেড়-বক্‌রি নিয়ে এই পথে চলে না। জল পাওয়া গেলেও বিশ-তিরিশ মাইলের ভেতর এক গরাস ঘাস পাওয়া যাবে না। তোমাদের এই দুর্গম পথে দেখে অবাক হচ্ছি।

ছদ্মবেশী যুবরাজ বলল, চারটে ভেড়ের পিঠে বাঁধা বস্তায় দানা আছে ভাই। আমরা প্রথম এদিকে বেরিয়েছি বুগিয়ালের খোঁজে। চেনা চারণভূমি তো রয়েইছে, যদি এদিকে পাহাড়ের খাঁজে নতুন কোনও ঘাসের জমি পাওয়া যায়।

ঘরের মনিব বলল, পাহাড়ের ঢাল একেবারে শতদ্রুর জল অবধি পৌঁছেছে, এখানে পাহাড়ের খাঁজে মাটি পাওয়া শক্ত। অনেক খুঁজে আমরা এই সমতল প্রান্তরটুকু পেয়েছি। পাশেই দেখছ ঝরনা। আমরা বহুদূর থেকে বীজ এনে এই খেতি তৈরি করেছি। পেছনে যে আস্তাবল দেখছ, ওটাতে আমার টাট্টু আছে। খেত চষা থেকে মাল বওয়া সব কাজই মুখ বুজে ও করে।

ঘরনি শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে একেবারে নিলমের কাছে এসে দাঁড়াল।

নিলম বাচ্চাটাকে মায়ের বুক থেকে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরে দিল।

বাচ্চার মা জানতে চাইল, কী নাম ভাই তোমার?

নিলম।

যুবরাজের দিকে ইঙ্গিত করে অনুচ্চে জানতে চাইল, কর্তার নাম?

প্রীতম।

সাদি কতদিন হল?

১৯শে ভাদোর। ফুলেচ্ উৎসবের তারিখটাই বলল ও।

এতক্ষণে যুবরাজ প্রীতম সিং জানতে চাইল গৃহস্বামীর নাম, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ কিন্তু নামটাই তো জানলাম না ভাই।

আমার নাম যমল। যমল সিং। আর বিবির নাম ধান্‌নি। সে যা হোক, কতদিন পরে মানুষের মুখ দেখলাম। তোমাদের এখন আর ছাড়ছি না।

যুবরাজ বলল, সাংলামোনে আমাকে বিশেষ কাজে দু-তিন দিনের মধ্যেই ফিরতে হবে ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে যমল বলল, অন্তত আজকের দিন রাতটা তো তোমাদের সঙ্গে কাটাতে পারব।

ওদের আন্তরিকতায় ততক্ষণে দুজনেই অভিভূত,—তারা আর না বলতে পারল না।

ওরা যমলের সঙ্গে বাড়ি থেকে একটু দূরে পাহাড়ের ঢালে ঝরনাটাকে দেখতে চলল। সাগ্রহে যমল একটি একটি করে তার সাম্রাজ্য দেখাতে লাগল। কিন্নর-কৈলাস সারাদিন কীভাবে তার রূপ ও রং বদলায়, কোন্ সময়ে ঝরনার স্রোত কী রূপ ধারণ করে, কিংবা কোন্ পাখি আজকাল তার উঠোনের গাছে বাসা বাঁধে,—এইসব কথা অনর্গল বলে গেল যমল সিং।

যথার্থই মানুষটি কবি-স্বভাবের।

এদিকে ডলপুতুলের মতো বাচ্চাটিকে সারাক্ষণ কাঁধে নিয়ে ঘুরছে নিলম। অতিথির কষ্ট হচ্ছে ভেবে ধান্‌নি ছেলেকে নিতে চাইলেও কে শোনে কার কথা। সে সমানে মাকে সরিয়ে দিয়ে শিশুর স্পর্শটুকু অনুভব করতে লাগল।

ধান্‌নি বলল, তবে ও থাক তোমার কাছে আমি কোঠিতে চললাম তোমাদের খানা বানাতে।

ধান্‌নি চলে গেল। সারাদিনটা গল্পে গানে কেটে গেল চারটে মানুষের। ওদের ঘরের গায়ে ছোট্ট একটা গৃহদেবতার মন্দির, ছাটকাং। গাছের তলায় একটু উঁচু বেদির মতো, সন্থং। জ্যোৎস্নার আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছিল। কিন্নর-কৈলাশের স্তূপীকৃত বরফে সে আলোর দ্যুতি ঝলকাচ্ছিল।

বাঁশুরি আর ঢোলকে সুর আর বোল তুলতে লাগল যমল আর যুবরাজ।

সন্থংয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে মাত করল ধান্‌নি। নিলম তার সুরেলা কণ্ঠে গানের কলি ভাসিয়ে দিল বাতাসে,—

'গুলি গোহনা
হায়া বিহনা
দশংস বিনা—'

নির্জন জ্যোৎস্না-ভাসা নিশীথে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগল আকাশের অগণিত নক্ষত্র। সেই গানের অপার্থিব সুর শুনল কিন্নর কৈলাসে উপবিষ্ট হর-পার্বতী।

একসময় শেষ হল সংগীত আর নৃত্যের অনুষ্ঠান। কোঠির ভেতর দুই নারী গিয়ে দুটি পাত্রে নিয়ে এল সুরাআঙ্গুরি।

ঝরনার ধারে মাচান তৈরি করে যমল আঙুরের চাষ করেছে। সেই আঙুর থেকে তৈরি হয়েছে সুরা। সেই সুরা পাত্রভরে ধান্‌নি পরিবেশন করল যুবরাজ প্রীতমকে। আর অন্য পাত্রটি গৃহস্বামী যমলের হাতে তুলে দিল নিলম।

কিন্নর দেশে উৎকৃষ্ট আঙুরি, ফাসুর ইত্যাদি মদ তৈরিতে কিন্নরীরা অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু কোনওদিন তাদের ওষ্ঠ ওই মদ স্পর্শ করেনি। পুরুষরাই ওই মদের স্বাদ উপভোগ করে।

রাতে ভোজনের পর শয়ন। নিজেদের ঘরখানা অতিথিদের ছেড়ে দিয়েছিল যমল। তারা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল খোলা আকাশের নিচে সন্থংয়ের বেদিতে। নিলমদের কোনও প্রতিবাদই তারা শোনেনি।

ভোররাতে তখন আকাশে জ্বলজ্বল করছিল শুকতারা। আগুন জ্বেলে অতিথিদের জন্য রুটি আর সবজি তৈরি করল ধান্‌নি। ভোর ভোর সাংলার পথে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল নিলম আর যুবরাজ।

নিলম চুপিচুপি বলল, ধান্‌নির বাচ্চাটাকে কী দিই বল তো?

সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ তার ঝোলা কোটের পকেট থেকে অতি মূল্যবান একটি মুক্তোর মালা বের করল। নিলমের হাতে দিয়ে বলল, এই মালাটি তুমি ধান্‌নির বাচ্চার গলায় পরিয়ে দিও।

তাই করল নিলম।

এ যে অনেক মূল্যবান মালা তা বুঝতে পেরেছিল যমল সিং আর তার স্ত্রী।

গত সন্ধ্যায় প্রীতম আর যমল যখন পাশাপাশি ধান্‌নিদের অনুষ্ঠান দেখছিল তখন যমলের চোখ পড়েছিল প্রীতমের কাজ করা পোনো বা জুতোর ওপর। এটি ছিল অতি ধনী ব্যক্তির পাদুকা,—তাপ্রু-সে-বালজানু-পোনো।

নিলমদের ঝুলিতে খাবার ভরে দিয়ে ধান্‌নি বলল, তোমরা এটুকু পথে খেয়ে নিও ভাই।

যুবরাজ আর নিলমের মধ্যে ইশারায় কী যেন কথা হল।

নিলম যমলকে বলল, ভাইয়া, বহিন তোমাকে এই চারটে ভেড় দিয়ে যেতে চায়, তুমি কৃপা করে নেবে কি?

প্রথমে দামি মুক্তোর মালা, তারপর এই চার-চারটে ভেড় পেয়ে অভিভূত হল যমল সিং আর তার পরিবার।

যমল বলল, বহিনের দান আমরা সাদরে রেখে দেব, সারাজীবন ভুলতে পারব না তোমাদের কথা।

পথে নেমে যাবার আগে শেষ প্রশ্ন করল যুবরাজ প্রীতম সিং, এমন পরিত্যক্ত প্রান্তরে, লোকালয় থেকে এতখানি দূরে তোমরা কুঠি বেঁধেছ দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। এর কিছু কারণ আছে কি?

মৃদু হেসে যমল বলল, মোরাং-এ ধনী কানেৎ বাড়িতে আমার জন্ম। আমরা ছিলাম সাত ভাই আর তিন বোন। আমার যখন চারবছর বয়স তখন আমার দাদার বয়স পঁচিশ বছর।

বিয়ে হল দাদার। কিন্নরের নিয়ম অনুযায়ী আমরা সবকটি ভাই মাথায় পাগ্ বেঁধে বরের সাজে সেজে বিয়ের আসরে হাজির হলাম। কনের সঙ্গে এক এক করে আমাদের সবকটি ভাইয়েরই বিয়ে হল। পরে শ্বশুরবাড়ি এসে আমার ওই বিয়ে করা বউ আমাকে লালন পালন করতে লাগল। বছর দুয়েক আগেই আমার মা গত হয়েছিল।

তোমরা জানো কিন্নরে চাষযোগ্য জমি বড় কম। তাই ভায়েদের ভেতর জমি যাতে টুকরো টুকরো হয়ে না যায় সেজন্য একান্নবর্তী সংসারে থাকাটাই রেওয়াজ।

আমার যখন বিয়ের বয়স হল তখন সংসারে ওই একটিমাত্র বউ-এর বয়স অনেক। তাই আমি ধান্‌নিকে বিয়ে করব বলে স্থির করলাম। ধান্‌নি বলল, একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী আমাকেও সব ভাইয়ের বউ হয়ে থাকতে হবে। তুমি আমি কি আলাদা থাকতে পারি না?

তখন আমি বললাম, নিয়ম অনুযায়ী আলাদা থাকতে চাইলে সম্পত্তির অধিকার হারাতে হবে। সেক্ষেত্রে সংগ্রাম করে শুরু করতে হবে আমাদের জীবন।

এই পরিস্থিতিতে তুমি রাজি থাকলে আমরা নতুন করে সংসার পত্তন করতে পারি।

নতুন জীবন। মনে অসীম বল নিয়ে আমরা দুজনে লোকালয় ছেড়ে এতখানি দূরে চলে এলাম। কষ্ট হলেও নিজেদের মতো করে ছোট্ট একটি সংসার রচনা করতে পেরেছি।

ধান্‌নি বলল, ভাইসাব এই আমাদের স্বর্গ।

প্রীতম সিং আর নিলম চারদিনের এই অজ্ঞাতবাস গভীর আনন্দে উপভোগ করেছিল।

পাঁচ

দূর থেকে হঠাৎ একটা বিউগ্‌লের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির বিউগ্‌লও বাজতে লাগল।

ততক্ষণে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে কুশলা আর নিলমের। বাইরে দৌড়ো- দৌড়ির আওয়াজ পেয়ে ওরাও ঘরের জানলা খুলে বাইরে কী ঘটছে তা দেখার চেষ্টা করল।

অতিথিশালার রক্ষককে রাজবাড়ির দিকে হন্তদন্ত হয়ে যেতে দেখে নিলম জানতে চাইল, শিউনন্দনজি, হঠাৎ বিউগ্‌ল বেজে উঠল কেন?

মনে হচ্ছে যুদ্ধের কোনও শুভখবর এসেছে।

এর বেশি আর কোনও খবর জানতে পারল না ওরা।

অতিথিনিবাসে প্রভাতি জলযোগের সময় দুরকম লাড্‌ডু পেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের শুভসংবাদটাও।

আরও বেলা হলে জনতার বিপুল জয়ধ্বনি শুনতে পেল।

ততক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানীর চতুর্দিকে।

সিমলা থেকে ক্যাপ্টেন আরনল্ড এক পল্টন গোরাসৈন্য নিয়ে যুবরাজ প্রীতম সিং-এর সঙ্গে যোগ দেওয়ায়, গুর্খা-সৈন্য দ্রুত পিছু হটেছে। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের।

বেলা বাড়লে সরপঞ্চের সঙ্গে দেখা হল মা আর মেয়ের। ওরা শুনল, বিজয়ী যুবরাজকে নিয়ে মিত্ররাষ্ট্রে বিজয়োৎসব চলেছে। দু' একদিন পরে যুবরাজ যখন নিজের রাজধানীতে ফিরবে তখন এখানেও শুরু হবে উৎসব। শুনছি সে সময় মুকুট উৎসবও হতে পারে।

কুশলা উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন, মুকুট-উৎসবের অর্থ কী?

মহারাজ তাঁর বিজয়ী পুত্রকে সে সময় সিংহাসনে বসাতে পারেন। রাজমুকুট উঠবে তখন যুবরাজের মাথায়।

কুশলা জানতে চাইলেন, এই আনন্দ উৎসবের ভেতরে মহারাজ কি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন?

সরপঞ্চ বললেন, আমার মনেও এ নিয়ে একটা সংশয় জেগেছিল। আমি এ বিষয়ে তপোনাথ নেগীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও মহারাজের জবানের নড়চড় হবে না।

অপরাহ্ণে নিভৃত সাক্ষাতের সময় দেওয়া ছিল।

কুশলা আর নিলম তপোনাথ নেগী আর সরপঞ্চের সঙ্গে মহারাজের নিভৃত পরামর্শকক্ষে প্রবেশ করলেন।

মহারাজ সরপঞ্চের কাছে সাংলা তহশিল ও কামরুর দুর্গ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন।

সবিনয়ে সরপঞ্চ মহারাজের সবকটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলেন।

এবার আসল প্রশ্নের মুখোমুখি হল মা আর মেয়ে। এসময় মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে সরপঞ্চের সঙ্গে তপোনাথ বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মহারাজের দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে কুশলার মনে হল, বিজয়সংবাদে তাঁর মুখখানা উদ্ভাসিত।

মহারাজ, এইটুকু কথা বলতে গিয়ে আবেগে রুদ্ধ হল কুশলার কণ্ঠস্বর। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

মহারাজ শান্ত গলায় বললেন, তোমাদের কী সমস্যা তা আমাকে অসংকোচে বলতে পার। সাধ্যমতো সমাধান করব আমি।

মহারাজ আমার স্বামী সিমলায় এক সাহেবকে কিনৌর ভাষা শেখাতেন। সেখানে থাকতে থাকতে তিনি নিজেও ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেন। সেখানে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি স্কুলে পড়তে দেখে তিনিও নিজের অঞ্চলে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাঁর কাছে এমন অর্থ ছিল না যা দিয়ে একটা স্কুল চালানো যায়। হঠাৎ সাহেবকে দেশে ফিরে যেতে হল। যাওয়ার সময় তিনি আমার স্বামীর ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে গেলেন।

মহারাজ, সে অর্থের এক কপর্দকও আমরা সংসারের জন্য খরচ করিনি, তিন তিনটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেই অর্থে প্রতিষ্ঠা করেছেন আমার স্বামী।

মেয়ে নিলমের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, একটি স্কুলে আমার মেয়েটিও কাজ করে।

ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনায় আমার স্বামী মারা গেছেন। আমি আপনার কাছে আমাদের অভাব মোচনের জন্য অর্থপ্রার্থনা করতে আসিনি।

মহারাজ জানতে চাইলেন, তবে?

ফুলেচ্ উৎসবে আপনি যুবরাজকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাংলা তহশিলে গিয়েছিলেন। সে সময় আপনার এবং আমার অগোচরে একটা ঘটনা ঘটে যায়।

বিস্মিত মহারাজ জানতে চাইলেন, কী সে ঘটনা?

এক যুবক-যুবতী পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। তার ফলে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়। এখন তাদের বিবাহের প্রার্থনা নিয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছে মহারাজ।

কেন, সরপঞ্চের কি এ বিষয়ে অনুমতি নেই?

মহারাজ, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সরপঞ্চের অধিকারের বাইরে, তাই স্বয়ং মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়েছি।

কী এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সরপঞ্চ সমাধান করতে পারল না।

কুশলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মহারাজ, সরপঞ্চমশায়ের মুখ থেকেই আপনি সমস্ত ঘটনাটা শুনুন।

মহারাজ সরপঞ্চকে ঘরের মধ্যে আসতে আহ্বান করলেন।

দ্বারী খবর দিলে পরামর্শকক্ষে উপস্থিত হলেন সরপঞ্চ।

এরপর সমস্ত ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে গেলেন পঞ্চায়েত-প্রধান।

নিলমের অনাগত সন্তানের পিতা যে তাঁরই একমাত্র পুত্র যুবরাজ প্রীতম এ সংবাদ জানতে পেরে মহারাজ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সরপঞ্চের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই অসম বিবাহ বুশেহার রাজপরিবারের কাছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কিন্নরের সমস্ত মানুষ জানে আমরা দেবযোনি সম্ভূত। একথা নিশ্চয়ই তোমারও অবিদিত নয়। মৃত্যুর পর বুশেহারের এই রাজপরিবারের আত্মা তিব্বতের গুরু-লামা রূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। তাই এই পরিস্থিতির দ্বিতীয় সমাধানের পথটি আমাদের বেছে নিতে হবে।

মহারাজ সামান্য সময় আত্মস্থ থেকে বললেন, পাত্রপক্ষ যদি এরূপ বিবাহে সম্মত না হয় তাহলে বিচারে সরপঞ্চ ওই যুবককে অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান করে। এখন বল, কত অর্থ পেলে যুবরাজ এই পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তিলাভ করবে।

সরপঞ্চ বললেন, মহারাজ, আপনি এই ভূখণ্ডের অধীশ্বর, আপনি বিচার করে যা সাব্যস্ত করবেন তাই আমরা মাথা পেতে নেব।

মহারাজ বললেন, নিয়ম অনুযায়ী কুমারী কন্যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে জাতক তার মাতামহীর কাছে প্রতিপালিত হবে। সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ তার মাতামহীরই প্রাপ্য। ওই অবৈধ সন্তানের জননী এরপর সমাজের যে কোনও যুবককে পতিরূপে গ্রহণ করে সসম্মানে সমাজে বাস করতে পারবে। না হলে সে যাপন করতে পারে ভিক্ষুণীর জীবন।

এখন বল, কত অর্থ দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে?

সরপঞ্চ বললেন, মহারাজের অভিরুচি।

বিশ সহস্র মুদ্রা আমি ওই অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্য জরিমানাস্বরূপ দিতে পারি। এ বিষয়ে তোমাদের আরও কিছু প্রার্থনা থাকলে জানাতে পার।

সরপঞ্চ বললেন, মহারাজ এই পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে অকল্পনীয়।

মহারাজ এবার শেষ কথাটি বললেন, আজ সমস্ত রাজ্যের পক্ষে আনন্দের দিন। তুমি আমার খাজাঞ্চির কাছ থেকে তিরিশ সহস্র মুদ্রা নিয়ে যাও। .

নিলমের চোখ বেয়ে অজস্র অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগল।

ভালোবাসা, দেহমিলন সবই কি ওই বিপুল অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা হয়ে যায়!

মহারাজ নিলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাঁদছ কেন তুমি?

অশ্রুভরা চোখে একবার মহারাজের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই মাথা নত করল সে। একমুঠো ফুলের মতো কয়েকফোঁটা জল ঝর্‌ঝর্‌ করে ঝরে পড়ল মাটিতে।

এবার নিজেকে সামলে নিয়েছে নিলম। তার ভেতর আশ্চর্যভাবে জেগে উঠেছে একটা শক্তি।

মহারাজ আপনি সমগ্র কিন্নরের রক্ষক বলে আমরা জানি; সেজন্য আপামর কিন্নরবাসীর শ্রদ্ধার আসনে আপনি বসে আছেন। এ কথা ভাবলে কি অন্যায় হবে যে আপনি সত্যেরও রক্ষক।

মহারাজ ভাবতেই পারেন না তাঁর কোনও প্রজা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এভাবে তাঁকে প্রশ্ন করতে পারে।

তবু আহত মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, সত্য রক্ষা করা রাজার ধর্ম।

সে ধর্ম কি রক্ষা পেল মহারাজ?

মহারাজ স্থির কণ্ঠে বললেন, নদী নিম্নগামী, নদীর স্রোতকেও কূলের বাধা মেনে চলতে হয়। স্রোত সবসময় সহজ সরল পথে চলে না, মাঝেমাঝে তাকে আবর্ত রচনা করতে হয়। সংসারের আবর্তে পড়ে সত্য ধর্মও তার অবস্থান বদলায়। আমি শাসক তাই পরিস্থিতির আবর্তে রেখে সত্যের দিকনির্ণয় করি।

নিলম বুঝল সত্যের যে সহজ সংজ্ঞা তার জানা আছে রাজধর্ম সে সত্যকে স্বীকার করে নেবে না। সে এবার চলে যাওয়ার জন্য মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

পরামর্শগৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মহারাজের উদ্দেশ্যে তিনজনেই নমস্কার নিবেদন করল।

মহারাজ স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন, রাজরক্ত সকলে ধারণ করতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল নিলম।

সে ভাবল, তার হারানোর মতো আর কিছু নেই।

দৃপ্তকণ্ঠে বলল, মহারাজ রাজবংশের রক্ত যদি আমার গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে থাকে তাহলে এই প্রত্যাখ্যানের উত্তর সে একদিন অবশ্যই দিয়ে দেবে।

এবার কোনও উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে স্থির পদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণে অপেক্ষমাণ মা ও সরপঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল নিলম।

রাজপ্রাসাদ থেকে সাংলার দিকে কিছু পথ এগিয়ে ওরা উত্তর-পূর্ব দিকে প্রচণ্ড জয়ধ্বনি শুনতে পেল।

অঞ্চল-প্রধান বললেন, নিশ্চয়ই বিজয়ী যুবরাজ, রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করছেন, তাই এই উল্লাসধ্বনি।

সরপঞ্চ সেই ধ্বনি লক্ষ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কুশলা ভাবলেন, এই আনন্দোৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য সরপঞ্চের চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছে কিন্তু তিনি এই অসহায় দুটি নারীকেও ত্যাগ করতে পারছেন না।

কুশলা বললেন, ভাইসাব পথে আমরা টাট্টু পেয়ে যাব, আর বাহন পেয়ে গেলে সাংলায় ফিরে যেতে আমাদের কোনও অসুবিধেই হবে না। এ সময় সাংলা তহশিলের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার বুশেহারে থাকা প্রয়োজন। বিজয়-উৎসবে আপনি পাশে থাকলে মহারাজ খুশিই হবেন।

কুশলার কথায় সরপঞ্চের দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা কেটে গেল। মনে মনে তিনিও চাননি রাজগৃহের এরকম একটা আনন্দ-উৎসব থেকে দূরে সরে থাকতে। তাই মা আর মেয়েকে পথযাত্রার বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে তিনি রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

কুশলা আর নিলম নীরবে এগিয়ে চলল নিজগৃহ অভিমুখে।

রাজগৃহের উল্লাসধ্বনি যতদূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল ততদূর পথ তারা ত্রস্ত পায়ে পেরিয়ে গেল। ক্রমে সে ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন বোধ করল তারা। পথের ধারে একটা গাছের তলায় বসে তারা বিশ্রাম নিতে লাগল।

কুশলা নীরবে ভাবতে লাগলেন মেয়ের ভবিষ্যতের কথা। তার মাতৃহৃদয় সমাধানের কোনও পথ দেখতে পেল না।

নিলম কিন্তু ভাবনার জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছিল। যতক্ষণ আশা ছিল ততক্ষণ উদ্বেগ ছিল তার মনে, এখন আশা নেই তাই সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ সে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক টাট্টুওয়ালা তাদের সামনে এসে হাজির হল। এতদূরের পথ সাধারণত কেউ যেতে রাজি হয় না। তাদের যাত্রাপথের এক একটা সীমারেখা থাকে। সেই দূরত্ব পর্যন্ত যেতে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়। তারপর আবার অন্য নতুন টাট্টুওয়ালার সন্ধান।

এই দুর্গমপথে টাট্টুর সন্ধান পাওয়া বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

টাট্টুওয়ালা জানতে চাইল, কতদূর যাবেন মা?

কুশলা কাতর গলায় বলল, আমার মেয়েটি খুবই অসুস্থ বাবা, আমরা যাব বহুদূরের পথ।

লোকটি নিলমের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল। এই প্রস্তরাকীর্ণ পথে বহুদূর হেঁটে যাওয়া যে সম্ভব নয় তা বুঝতে পেরেছিল সে। তাই সে এবার বলল, কোন্ তহশিলে যাবেন?

সাংলায় আমাদের ডেরা।

গালে হাত দিয়ে কিছু সময় ভাবতে লাগল লোকটি। বহুদূরের পথ, যাত্রাপথে বাহন জোগাড় করাও বড় দুষ্কর। তাই সে বলল, সাংলা পৌঁছতে তিনদিনের কম লাগবে না, তার ওপর একটা টাট্টু মাত্র। একজনের বেশি দুজন চড়া যাবে না।

কুশলা বলল, আমার দরকার নেই বাবা, আমার অসুস্থ মেয়েটা যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই। পথে যখন তোমার মতো ছেলেকে পেয়ে গেলাম তখন তোমার হাত ধরেই আমি চলে যাব।

লোকটিকে বড় হৃদয়বান বলে মনে হল কুশলার।

টাট্টুওয়ালা বলল, বহিন অসুস্থ না হলে আমি এতখানি পথ পাড়ি দেবার ঝুঁকি নিতাম না। আর দেরি না করে উঠে পড়ুন টাট্টুতে। রোদ চড়ছে।

দ্বিতীয়দিন দৈবকৃপায় ওরা আর একটি টাট্টু পেয়ে গেল।

মা মেয়ে দুটো টাট্টুতে বসায় যাত্রায় গতি এল।

তৃতীয় দিন আবছা জ্যোৎস্নালোকে ওরা এসে পৌঁছল কুশলার কোঠিতে।

ভাড়ার অতিরিক্ত পয়সাই তাদের দিয়ে দিলেন কুশলা। তারা সেই রাতেই চলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কুশলা বলল, এতরাতে মা হয়ে আমি কি তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি বাবা!

একজন টাট্টুওয়ালা বলল, রাতে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারব। কারছাম অবধি চলে যেতে পারলে ভোরবেলা সওয়ারি জুটে যাবে।

কুশলা আবার বললেন, এখান থেকে তোমাদের দুজনের কারছাম অবধি যাওয়ার ভাড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু প্রাণধরে তোমাদের অভুক্ত অবস্থায় রাতে ছেড়ে দিতে পারব না।

টাট্টুওয়ালারা যুক্তি করে বলল, আপনার মতো মানুষ আমরা আগে দেখিনি মা। একটি পয়সাও আপনাকে বেশি দিতে হবে না। রাতে আপনার এখানেই আমরা থেকে যাব।

কুশলা বললেন, শুধু থেকে যাওয়া নয় খেতেও হবে আমার হাতের তৈরি খাবার।

অভিভূত প্রথম টাট্টুওয়ালাটি বলল, সে তো মহামায়ার প্রসাদ মা।

টাট্টুতে এলেও মা মেয়ে বড়ই ক্লান্ত ছিল। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিল নিলমের।

কুশলা তার অবস্থা দেখে তাকে ধরে সাবধানে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সে মূর্ছিতের মতো শয্যার ওপর পড়ে রইল।

টাট্টুওয়ালাদের ওপর কৃতজ্ঞতায় সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল কুশলার। তাই সমস্ত দেহ ভেঙে পড়লেও তিনি পরিপাটি করে ওদের খাওয়ার আয়োজন করলেন।

খাওয়ার শেষে ঘরের দাওয়ায় তাদের শোওয়ারও ব্যবস্থা করে দিলেন। ঘরে কম্বলের অভাব ছিল না, দুটি ভালো কম্বল রাতের প্রচণ্ড শীত নিবারণের জন্য ওদের দিয়ে দিলেন।

ভোররাতে টাট্টুওয়ালাদের উঠে পড়ার আগেই কুশলা উনুন জ্বেলে কয়েকখানা রুটি আর সবজি তৈরি করে ফেললেন। দুটি টাট্টুর জন্য রাত থেকেই চানা ভিজিয়ে রেখেছিলেন। টাট্টুওয়ালাদের সঙ্গে তাদেরও দানাপানি দেওয়া হল।

যাত্রার সময় জোর করে ওদের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে দিলেন। সঙ্গে দিয়ে দিলেন রাতে ব্যবহার করা দু'খানা উৎকৃষ্ট কম্বল।

একেবারে শেষমুহূর্তে কী যেন ভেবে বললেন, সাতদিন পরে শেষরাতে জ্যোৎস্নায় ভাসবে পথ প্রান্তর, সেইরাতে আমার নির্জন ঘরের এই গাছতলায় তোমরা আসতে পারবে?

কারণ জানতে না চেয়েই তারা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দিল।

ওরা চলে যেতে কুশলা ভাবল, নিলমের এ অবস্থায় একেবারে বাইরে বেবোনো সম্ভব নয়। ছ' সাতদিন এই ঘরে ও আত্মগোপন করে থাকবে। তারপর শেষরাতে যখন সাংলাবাসী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে তখন ভিন্ন অঞ্চলের এই দুজন টাট্টুওয়ালার টাট্টুতে ওরা চলে যাবে এই তহশিল ছেড়ে অন্য তহশিলের কোনও একটা জায়গায়। সেখানে মেয়েকে নিয়ে থাকবে কোনও একটা নিরাপদ আশ্রয়ে।

একসময় নিলমকে কুশলা জানিয়ে দিলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা।

সঙ্গে সঙ্গে নিলম বলল, মা ভিন্ অঞ্চলের এই টাট্টুওয়ালাদের আসতে বলে তুমি খুবই বুদ্ধির কাজ করেছ। এ অঞ্চলের কোনও টাট্টুওয়ালা হলে সকলেই খবরটা জেনে যেত। এরপর আমার থাকার ব্যাপারে তুমি কুয়াশার ভেতরেই রয়েছ, আমি তোমাকে সঠিক একটা জায়গার সন্ধান দিতে পারি।

বিস্মিত কুশলা বললেন, সে কী! তুই আবার গোপন ডেরার সন্ধান পেলি কোথায়?

নিলম হেসে বলল, সেখানে পৌঁছলে তুমি সবকিছু জানতে পারবে। লোকালয়ের একেবারে বাইরে থাকে ওরা। আমাকে পেলে ওরা নিজের বাড়ির মেয়ের মতো বুকে করে রেখে দেবে।

পরিকল্পনামতো একদিন নিলম সমস্ত দলটাকে পরিচালনা করে নিয়ে গেল পাণ্ডববর্জিত সেই যমল সিংয়ের ডেরায়।

নিলমকে দেখে আনন্দে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল যমল সিং আর ধান্‌নির।

নিলম এগিয়ে গিয়ে বুকে তুলে নিল ওদের ফুটফুটে মেয়েটিকে।

ওই একরত্তি মেয়ে সে, কিন্তু এতদিন পরেও চিনতে পারল নিলমকে। সে তার কচি কচি আঙুল দিয়ে নিলমের মুখে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল। ভাবটা এই, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন।

পথে আসার সময় মাকে সে যমল সিংদের সঙ্গে তার আর যুবরাজের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতার কথা সবিস্তারে বলেছিল।

কুশলাকে প্রণাম জানিয়ে ধান্‌নি মা ও মেয়েকে মহাসমারোহে ঘরে তুলে নিল।

টাট্টুওয়ালারা পুরো দিন রইল যমল সিংয়ের কোঠিতে।

কুশলার ইচ্ছা অনুযায়ী স্থির হল টাট্টুওয়ালাদের সঙ্গেই তিনি ফিরে যাবেন তাঁর সাংলার ডেরায়। যতদিন না নিলমের সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে ততদিন ধান্‌নিদের কাছেই থাকবে সে।

ইতিমধ্যে যুবরাজ আর নিলমের সবটুকু কাহিনি জানা হয়ে গিয়েছিল যমল-পরিবারের। এতদিন পরে তারা বুঝতে পারল, দামি মুক্তোমালা আর কাজ করা জুতোর রহস্যটা।

ওখানেই টাট্টুওয়ালাদের সঙ্গে চুক্তি হল, ঠিক দুমাস পরে এমনই এক শেষরাতের কাকজ্যোৎস্নায় কুশলাকে সাংলা থেকে এনে তুলবে এই আস্তানায়। পরে তিনচার মাস অন্তর অন্তর এখানে এসে কুশলা দেখে যাবেন নিলমের সন্তানকে।

স্থির হল, দশ বছর পর্যন্ত যমল সিংয়ের গৃহেই পালিত হবে নিলমের শিশুটি।

ছয়

যুবরাজ প্রীতম সিংয়ের পুত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল সুরমঙ্গল সিং। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল, ভূমিষ্ঠ হল যেন কোনও দিব্যকান্তি দেবশিশু। পাঁচ বছরের সুরমঙ্গলকে দেখলে মনে হত সে যেন দশ বছরের এক বলিষ্ঠ বালক।

এইসময় এক প্রভাতে সূর্যপ্রণাম করতে গিয়ে নিলমের এক দিব্য-দর্শন হল।

অরুণের রক্তিম আভায় তুষারশৃঙ্গে এক ধ্যানমগ্ন যোগী পুরুষকে দেখল সে। তার মনে হল, সেই পুরুষ যেন তাকে আহ্বান করছেন।

ধ্যানস্থ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই পুরুষকে নিলম চিনতে পারল। ঘন কাষায় বসনে আবৃত-তনু বুদ্ধ তথাগত।

পরামর্শ হল মাতা ও কন্যার ভেতর। সুরমঙ্গলকে কুশলা নিয়ে চলে যাবেন তাঁর গৃহে, বালকের বয়স যখন দশ বছর অতিক্রম করবে। ইতিমধ্যে পুত্রের কাছ থেকে সরে যাবে তার মা কোনও শ্রমণী-আশ্রমে।

সাংলারই শ্রমণী-নিবাসে দীক্ষান্তে যোগ দিল নিলম। প্রভু বুদ্ধের শরণ নিল সে।

পরিকল্পনামতো একপাল ভেড়া নিয়ে সাংলায় কয়েক বছর পর কুশলার কোঠিতে এসে হাজির হল সুরমঙ্গল। তার ভূমিকা, একজন ভেড়াচারকের। সবাই জানল, বৃদ্ধা কুশলা তাঁর দেখভালের জন্য এক বালক ভেড়াচারককে নিজের কাছে রেখেছেন।

আগেই জেনেছিল প্রতিবেশীরা, সিমলা থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিলম দেশভ্রমণ করতে যায়। সেখানেই বৌদ্ধধর্মগুরু কোনও লামা তাঁকে দীক্ষা দেন। এরপর সে আর গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসেনি, বেছে নিয়েছে শ্রমণীর জীবন।

সুরমঙ্গল মেতে আছে তার ভেড়াগুলিকে নিয়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভেড়া নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে নতুন চারণভূমিতে ঘুরতে লাগল।

গ্রীষ্ম আর বর্ষার সময় সে তার ভেড়াগুলিকে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠতে থাকে। পনেরো-ষোলো হাজার ফিট ওপরে তুষারপাহাড়ের কোলে একটি চারণভূমির সন্ধান পেয়েছে সে। সেখানেই তুষারগলা জলে পুষ্ট নীরু ঘাস খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে ভেড়ার দল। আবার শীত পড়লেই নিচের পাহাড়ে নেমে আসতে থাকে সুরমঙ্গল। আসা-যাওয়ার পথে পাহাড়ের কোলে সে আবিষ্কার করেছে তিনটি গুহা। ওই গুহাগুলিই চারণের পথে তার আবাসস্থল।

কালো কালো লোমওয়ালা দুটো কুকুর সে পুষেছে, তারাই রক্ষা করে তার ধনসম্পদ। ভেড়াই পালসদের সম্পদ।

সর্দার ভেড়া যেদিকে যায় সেই পথ ধরে চলে সমস্ত দলটা। ওই দলের সামনে থাকে একটি কুকুর, অন্যটি থাকে দলের পেছনে। দল ভেঙে কারুর বেরিয়ে যাবার জো-টি নেই। ঘ্যাঁক করে গিয়ে এমনভাবে তার সামনে দাঁড়াবে, সে বেচারা ভয় পেয়ে করুণ কান্নার সুর তুলতে তুলতে ছুটে গিয়ে দলে মিশে যাবে।

সামনে যদি কোনও পাহাড়ি ঝর্না এসে যায় তাহলে থমকে দাঁড়িয়ে যাবে ভেড়াগুলো। ওরা দারুণ ভয় পায় জলকে। তখন ভেড়াদের দলপতিকে জলে নামিয়ে দিলে বাকি সব ভেড়া তাকে অনুসরণ করে ঝর্নার স্রোত পার হয়ে যাবে।

কে বলবে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি তরুণ কিশোর সুরমঙ্গল। এরই মধ্যে সে পূর্ণবয়স্ক একটি যুবকের মতো সুঠাম দেহী।

গমের বস্তা ইত্যাদি খাদ্যবস্তু সে ওপরের পাহাড়ে নিজের পিঠে বয়ে নিয়ে চলে। অল্প কিছু রসদ ভেড়ার পিঠে ছোট ছোট বস্তায় নিয়ে যায়। হাতে থাকে একটা ধারালো কুঠার। মাঝে মাঝে ছোট আকারের তুষার-চিতা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেড়ার ওপর, তখন শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। কুকুরগুলো ভয়ংকর চিৎকার তুলে লড়াই শুরু করে দেয়। অধিকাংশ সময় যুদ্ধে জয় হয় পাহারাদার কুকুরগুলোর। আবার কোনও সময় হারাতে হয় দু'একটা ভেড়াকে।

স্রোত ঠেলে পার হওয়ার সময়ও কোনও কোনওটা স্রোতে ভেসে যায়। রক্ষক কুকুরগুলো স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওদের বাঁচাতে পারে না। এ সময় প্রচণ্ড গতিতে স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কেটে ভেড়াদের রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে সুরমঙ্গল।

অতি উচ্চ বুগিয়াল বা চারণভূমিতে গুহার আশ্রয় পাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে প্রচণ্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে কাটাতে হয় ভেড়াচারকদের। তারা নিচ থেকে রান্নার কাঠ বয়ে নিয়ে যায়। সন্ধের পর সেই কাঠের আগুনে রুটি আর সবজি তৈরি হয়। সেই ধিকি ধিকি আগুনের উত্তাপে গা হাত সেঁকে নেয় পালসরা। এরপর ভেড়াদের পালের ভেতরে

ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে তারা। লোমশ ভেড়াগুলোর উলের উত্তাপে সুখনিদ্রায় পালসদের রাত ভোর হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে সুরমঙ্গল পাহাড়ের নিচে নেমে আসার পর বন্ধু পালসদের জিম্মায় তার ভেড়াগুলোকে রেখে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। সে সময় কুশলাও জানতে পারেন না তার গতিবিধি।

সে তখন তৃণহীন ন্যাড়াপাহাড়-এর কোলঘেঁষে দুদিনের পথ একদিনে পার হয়ে যমল সিংয়ের কোঠিতে গিয়ে হাজির হয়।

এতবড় ছেলে, তবু তাকে মাতৃস্নেহে জড়িয়ে ধরে ধান্‌নি। তার মেয়ে রূপমতী চিৎকার করতে করতে মনের খুশি বাতাসে ছড়িয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে, ভাইয়া এসেছে, ভাইয়া এসেছে। তাঁকে হাত ধরে হিড়হিড় করে সম্বংয়ের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে নাচগান শুরু করে দেয়।

ধান্‌নি চেঁচাতে থাকে, ছেলেটা এত পথ হেঁটে এল, আগে তার নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা হোক, তারপর ভাইবহিন মিলে যা খুশি তাই করিস।

সুরমঙ্গলের সঙ্গে আহারে বসে যমল সিং।

ধৌলাধারের বুগিয়ালে তার ভেড়া চরানোর খুঁটিনাটি খবর জানতে চায় যমল।

রূপমতী সুরমঙ্গলের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। এমন রূপবান পুরুষ দেখার সৌভাগ্য তার কখনও হয়নি।

রূপমতী জানে বয়সে সুরমঙ্গল তার থেকে দু'তিন বছরের ছোট। এখানে যখন সে থাকত আর তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরত তখন ভাইয়াকে দু'দণ্ড দেখতে না পেলে সে অস্থির হয়ে উঠত।

যমল সিংয়ের আঙুর খেতে ভেড়া চরানোর ফাঁকে ফাঁকে কাজ করত সুরমঙ্গল। ওই আঙুরে তৈরি হত আঙ্গুরিমদ।

যমল সিং তার টাট্টুতে করে ওই মদ নিয়ে যেত লোকালয়ে। সেগুলি বেচে দিয়ে আসত সেখানে। তাছাড়া, খেত থেকে প্রচুর আঙুর তুলে নিয়ে গিয়ে বাজারে ফলের দোকানগুলোতে জোগান দিত।

রূপমতীর বিয়ে নিয়ে ভাবনার অন্ত ছিল না ধান্‌নি আর যমলের। ধীরে ধীরে বিয়ের বয়স ছুঁয়ে ফেলেছে তাদের সুদর্শনা মেয়েটি। বড় আনন্দময়ী সে। নাচেগানে স্বাভাবিক একটা দক্ষতা আছে তার, তবে এই নির্জন নিবাসে তার আর সময় যেন কাটতে চায় না। যতদিন সুরমঙ্গল ছিল তাদের এই কোঠিতে ততদিন নিঃসঙ্গতাবোধ ছিল না রূপমতীর। সুরমঙ্গল চলে যাওয়ার পরে সে যেন তার সমস্ত কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। ভাইয়ার জন্য মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে তার প্রাণ। নীরবে অশ্রুপাত করে।

এতদিন পরে দেখা তাই খুশির অন্ত ছিল না রূপমতীর।

সুরমঙ্গল যে তার নিজের ভাই নয় সে কথা অনেক পরে সে জানতে পেরেছিল তার মায়ের মুখ থেকে।

কথাটা শোনার পর পুরো দুটো দিন সে ভালো করে খেতে আর ঘুমোতে পারেনি। শুধু চোখের জলে ভেসেছে। তাই এতদিন পরে ভাইয়াকে কাছে পেয়ে মনের খুশি কী করে প্রকাশ করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই সুরমঙ্গল তাঁর দাদিমা কুশলার কাছ থেকে জানতে পেরেছিল সে কিন্নরের মানুষ হলে কী হবে, কিন্নরের সমাজ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। সে কারও অবৈধ সন্তান আর সে কারণেই সে আলাদা এক সমাজভুক্ত। যারা পুগ্‌লাং নামে পরিচিত।

ব্রাহ্মণ, কানেৎ তো দূরের কথা ডোম সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গেও তাদের সামাজিক কোনও কাজকর্ম চলবে না।

যারা পুগ্‌লাং, তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের ভেতরেই বিয়েশাদি করে। পুরুষরা কাজ করে জোতদারদের খেতে খামারে। বেশিরভাগই বেছে নেয় ভেড়াচারকের বৃত্তি।

পুগ্‌লাং সমাজের মেয়েরা উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িতে অথবা ফলের বাগানে কাজ করে।

তারা নিজের সমাজের ছেলেদের বিয়েশাদি করে কখনও কখনও তাদের সঙ্গে ভেড়া চরাতে চেলে যায়। অবশ্য বেশি উঁচু পাহাড়ে ওঠা তাদের বারণ।

ঘরে কিন্তু ওরা বসে থাকে না। শীতে ভেড়া নিয়ে পালসরা যখন ফিরে আসে তখন ভেড়াদের লোম ছাঁটা হয় আর সেই লোম পরিষ্কার করে ওরা তৈরি করে নানারকম উলের পোশাক। সেগুলো অনেক দামে বিক্রি হয় বাজারে।

আনন্দে মগ্ন সুরমঙ্গল এতদিন কুশলার কাছে জানতে চায়নি তার বাবা-মায়ের পরিচয়। কিন্তু কিছুদিন হল তার মনে একটা ভাবনার উদয় হয়েছে, রূপমতীর মা তার নিজের মা না হয়েও যদি এতখানি স্নেহ তার জন্য উজাড় করে দিতে পারেন তাহলে নিজের মার স্নেহ হতে পারে আরও কত প্রবল। ইতিমধ্যে সে কিন্নরের সমাজব্যবস্থার অনেকটাই জেনে ফেলেছে। এখন মাঝে মাঝে তার মন উদাস হয়ে যায়। কে তার বাবা মা, এই ভাবনা তার মনকে অস্থির করে তোলে। সে জানে এইসব অবৈধ সন্তানরা তাদের দাদির কাছেই মানুষ হয়। সে কিন্তু ছোটবেলা থেকেই যমল সিং আর ধান্‌নিকে তার নিজের বাবা মা বলে চিনেছিল। কিন্তু এ ভুল তার ভেঙে যায় একদিন। সে জানতে পারে এই দয়ালু মানুষ দুটির স্নেহে সে এতকাল প্রতিপালিত হয়েছে মাত্র। এদের সঙ্গে তার রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই।

যাদের সঙ্গে রক্তের বন্ধন ছিল তারা নির্মমভাবে সে বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেছে। এখন সে জেনেছে, একমাত্র রক্ত সম্পর্কের যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে সে তার স্নেহময়ী দাদি কুশলা।

একদিন সে তার মা বাবার পরিচয় জানার জন্য এমনই অস্থির হল যে কুশলাকে প্রশ্ন করে বসল, মা বাবা আমাকে সমাজের বাইরে ফেলে দিয়ে গেল কিন্তু তুমি সমাজের মানুষ হয়ে আমাকে কীভেবে বুকে টেনে নিলে দাদিমা!

প্রশ্ন শুনে কুঞ্চিত গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল কুশলার।

আবেগ প্রশমিত হলে সুরমঙ্গলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কুশলা বললেন, সমাজের এই নিয়ম ভাই। দুটি যুবক-যুবতীর ভাবসাব হওয়ার পর মেয়েটি যদি সন্তানধারণ করে তাহলে বিচারসভা বসে। সেই সভায় তহশিলের প্রায় সমস্ত যুবক-যুবতী হাজির থাকে। সরপঞ্চ সন্তানসম্ভবা মেয়েটির কাছে জানতে চান তার অনাগত সন্তানের পিতা কে। মেয়েটি তখন নির্দিষ্ট যুবকটির দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

যুবক যদি পিতৃত্বের দাবি স্বীকার করে নিয়ে মেয়েটিকে গ্রহণ করে তাহলে আর কোনও সমস্যাই থাকে না। যুবকটি স্বীকার করেও যদি মেয়েটিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে না চায় তাহলে যুবককে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়। সেই অর্থ অনাগত সন্তানের দাদির কাছে গচ্ছিত থাকে। এরপর অবৈধ সন্তানকে বড় করে তোলার দায়িত্বও তাঁর। তবে এই সন্তান-সন্ততিরা মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন একটি সমাজে স্থান পায়। সেটাই পুগ্‌লাং-সমাজ।

সুরমঙ্গল বলল, সমাজের এই ব্যবস্থার কথা আমার অজানা নয় দাদিমা। এখন আমার প্রশ্ন, আমার মা কি নতুন কোনও সংসার করেছেন না বৌদ্ধ শ্রমণীর জীবন বেছে নিয়েছেন?

খানিক সময় নীরব থেকে কুশলা বললেন, অলিখিত একটি নিয়ম রয়েছে এ সম্বন্ধে। অবৈধ সন্তানের কাছে তার বাবা-মার পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

সুরমঙ্গল তার দাদিমার গলা জড়িয়ে ধরে করুণ চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আমার ওই বাবার কথা জানতে চাই না। যে মানুষ একটি কুমারীকে স্পর্শ করেও সম্মান দেয়নি তাকে আমি সুস্থ একজন মানুষ বলেই মনে করি না। তুমি শুধু বল, আমার জন্মের পর আমার মা কি এই সমাজে নতুন সংসার রচনা করেছে, না বৌদ্ধ শ্রমণীর জীবনযাপন করছে?

সাংলার এক জোমো-গুম্ফায় শ্রমণীর জীবন কাটাচ্ছে তোর মা। আর তোর জন্মদাতা কিন্নরের শাসক-পরিবারের সন্তান। সে এখনও জানে না তার ভালোবাসার জন একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে।

তাঁকে আমার জন্মের কথা কি জানানো হয়েছিল?

বুশেহারের রাজকুমার সে সময় গুর্খাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। আমরা রাজপুরীতে গিয়েছিলাম খবরটা জানাবার জন্য।

যুবরাজকে না পেয়ে সংবাদটা মহারাজের কাছে নিবেদন করি।

মহারাজ বললেন, সূর্যবংশ থেকে উদ্ভূত আমরা। মৃত্যুর পরে আমরা জন্মগ্রহণ করি তিব্বতে। আমাদের দেহে থাকে দলাইলামার চিহ্ন। ওই চিহ্ন দেখেই আমাদের সর্বোচ্চ লামার পদে নির্বাচিত করা হয়। তাই বলছিলাম, এই রাজবংশ অতীব সম্মানীয়। বৈদিক বিধান মেনে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়নি সে বিবাহকে আমরা সিদ্ধ বলে মনে করি না।

আমরা তখন বললাম, এই সন্তানের পরিচয় কী হবে? এর দেহে বইবে বুশেহারের রাজরক্ত।

মহারাজ বললেন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এইসব সন্তান কিছু অর্থ পাওয়ার অধিকারী, তার বেশি কিছু নয়।

আমাদের মহারাজ এক থলি মোহর দিতে চাইলেন, আমরা সে মোহর গ্রহণ না করে ফিরে আসি।

তোমার মা, আমি আর সাংলার সরপঞ্চ বহু কষ্টে বহু দুর্গম পথ পেরিয়ে এখানে ফিরে আসি। মহারাজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতায় গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম আমরা।

ক্ষুব্ধ গলায় সুরমঙ্গল বলল, শাসনকর্তা বলে কি তিনি সমাজের বিচারের আওতার বাইরে?

কুশলা বললেন, এরপর আমাকে আর কিছু প্রশ্ন কোরো না ভাই।

কথাকটি বলে কতক্ষণ নিবিড় বাঁধনে জড়িয়ে ধরে রইলেন সুরমঙ্গলকে।

এই ঘটনার পরে মাকে চোখের দেখা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠত সুরমঙ্গল। শীতের সময় ভেড়াদের নিয়ে ফিরে আসার পর সে এক লোটা দুধ নিয়ে বসে থাকত জোমো-গুম্ফার সামনে। এতগুলি সন্ন্যাসিনীর মধ্যে নিজের মাকে চিনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু সে ভাবত সন্ন্যাসিনীরা যখন তার দিকে তাকাবেন তখন তার মায়েরও স্নেহদৃষ্টি তাকে ছুঁয়ে যাবে। আর সেটুকু পাওয়াও তার কাছে অনেক বেশি বলে মনে হত।

অন্যদিকে সন্ন্যাসিনী নিলম কিন্তু এই মেষচারকের মুখের ভেতর তার সন্তানের ছাপ দেখতে পেয়েছিল। এতগুলি বছর পরেও তার শিশুসন্তানের পরিবর্তিত মুখখানা তার বহু চেনা বলে মনে হয়। যে যুবক তাকে বহুদিন আগে ত্যাগ করে গেছে সে রাজপুরুষের সম্পূর্ণ মুখাকৃতি নিয়ে যেন উপস্থিত হয়েছে এই কিশোর। সন্ন্যাসিনী হয়েও তাই সে গভীর মমতায় জড়িয়ে পড়ল মেষচারক সুরমঙ্গলের সঙ্গে। কিন্তু কখনও সে প্রকাশ করল না যে সে-ই তার মা, আর বহুকষ্টে একসময় সে তার নাড়ির টান ছিন্ন করে এই জোমো-গুম্ফায় আত্মগোপন করেছে।

সাত

বুশেহারের বিজয় উৎসবে আনন্দমগ্ন জনতার নয়ন-মণি হয়ে বিরাজ করছিল যুবরাজ প্রীতম সিং। মঞ্চে মহারাজের সিংহাসনের পাশে অনুরূপ একটি সিংহাসনে বসেছিল প্রীতম। দিব্যকান্তি, উন্নত ললাট, আয়তনেত্র মহাবাহু এক পুরুষ।

যুদ্ধে যে কৌশল আর শক্তি অবলম্বন করে প্রীতম সিং বিতাড়িত করেছে গুর্খা সৈন্যদের তার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল প্রধান সেনাপতি থেকে মন্ত্রী-পরিষদের প্রায় সকল সদস্যই।

যুবরাজের রণকৌশলে যখন শত্রুপক্ষের সৈন্যরা পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটছিল তখনই কামানসহ ব্রিটিশ গোলন্দাজ সৈন্য রণক্ষেত্রে হাজির হয়। অগ্নিবর্ষণের মুখে শত্রুসৈন্য আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। তখন সেই পলায়নপর গুর্খাদের পেছনে সসৈন্যে ধাওয়া করে বীরযুবক প্রীতম সিং তাদের খতম করতে থাকে।

অতি অল্পসংখ্যক শত্রুসৈন্যই এই রণক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল।

সিমলা থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল রস নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন বুশেহারের এই বিজয়-উৎসবে। তিনি সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলেন নির্ভীক যুবক প্রীতম সিংয়ের।

তিন দিন ধরে চলল এই আনন্দযজ্ঞ। কিন্নরের বিভিন্ন তহশিল থেকে জনস্রোত সমানে এসে উপঢৌকন দিয়ে যেতে লাগল বুশেহারের মহারাজকে। জয়ধ্বনি দেওয়ার সময় মহারাজের নামের সঙ্গে যুবরাজের নামও মুহুর্মুহু উচ্চারিত হতে লাগল।

উৎসব শেষে বিদায় নেওয়ার সময় জেনারেল রস মহারাজের মুখোমুখি হলেন। তিনি বললেন, ভারতের গভর্নর-জেনারেল শিখযুদ্ধের পর সিমলাকে দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা দিয়েছেন। এখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সর্দাররা নজরানা দিতে আসছে রাজধানী সিমলাতেই।

মহারাজ বুশেহারের সঙ্গে আমাদের বহুদিনের সম্প্রীতি। সিমলার কোটগড় রাজ্য প্রথমে কোট-খাইরাজের অধিকারে ছিল। কুলুরাজ একসময় যুদ্ধ করে কোটগড় নিজের অধিকারভুক্ত করেন। কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষরাই মহাবিক্রম প্রদর্শন করে কুলুরাজের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন কোটগড়। চল্লিশ বছর ধরে আপনারা সেই রাজ্য ভোগ করেছেন। ইদানীং গোর্খারা সে রাজ্য কেড়ে নিয়ে নিজেদের দখলে রেখেছে। আমি এই গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুবরাজের সংগ্রাম দেখে বিশেষ প্রীত হয়েছি। ইংরেজদের সঙ্গে শৈলসংলগ্ন বহুরাজার সংঘর্ষ ঘটলেও আপনাদের সঙ্গে কোনওরূপ সংঘর্ষ সংঘটিত হয়নি। আপনারা আমাদের মিত্ররাজ্যের তালিকাভুক্ত রয়েছেন। এখন আমার প্রস্তাব, অচিরেই আপনার এই বীরপুত্রটিকে সিমলার সেনানিবাসে পাঠিয়ে দিন। সেখানে যুবরাজ আধুনিক যুদ্ধকৌশল শিখবেন। কামান থেকে নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগের কৌশল তাঁর আয়ত্তে আসবে। ইউরোপ থেকে নানাপ্রকার যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ করবেন আপনাদের অস্ত্রাগার। জানবেন, আপনাদের আমরা বন্ধুরাষ্ট্র বলে মনে করি। যত সত্বর যুবরাজকে পাঠাবেন ততই আপনাদের রাজ্যের মঙ্গল।

মহারাজ বললেন, আপনার পরামর্শ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। আমি কাল বিলম্ব না করে যুবরাজকে সিমলায় পাঠাচ্ছি। আপনার তত্ত্বাবধানে রেখে আপনি যুদ্ধবিদ্যায় যুবরাজকে শিক্ষিত করে তুলুন।

সামান্য সময় নীরব থেকে পুনরায় মহারাজ বললেন, প্রীতম আমার একমাত্র পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। ভেবেছিলাম, এবার প্রীতমকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি তীর্থদর্শনে যাব। কিন্তু আপনি যে পরামর্শ দিলেন তা আমার যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে।

জেনারেল বললেন, আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করার পর যুবরাজ যখন রাজ্যে ফিরবেন তখন দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই হবেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মহারাজ কাল হরণ না করে বীরপুত্রকে ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গেই রওনা করিয়ে দিলেন।

রামপুর বুশেহার থেকে মিঃ বসের সঙ্গে যুবরাজ প্রীতম অশ্বারোহণে এসে পৌঁছলেন সিমলায়। প্রীতম সিংয়ের এই প্রথম সিমলা-দর্শন।

সিমলা শৈলপৃষ্ঠ অর্ধচন্দ্রাকারে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ'মাইল।

পূর্ব প্রান্তের শৈলশৃঙ্গটির নাম জাকো হিল। প্রায় আটহাজার ফিট উচ্চ। এই শৃঙ্গটি দেবদারু, ওক ও রোডোডেনড্রন বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দীর্ঘকাণ্ডবিশিষ্ট পত্রবহুল বৃক্ষগুলি ঊর্ধ্বাকাশের দিকে মাথা তুলে শৃঙ্গটির শোভা বর্ধন করেছে। পুষ্পিত রোডোডেনড্রন শোভার আধার। কোনাকৃতি চূড়ার আকারে শৃঙ্গটি ঊর্ধ্বে উত্থিত। এই শৃঙ্গের চারদিক ঘিরে পাঁচমাইল দীর্ঘ রাস্তা কাটা আছে। ভ্রমণার্থীদের জন্য এই পথটি বিশেষ উপযোগী।

জাকো হিলের পশ্চিম পাদমূলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র একটি গির্জা। দক্ষিণ শৈলপৃষ্ঠে দেশীয় মানুষজনের জন্য একটি বাজার। বাজারের পূর্ব অংশে দেশীয় লোকেরাই বসবাস করে। এই অংশটি ছোট সিমলা নামে পরিচিত।

সিমলা শৈলের পশ্চিমপ্রান্তের শৃঙ্গটি জাকো হিলের মতো সুউচ্চ নয়। এখানে বড় বড় বৃক্ষ দেখা যায় না। কেবলমাত্র তৃণের দ্বারা আচ্ছাদিত।

মূল শৈলের উত্তরে লম্বরেখায় অপর একটি পর্বতশাখা বিস্তৃত। নানারকমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে স্থানটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই স্থানটি ইলিসিয়াম্ স্থাপনের উপযোগী বলে গৃহীত হয়েছে। এখানে জুটোব শৈলখণ্ডে কামানবাহী সেনাদের একটি ছাওনি আছে।

এই গোলন্দাজ বাহিনীর ছাওনির নিচে কিছুদূরে কাঠের দীর্ঘ সুন্দর একটি কুঠিবাড়ি। সংলগ্ন আস্তাবল, সহিসদের কোয়ার্টার। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ওপরের পাহাড়ে ওঠার জন্য পাথর বাঁধানো একটি রাস্তা তৈরি করা আছে। মূলগৃহের সামনে ফুলের কেয়ারি। মাঝে একটি দেওদার গাছকে ঘিরে কয়েকজনের বসার মতো গোল কাঠের বেদি।

এই গৃহে বাস করেন সকন্যা সেনাধ্যক্ষ রস।

জেনারেল রসের বাড়ির একধাপ নিচে সুন্দর একটি অতিথিনিবাস বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। বিদেশ থেকে পরিচিত ভ্রমণার্থীরা এলে কর্নেল ওই অতিথি নিবাসেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

এক অপরাহ্ণ বেলায় যুবরাজ প্রীতম সিংকে নিয়ে সেনাধ্যক্ষ রস অশ্বারোহণে এসে পৌঁছলেন তাঁর কোয়ার্টারের সামনে। বৃক্ষের শাখাপত্রের ফাঁক দিয়ে মধুবিন্দুর মতো ঝরে পড়ছিল অপরাহ্ণের আলো।

সেই আলোয় অশ্বারোহী যুবরাজ দেওদার গাছের নিচে বেদিতে যে তরুণীটিকে মগ্ন হয়ে লেস বুনতে দেখলেন, সে পার্ল, মিঃ রসের একমাত্র মাতৃহারা কন্যা।

ওরা যখন পাহাড়ি পথে কোয়ার্টারের দিকে নেমে আসছিল, তখন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে বোনা ফেলে মুখ তুলে তাকাল পার্ল। মুহূর্তে তার চোখেমুখে বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগল।

যে অশ্বারোহী যুবকটি তার বাবার সঙ্গে নেমে আসছিল, সে যে তাদের স্বদেশীয় কোনও ব্যক্তি নয় তা বুঝেছিল পার্ল। কিন্তু এই সুদর্শন যুবকটি যে কোনও দেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ তা সে সহজেই অনুমান করে নিল। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

বাগানের ওপারে ঘোড়া থেকে নামামাত্র সহিসরা ছুটে এসে ঘোড়াদুটোকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

সেনাধ্যক্ষ রসের সঙ্গে বাগানের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল যুবরাজ প্রীতম সিং।

হাতের কাজটা বেদিতে রেখে দিয়ে আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে গেল পার্ল। সে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাল। প্রীতম সামান্য মাথা নত করে সস্মিত মুখে জেনারেলের কন্যাকে অভিবাদন জানাল।

মিঃ রস বিশেষ সমাদরে বাগানের বেদিতে যুবরাজকে বসিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রিন্স প্রীতম সিং, রামপুর বুশেহার। কিছুদিন আমাদের অতিথিনিবাসে থাকবেন।

এবার অতিথিকে মাথা নত করে অভিবাদন জানাল পার্ল।

জেনারেল একবার কন্যার দিকে পরক্ষণে কোয়ার্টারের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমতী পার্ল অতিথি-অভ্যর্থনার আয়োজন করতে কোয়ার্টারের ভেতর চলে গেল।

বেদিতে বসে সেনাধ্যক্ষের প্রথম প্রশ্ন, জায়গাটি কেমন লাগছে প্রিন্স?

মৃদু হেসে বলল প্রীতম সিং, এই মুহূর্তে যে কথা মনে আসছে তা বলে ফেলি।

অসামান্য। স্থান নির্বাচনে আপনার তারিফ না করে পারছি না। সৈন্যাধ্যক্ষ না হয়ে আপনার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হওয়া উচিত ছিল।

যুবরাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিঃ রস বললেন, যতক্ষণ সেনাদের সঙ্গে কুচকাওয়াজে থাকি ততক্ষণ আমি পুরোপুরি একজন যুদ্ধবিশারদ। কিন্তু কাজের শেষে যখন কোয়ার্টারে ফিরি তখন আমি একমাত্র স্নেহশীল এক পিতা। কোনও ঝঞ্ঝাট, কোনও উদ্বেগ তখন আমার মনকে পীড়িত করতে পারে না। পার্ল আর আমি এই বাগানে বসে তখন এই প্রসারিত ভ্যালির সৌন্দর্য উপভোগ করি। কোনও পোয়েট অথবা নভেলিস্টের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা চলে আমাদের। সে সময় রাজনীতি অথবা যুদ্ধবিগ্রহের প্রসঙ্গ থেকে শতযোজন দূরে থাকি আমরা।

যুবরাজ বলল, আপনাকে আমি একজন যুদ্ধবিশারদ বলেই জানতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে সে ভুল আমার ভেঙে গেল।

হেসে বললেন সেনাপতি, ব্যারাকে কিন্তু আমি একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক। আমার পুরো আদলটাই বদলে যায়।

কোয়ার্টারের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে একটি জিজ্ঞাসু মুখে বাইরে বেরিয়ে এল। সাদা ফ্রিল দেওয়া পিঙ্ক রঙের গাউনে পার্লকে সেই মুহূর্তে অনন্যা বলে মনে হল যুবরাজের।

তোমরা কি সান্ধ্য-পানীয় বাগানে নেবে না ডাইনিং-হলে আসবে?

মিঃ রস বললেন, সন্ধ্যার হাওয়া শুরু হয়েছে, আলোর তেজও তেমন নেই, এখন ডাইনিং-হলই ভালো।

যুবরাজের দিকে ফিরে বললেন, ব্যারাকের কোয়ার্টারে তোমার লটবহর সব রেখে আসা হয়েছে। তুমিও ফ্রেশ হয়ে এখানে চলে এসেছ। তোমার রাজ এস্টেট থেকে আসা তিনজন অ্যাটেনডেন্ট কিছুক্ষণের ভেতরে ব্যারাক থেকে এখানে এসে যাবে। তারাই নিয়ে আসবে তোমার দরকারি সব জিনিসপত্র। ভ্যালির দিকে ওই যে দেখছ গেস্টহাউস, ওটাতেই তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

সকাল দশটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেনা ছাউনির দিকে চলে যাব। তার আগে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি নিয়ে নিতে হবে। লাঞ্চ হবে ওখানে। আবার শেষবেলায় ফিরে এখানে কফি, ডিনার ইত্যাদি।

দুজনে ডাইনিং-হলের দিকে পা বাড়ালেন। পরের দিন রোববার, কর্মবিরতি। লাঞ্চের পর জেনারেল অভ্যেসমতো অশ্বারোহণে ইউরোপিয়ান ক্লাবের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ইনডোর গেমে অংশ নেন তিনি।

যাওয়ার আগে পার্লকে বলে গেলেন, তুমি প্রিন্সকে ভ্যালিটা ঘুরিয়ে দেখাবে। একা একা গেস্ট হাউসে বসে থাকলে ওর ভালো লাগবে না।

দুপুরের দিকে প্রিন্সের অ্যাটেনডেন্টরা লটবহর এনে ফেলল গেস্ট হাউসে। অল্প

সময়ের ভেতর অতিথিনিবাসের রূপটাই বদলে গেল। কাশ্মীরি কার্পেট থেকে শৌখিন কয়েকটি বাতিদান, রুপো আর তামার তৈজসপত্র সবকিছুই যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা হল। গেস্ট হাউসের সামনেও একটি রোডোডেনড্রন বৃক্ষ, তার তলায় মরশুমি ফুলের বেড। পূর্বদিকের পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে বহু নিচে। আঁকাবাঁকা একটি ঝরনার জল ঝিলিক দিচ্ছে সূর্যালোকে। সেই ঝরনার দুই পারে সবুজ শ্যামল বনভূমি। পাহাড়ের কোলে এসে শেষ হয়েছে সেই বন।

গৃহশয্যার দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হল যুবরাজ প্রীতম। অ্যাটেনডেন্টরা চলে গেল তাদের জন্য নির্দিষ্ট পাশের কোয়ার্টারে।

কলিং-বেল হিসাবে রাজবাড়ির পদ্ধতি অনুযায়ী একটি ঘণ্টা দোলানো হয়েছে দরজার মাথায়। একটি কুর্সিতে বসে সংস্কৃত মহাভারতের পাতা ওলটাচ্ছে যুবরাজ।

রামপুর রাজ এস্টেটের সম্মানীয় সভাপণ্ডিত ছিলেন কাশী থেকে আগত পণ্ডিত দীননাথ চতুর্বেদী। তাঁর কাছে বাল্যকাল থেকে সংস্কৃত পাঠ নিয়েছিল যুবরাজ। প্রীতমের সুরেলা কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণ শুনে রাজপ্রাসাদের প্রায় সকলেই ধন্য ধন্য করত। সেই থেকে পণ্ডিত দীননাথের তত্ত্বাবধানে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেছিল যুবরাজ।

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মেঘদূতম্, কুমারসম্ভবম্ প্রভৃতি তার বহুবার পড়া হয়ে গিয়েছিল। একসময় সেই গ্রন্থগুলিই ছিল যুবরাজের সঙ্গী, তাই সিমলাতেও এই গ্রন্থগুলি তার জন্য আনা হয়েছে।

মধ্যাহ্ন আহারের পর কাঠের কুর্সিতে বসে যুবরাজ নানা কথা ভাবছিল হঠাৎ তার ভাবনার পথে এসে দাঁড়াল একটি ছায়ামূর্তি। স্পষ্ট চিনতে না পারলেও একটা বহুচেনা মুখ তার চোখের ওপর ভেসে উঠল আর সেই মুহূর্তে কার বিরহে যেন আনচান করে উঠল প্রীতমের হৃদয়।

বাইরে কোথাও মেঘসজ্জা হয়েছে। বাতাসে ভর করে একটা গুরু গুরু ধ্বনি ভেসে আসছে। যুবরাজ উৎকর্ণ হল।

জানালাটা খুলে দিতেই ভ্যালির ওপারে দেখা গেল একতাল নীলকৃষ্ণ মেঘ বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে আকাশে পাখা মেলে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

সেই মুহূর্তে স্মরণে এল তার মেঘদূতের কয়েক ছত্র।

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং
বপ্র ক্রীড়া-পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।'

(আষাঢ়ের প্রথম দিবসে পর্বতের সানুদেশে উৎখাত কেলিতে রত প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মেঘের ক্রীড়া দেখতে পেল বিরহী যক্ষ।) মেঘের সেই রূপ দেখে হাহাকার করে উঠল যুবরাজের চিত্ত। ছায়াপথে দাঁড়িয়ে থাকা চূর্ণকুন্তলা সেই বিরহিণী যক্ষপ্রিয়াকে সে আর দেখতে পেল না।

সহসা ঘরের বাইরে ঘণ্টাধ্বনি হল। উঠে দাঁড়াল যুবরাজ। পর্দা সরাতেই দেখল অসাধারণ মেঘনীল পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে অন্য এক নারী। সস্মিতমুখে সে দাঁড়িয়ে আছে অতিথির অপেক্ষায়।

ভেতরে আসুন মিস পার্ল।

আগেই ঘরের জানালা খুলে দেওয়া হয়েছিল। বাইরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ঘরের ভেতরটা।

ঘরে ঢুকে কার্পেটে পা রেখেই চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে সে সারা ঘরটা একবার দেখে নিল।

মুগ্ধ গলায় বলল পার্ল, ঘরের আদলই একেবারে বদলে ফেলেছেন যুবরাজ!

প্রীতম বলল, আমার বুশেহারের ঘরখানা যেভাবে সাজিয়ে রাখে ওরা এখানেও সেরকমই চেষ্টা করেছে।

পার্ল বলল, একেবারে সবকিছুর ভেতরে শিল্পের ছোঁয়া।

এবার জানালার বাইরে তাকিয়ে রোদ্দুরের রং বুঝে নিয়ে পার্ল বলল, ঘোড়া তৈরি, বেড়াতে যাবেন না?

অবশ্যই। রাতে মিঃ রস যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁকে আমার সান্ধ্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে হবে তো।

পার্লের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা।

আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, আপনি তৈরি হয়ে আসুন। সহিসরা উতরাই-এর পথে ঘোড়া দুটো প্রস্তুত করে রেখেছে।

অশ্বারোহণের আঁটোসাঁটো পোশাক পরে, মাথায় রাজকীয় পাগ্ (পাগ্‌ড়ি) জড়িয়ে সুন্দরকান্তি যুবরাজ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। গলার মুক্তোর মালা বুক স্পর্শ করে আছে। সিংহল থেকে আগত এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই অমূল্য মুক্তামালাটি বুশেহার- রাজকে অর্পণ করেছিলেন। সেই দুর্লভমালা এখন যুবরাজের সম্পত্তি।

আলোয় অপরাহ্ণের ছোঁয়া লাগলেও দীপ্তি কমেনি। তরুণ যুবরাজের সমস্ত অবয়বে সেই আলো এসে পড়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে পার্লের মনে হল, সে যেন কোনও অ্যাঞ্জেলকে দেখছে।

সাদা ঘোড়ায় আরোহী হয়ে বসেছে পার্ল। সাদা লেসের কাজ করা টপের ওপর মেঘনীল রঙের টিউনিকে পার্লও অনন্যা।

সামনে চলেছে অশ্বারোহণে পার্ল, ঠিক তার পেছনে কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পার্লকে অনুসরণ করছে যুবরাজ।

আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাস্তা ধরে ভ্যালিতে নেমে যাচ্ছে তারা। কেবল রাশ টেনে ধরে আছে আরোহী, তাদের নিয়ে অবলীলায় নেমে চলেছে সুশিক্ষিত দুটি অশ্ব।

পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে সারিবদ্ধ সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাইন আর দেওদার বৃক্ষরাজি।

ভ্যালির যত নিচের দিকে নামছে, যুবরাজের ততই মনে হচ্ছে, কোনও এক অরণ্যরাজ্যে তারা যেন ঢুকে পড়ছে অনাহুত অতিথির মতো।

অবশেষে তারা ঝরনাটির কাছে এসে পৌঁছল। এখানে পশ্চিম থেকে পুবে হাঁসুলির মতো একটা বাঁক নিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে ঝরনা। বাঁকের মুখে রেখে যাচ্ছে ছোট বড় কতকগুলি নুড়ির সঞ্চয়। নুড়ি আর বালুকণার থেকে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দুটো পাইনগাছ। সজল ধারায় সিক্ত গাছের কাণ্ড।

এখানেই পার্ল ঘোড়া থেকে নামল। তাকে অনুসরণ করে লাফিয়ে নিচে নামল কালো ঘোড়ার সওয়ার।

পাশেই একটা পুরানো রোডোডেনড্রন গাছের কাণ্ডে ঘোড়াদুটিকে বাঁধা হল। এবার পার্লকে অনুসরণ করে ঝরনার ধারে একটি মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর এসে বসল দুজনে। সেই প্রস্তরখণ্ডের গা ছুঁয়ে কলকলধ্বনি তুলে ছুটে যাচ্ছিল ঝরনা। ঠিক তার সামনেই পাইনগাছ দুটি দূর পাহাড়ে থেকে বয়ে আসা হাওয়ার ছোঁওয়ায় সরু সরু পাতায় সেতারের সুর তুলছিল।

মুগ্ধ যুবরাজ বলল, এমন একটা মনোরম জায়গা আবিষ্কার করলে কী করে?

একটা ম্লান ছায়া ঘনাল পার্লের মুখে।

আমি যখন হোম থেকে এখানে আসি তখন মা হারানোর দুঃখ ভোলাবার জন্য বাবা রোজ বিকেলে এই ভ্যালিতে আমাকে বেড়াতে নিয়ে আসতেন। প্রকৃতি চিরদিনই আমার প্রিয়, তাই বিশেষ করে এই স্পটটার প্রেমে আমি পড়ে যাই। তারপর কাজের চাপে বাবা যখন এই বিকেলের ভ্রমণে যোগ দিতে পারত না তখন মেজর এরিককে আমার সঙ্গী করে পাঠাতেন। মানুষটি অশ্বচালনায় বড় দক্ষ। অত্যন্ত সাহসী, নির্ভীক যোদ্ধা।

বাকিংহাম প্যালেসের নিরাপত্তা রক্ষীরূপে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কোনও লর্ড পরিবারের সঙ্গে রক্তের যোগ ছিল তাই অনেক কম বয়সেই পদোন্নতি হয়েছিল তাঁর। সেখান থেকেই কর্মসূত্রে সিমলায় ব্রিটিশ রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছেন।

হেসে আবার বলল, বয়সের তুলনায় মেজরের পদটা একটু ভারী বই কি।

একটু থেমে আবার বলল, ব্যারাকে যখন যাবে তখন মেজর এরিকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। প্রশিক্ষক হিসাবে বেশ কড়া। বাবা বলেন, স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন মেইনটেন করে মি: এরিক।

হঠাৎ একটি চঞ্চল হরিণীর মতো উলটোদিকে লাফ দিয়ে ডাঙায় নেমে পড়ল পার্ল। যুবরাজের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, নেমে আসুন প্রিন্স।

অসংকোচে প্রীতম সিংয়ের হাত ধরে প্রায় লাফাতে লাফাতে সে দাঁড়াল গিয়ে একসারি পাইনগাছের তলায়। এখানে দৃঢ়সন্নদ্ধ্য দীর্ঘ পাইনের সারি এই বিশাল উপত্যকাটিকে পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ করে রেখেছে।

পার্ল গাছের ফাঁকে আঙুল তুলে বলল, পশ্চিমদিকের ওই ভ্যালিতে যাবার হুকুম নেই। ব্যারাকের উঁচু পাহাড় থেকে গোলন্দাজ সৈন্যেরা ওই ফাঁকা উপত্যকায় প্র্যাকটিস করে।

বলতে বলতেই কামানের গোলা-বর্ষণের শব্দ শোনা গেল। পর পর প্রায় তিরিশটি গোলা ছোঁড়া হল। উত্তরদিকে দেওয়ালের মতো যে শৈলশিরাটা চলে গেছে তারই গায়ে আছড়ে পড়ছে জ্বলন্ত গোলাগুলো। সারা উপত্যকা জুড়ে মেঘের গর্জনের মতো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কামানের শব্দ।

কিছুক্ষণ এমনই চলার পর থেমে গেল বর্ষণ।

পার্ল বলল, এরপর শুরু হবে রাইফেলে লক্ষ্যভেদ। ওই দেখ, সারি সারি খুঁটি পোঁতা আছে, তার ওপর বসানো আছে জলভর্তি মাটির কলস। ওপর থেকে পর পর গুলি ছুঁড়ে ওই জলভর্তি মাটির কলসগুলিকে বিদ্ধ করতে হবে। এইভাবেই চলবে লক্ষ্যভেদ। হাঁড়ি ভাঙবে আর চল্‌কে উঠবে ভেতরের জল।

এখানে সন্ধ্যা নামার পরেও আলোর একটা আভা দীর্ঘসময় ধরে চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সেই আলোয় অশ্বারোহণে ফিরছিল পার্ল আর প্রীতম।

চড়াই ভাঙতে ভাঙতে পার্ল বলল, আশা করি আজকের ভ্রমণ আপনি উপভোগ করেছেন।

উপত্যকার অপার সৌন্দর্য,—তার নিভৃত কুঞ্জগুলি, বহমান ঝরনা ধারার কলধ্বনি, পাইনের পাতায় সেতারের সুর আমাকে সত্যিই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাছাড়া গোলাবর্ষণের মহড়া আমি বিশেষ আগ্রহে উপভোগ করেছি। এই সামান্য উপত্যকায় সৃষ্টি আর ধ্বংসের পাশাপাশি লীলা আমাকে জীবন সম্পর্কে নতুন শিক্ষা দিয়েছে।

পার্ল বলল, প্রীতম, আপনি যুবরাজের ছদ্মবেশে একজন দার্শনিক।

প্রীতম বলল, রাজার বাড়িতে জন্ম নেওয়ার ফলে আমাকে দেশরক্ষার কাজে যুক্ত থাকতে হয়, কিন্তু মনেপ্রাণে আমি শিল্প সাহিত্য ভালোবাসি। কিন্নর-কিন্নরীদের উৎসব অনুষ্ঠানে আমি সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে আনন্দ পাই।

হেসে বলল পার্ল, আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শেখার ব্যাপারে আপনি একেবারে বেমানান।

আপনার ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। তবু আপনার পিতার পরামর্শ আর আমার পিতার আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি।

একটা কঠিন চড়াইতে ওঠার সময় পার্ল প্রীতম সিংকে সাবধান করে দিল, অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে, ঘোড়ার লাগাম ধরে স্থির হয়ে বসে থাকুন। আমাদের ঘোড়া অত্যন্ত হুঁশিয়ার, ওরা আমাদের পথ চিনে যথাসময়ে নির্দিষ্ট আস্তানায় পৌঁছে দেবে।

ওরা অল্পদূর থেকে দেখল, মিঃ রসের কোয়ার্টার আর নিচের গেস্ট হাউসে আলো জ্বলে উঠেছে।

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে সহিসরা পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা দুজনে নেমে যে যার আস্তানার দিকে চলে গেল।

গেস্ট হাউসে নেমে যাওয়ার আগে অন্ধকারে কয়েকটি শব্দ ভেসে এল, আজকের যাত্রায় আমার পরম লাভ, আমি একজন বন্ধু পেলাম।

যুবরাজ থমকে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে বলল, আমাদের এ বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়।

আট

পাশাপাশি চলল যুবরাজের উন্নত যুদ্ধকৌশল শিক্ষা আর দিনান্তের অবসরে পার্লের মুখোমুখি বসে কালিদাসের কাব্যপাঠ।

অল্পদিনের ভেতরেই দুটি প্রদীপ্ত যৌবন পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করল।

কোনওদিন বা বিরতি পড়েছে তাদের সান্ধ্য-ভ্রমণে। যুবরাজের বিশ্রাম-কক্ষে বসে বাতায়ন খুলে দিয়ে তারা দেখেছে কৈলাস পর্বত লক্ষ্য করে মেঘেদের যাত্রা। বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মেঘমন্দ্র প্রতিধ্বনিত হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। বাতাস বয়ে

এনেছে জলকণা, সিক্ত আর রোমাঞ্চিত করে দিয়ে গেছে দুজনের দেহ মন। অন্ধকারেও নির্বাণ-দ্বীপ গৃহে দুজনে অনুভব করেছি দুজনকে।

চকিত বিদ্যুৎ চমকে মাঝে মাঝে দুজনকে দুজনে দেখে নিচ্ছে।

মেঘদূতের শ্লোকগুলি উচ্চারিত হচ্ছে যুবরাজের কণ্ঠে। মাঝে মাঝে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে প্রীতম। গভীর মগ্নতায় বন্ধুর হাতে হাত রেখে সেই শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি আর অনুভব করছে পার্ল।

যুবরাজ শুরু করল এইভাবে,—এই তুষারমৌলি হিমাচলপ্রদেশে ধনপতি কুবেরের অলকাপুরী। কুবেরের ধন রক্ষা করে যে সব কর্মচারী, তারাই যক্ষ। জানবে কিন্নরবাসী আমাদের সঙ্গে যক্ষ সম্প্রদায় প্রায় অভিন্ন, কারণ কুবেরকে বলা হয় কিন্নরেশ্বর।

সদ্য বিবাহিত এক তরুণ যক্ষ একসময় শাপগ্রস্ত হল। বিবাহের রোমাঞ্চিত মুহূর্তগুলি সে গভীরভাবে উপভোগ করতে গিয়ে নিজের কর্তব্যকর্মে অবহেলা করল। আর এই অপরাধে প্রভু কুবের তাকে চরম এক দণ্ড দিলেন।

সামান্য সময় থামল যুবরাজ।

উৎকণ্ঠিত পার্ল জানতে চাইল, কী সে শাস্তি প্রীতম?

যুবরাজ বললেন, বড় অদ্ভুত, বন নির্মম সে শাস্তি। একবছরের জন্য দম্পতিকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। সদ্য বিবাহের রোমাঞ্চিত মুহূর্তগুলি তারা উপভোগ করতে পারবে না।

একটা বেদনার শব্দ তুলে আহত পার্ল বলল, বড় নিষ্ঠুর এ অভিশাপ।

যুবরাজ প্রীতম বলল, আরও শোনো, কী পরিকল্পিত এই শাস্তি। প্রিয়ার কাছ থেকে বহুদূর এক পর্বতে নির্বাসনে যেতে হবে যক্ষকে। সেই রামগিরি পর্বতে একসময় রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা রাম-সীতা নির্বাসনে কাটাচ্ছিলেন। তাঁরা পর্বত-সংলগ্ন সরোবরে স্নান করেছেন, কুটির নির্মাণ করে থেকেছেন মনোরম অরণ্যের মধ্যে। অযোধ্যা মহানগরী থেকে নির্বাসিত হয়েও তাঁরা পরস্পরকে নিবিড় সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন এখানে।

পরস্পরকে একান্তে পেয়ে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের রাজ্যসুখ।

নির্মম কুবের কিন্তু যক্ষ আর যক্ষপ্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিলেন। অলকাপুরীতে রইল যক্ষপ্রিয়া, আর বিরহী যক্ষ রইল রামগিরিতে।

রাম-সীতার মিলনের কথা ভেবে বিদীর্ণ হবে বিরহী যক্ষের হৃদয়, এজন্যে নির্বাচিত হয়েছিল এই রামগিরি পর্বত।

সদ্য বিবাহিতা বধূ মনের সন্তাপে কাল কাটাচ্ছে ভেবে অস্থির হয়ে উঠল নির্বাসিত যক্ষ। নিকটে এমন কাউকে পেল না যার মাধ্যমে প্রিয়তমার কাছে সান্ত্বনার বাণী পাঠায়।

এমনদিনে শুরু হল আষাঢ়ের মেঘসজ্জা। মেঘ চলেছে হিমালয়ের কোলে কুবেরের অলকাপুরী লক্ষ্য করে।

থামলেন যুবরাজ।

পার্ল বলল, আজ আকাশে যেমন মেঘসজ্জা হয়েছে, সেদিনও তেমনই এক মেঘসজ্জা হয়েছিল রামগিরি পর্বতে,—তাই না যুবরাজ?

মৃদু হেসে বললেন প্রীতম সিং, তুমি এক মগ্নমুগ্ধ শ্রোতা মিস পার্ল। হ্যাঁ, তোমার অনুমানই সত্য। এবার শোন, বিরহীদের চিত্ত কীভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়।

মেঘ যে অচেতন, সে বোধ লুপ্ত হয়ে গেল প্রিয়া-বিরহী যক্ষের। পাহাড়ের গায়ে ফুটে থাকা কুর্চিফুল তুলে এনে অঞ্জলি ভরে সে মেঘের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে বলল, পুষ্কর, আবর্তক বংশে তোমার জন্ম, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান পুরুষ-তাই তোমার কাছে আজ আমি প্রার্থী।

আবার থামলেন যুবরাজ।

উৎসুক পার্ল জানতে চাইল, মেঘের কাছে কী প্রার্থনা যুবরাজ?

প্রীতম সিং সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করল,—

'সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা।।'

(হে মেঘ, সন্তপ্ত প্রাণীর তুমিই আশ্রয়। ধনপতি কুবেরের ক্রোধে আমি প্রেয়সী থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার সংবাদ তুমি প্রিয়ার কাছে বয়ে নিয়ে যাও। সেখানে বাহিরের উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরের মূর্তি। মহাদেবের ললাটস্থিত চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় নগরীর সৌধগুলি বিধৌত। যক্ষপতির আবাসভূমি সেই অলকায় তোমাকে যেতে হবে।)

মেঘের যাত্রাপথের অপূর্ব সব বর্ণনা দিয়েছেন কবি কালিদাস। নদ-নদী, নগরী, শস্যশ্যামল জনপদের ওপর দিয়ে কখনও ছায়াবিস্তার করে, কখনও বা মৃদুবর্ষণে প্রকৃতিকে সিক্ত করে মেঘ যাত্রা করছে অলকার উদ্দেশ্যে।

শ্যামল বনভূমি প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে বর্ষার পুষ্পসম্ভারে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে তরুশাখায় কদম্বপুষ্পগুলি।

মেঘের যাত্রাপথে তৃষ্ণার্ত স্রোতস্বিনীরা তাকিয়ে আছে ধারাবর্ষণের প্রত্যাশায়। মেঘ সলিলবর্ষণ করে তৃষ্ণা নিবারণ করছে তাদের।

কোথাও বা কালিদাস এক একটি চিত্র অঙ্কন করছেন,—

'ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদগৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবণিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জন্যো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ।।'

(বায়ুপথে তোমাকে উড়তে দেখলে বিরহিণী পথিক-বধূদের মনে আশার সঞ্চার হবে। চূর্ণ কুন্তলগুলি তারা হাত দিয়ে সরিয়ে তোমাকে দেখবে। আমার মতো পরাধীন ব্যক্তি ছাড়া আর কেই বা আছে যে তোমার উদয়ে বিরহ ব্যাকুলা প্রিয়তমাকে উপেক্ষা করবে?)

মুগ্ধ হয়ে প্রীতমের মুখে মেঘদূতের শ্লোকগুলি শুনছিল পার্ল। শব্দগুলি তার কানে আশ্চর্য এক সংগীতের ধ্বনি তুলে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মাঝে মাঝে ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করে অর্থগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিল যুবরাজ।

পার্ল একসময় বলে উঠল, তুমি শুধু আবৃত্তি করে যাও, আমি অর্থ না বুঝলেও ছন্দের দোলা আমার হৃদয়কে ঝংকৃত করে তুলবে।

যুবরাজ বলল, আজ ইতি হোক এইখানে। মিঃ রসের কোয়ার্টারে ফেরার সময় হল।

মন না চাইলেও উঠতে হল পার্লকে। কোয়ার্টারের দিকে এক পা বাড়িয়েই প্রীতমের দিকে ফিরে দাঁড়াল পার্ল।

একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে, বলতে পারি কি?

অবশ্যই, দ্বিধা কেন?

পার্ল বলল, তুমি যখন তন্ময় হয়ে শ্লোকগুলো আবৃত্তি করে যাও তখন তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তুমি যেন স্বয়ং সেই বিরহী যক্ষ, এই সিমলা শৈলে নির্বাসিত হয়ে আছ। কোথাও কোনও প্রিয়তমা কি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে?

যুবরাজ বলল, এ প্রশ্নের উত্তর কি আজ চাও?

পার্ল সঙ্গে সঙ্গে বলল, না, কাল যদি বর্ষণ না হয় তাহলে ভ্যালির ওই ঝরনার কোলে পাইনের তলায় বসে আমার প্রশ্নের উত্তরটা শুনব।

পাইনের তলায় বসে যুবরাজ বলল, তুমি কি তোমার হাতখানা আমাকে ধরতে দেবে পার্ল?

পাশে বসে থাকা পার্ল বাড়িয়ে দিল তার হাতখানা প্রীতমের দিকে।

প্রীতম পার্ল-এর হাতখানা মুঠোর ভেতর ধরে নিয়ে বলল, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু পার্ল। কেবলমাত্র বন্ধুর কাছেই বন্ধু তার হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতে পারে। তুমি কি আমাকে তোমার বন্ধু বলে স্বীকার কর পার্ল?

এ কি বলার অপেক্ষা রাখে? তুমি কি এখনও অনুভব করতে পারনি প্রীতম?

যুবরাজ আবার বলল, তুমি কি বিশ্বাস কর স্বামী স্ত্রী যে কথা পরস্পরের কাছে বলতে পারে না, বন্ধুর কাছে তা অসংকোচে বলতে পারে।

পার্ল হেসে বলল, আমি এখনও বিবাহিত নই প্রীতম তাই তোমার কথাটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না।

যুবরাজ বলল, আমার সমবয়সি বিবাহিত এক বন্ধু আমার কাছে এমন এক গোপন কথা বলেছিল যা সে তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর কাছে বলতে সাহস করেনি।

এই সমস্যাটাকে পার্ল আর দীর্ঘায়িত করতে চাইল না। সে বলল, আমি তোমার কথা সমর্থন করছি প্রীতম।

এবার দুহাত দিয়ে পার্লের হাতখানা জড়িয়ে ধরল প্রীতম। বলল, কাল তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তরে জানাই, এক সময় কুমারী এক গ্রাম-কন্যাকে আমি হৃদয় দিয়েছিলাম। কিন্নরের এক তহশিলে বুশেহার রাজ এস্টেটের একটি দুর্গ আছে।

ফুলেচ্ উৎসবে যোগ দিতে মহারাজের সঙ্গে আমিও সেই দুর্গে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলাম।

পাহাড়ের কোলে দুর্গম অরণ্য থেকে যুবকেরা ফুল সংগ্রহ করে দেবতাকে নিবেদন করত আর অবশিষ্ট ফুল নিয়ে জ্যোৎস্নারাতে অরণ্যের আড়ালে প্রেমিকাকে সাজাত।

সেই গ্রাম-কন্যার নৃত্যগীত আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে আমি তার আকর্ষণ এড়াতে পারিনি। দুর্গ থেকে বেরিয়ে ভেড়াচারকের ছদ্মবেশে আমি কয়েকদিন দূর নির্জন পথে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি।

অবশেষে মহারাজের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় হলে আমাকেও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসতে হয়। সেদিন থেকে ওই গ্রাম-কন্যাটির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই আমার।

তারপর রাজকার্যে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল। সিংহাসনের পরবর্তী অধিকারী হিসাবে মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে মন্ত্রী পরিষদ আমাকে নানাধরনের রাজকার্যে যুক্ত করে রাখলেন। সেই সূত্রে আজ আমি সিমলায় অবস্থান করছি। জানি না কতদিনে আমার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হবে।

যুবরাজ থামলে পার্ল জানতে চাইল, এখনও কি তুমি সেই কন্যাটিকে স্মরণ কর?

যুবরাজ বলল, সত্য বলতে কী, তার স্মৃতি আজ আমার মনে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

পার্ল বলল, এখনও কি সেই মেয়েটি তোমার পথ চেয়ে বসে আছে?

আমি পরে বুঝেছি কাজটা আমার সঙ্গত হয়নি। রাজ পরিবারের সঙ্গে সাধারণত রাজ পরিবারেরই মিলন হয়। সে ক্ষেত্রে সামাজিক এই অসম প্রেম স্বীকৃতি পাবে না।

পার্ল বলল, কিন্তু যুবরাজ তুমি যত সহজে সামাজিক দোহাই দিয়ে প্রেমের বাঁধনকে ছিন্ন করতে পারলে, সত্যকারের প্রেম কিন্তু অত সহজে ছিন্ন হওয়ার নয়। তুমি কি জানো, এখনও তোমার প্রেমিকা তোমার পথ চেয়ে বসে আছে কিনা?

প্রীতম বলল, আমার মনে হয় সে এতদিনে সামাজিক ব্যবধানের নির্মম সত্যটা বুঝে গিয়েছে।

যুবরাজ এখনও তুমি কিন্তু সেই গ্রাম-কন্যাটিকে ভুলতে পারনি। মেঘ দেখলে এখনও তোমার বিরহী হৃদয় তার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। তার সান্নিধ্য কামনা কর তুমি।

তোমার এই মন্তব্যকে অসত্য বলে সরিয়ে দেব সে শক্তি আমার নেই পার্ল। তবে এই মিলন যে অসম্ভব তাও আমি জেনে নিয়েছি। তাছাড়া, এতদিনে হয়তো সে সামাজিক নিয়মে নতুন সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে। সে যেখানেই থাকুক, সে সুখী হোক, আনন্দিত হোক এই আমার অন্তরের কামনা।

নয়

মেজর এরিকের তত্ত্বাবধানে কঠিন ট্রেনিং শুরু হয়েছে যুবরাজ প্রীতম সিংয়ের। নিজের রাজ্যে অস্ত্র, বল্লম আর ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছিল যুবরাজ। বন্দুকের নিশানায়ও দক্ষতা অর্জন করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ রেজিমেন্টের শিক্ষার পদ্ধতিই আলাদা। সামান্য ত্রুটিতেও শাস্তি পেতে হয় এখানে। রাজকুমার বলে এক্ষেত্রে নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। টার্গেট মিস করলে দুর্গম চড়াই ভেঙে পাহাড়ের ওপর উঠতে হয়, আবার সেখান থেকে দ্রুত নেমে আসতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। সময়ের হেরফের হলে অন্য একটা শাস্তি অপেক্ষা করে থাকে। অমসৃণ পাথরের টুকরোর ওপর কখনও বা খোলা গায়ে গড়াগড়ি দিতে হয়। ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় শরীর। তবু প্রতিবাদ করার কোনও উপায় নেই। দিনান্তে শিক্ষাপর্বের শেষে হয়তো বা একটা মলম দেওয়া হয় ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়ার জন্য। প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী যুবরাজ প্রীতম সিং সহজে কাতর হয়ে পড়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

শেষবেলায় অতিথিনিবাসে ফিরে এসে সে সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য পার্লের পথ চেয়ে বসে থাকে। পার্ল নেমে এলেই দুজনে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ে। এই সান্ধ্য- ভ্রমণটুকুই এখন যুবরাজের একমাত্র সান্ত্বনা। কঠিন পরিশ্রমে কখনও কখনও শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি পায় যুবরাজের। দুচোখ বন্ধ করে শয্যায় শুয়ে সে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করে। কোনওদিন দেখে নিঃশব্দ পায়ে পার্ল এসে বসে আছে তার শয্যার পাশে। ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়ে সে ওষুধ আর পথ্য খাইয়ে যায়।

স্তিমিত দীপালোকে যুবরাজ চোখ খুলে দেখতে পায় এক সেবাময়ী নারীকে,—যে তার বন্ধু আবার প্রেমিকাও।

মাঝে মাঝে ভ্যালিতে সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় পাইনে ছাওয়া পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রোদয় হয়। অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বসে থাকা দীর্ঘদেহী সুপুরুষ প্রীতমকে রূপকথার দেশ থেকে নেমে আসা কোনও রাজপুত্র বলে মনে হয় পার্লের।

মন নিজের সঙ্গে আরও কত কথা বলে। এই প্রার্থিত পুরুষের সঙ্গে সংসার রচনার একটা প্রবল ইচ্ছা জেগে ওঠে মনে। রাজকন্যা না হলেও এক বিখ্যাত রাজপুরুষের কন্যা সে। তাকে হয়তো বুশেহার-মহারাজের বধূরূপে গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়ার কথা নয়। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না সে। বিধর্মী বলে যদি তাদের পাঠানো প্রস্তাব রাজগৃহ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে সে অসম্মান সহ্য করা তার পিতা জেনারেল রসের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তখন চারদিক থেকে বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠবে। যুবরাজকে চলে যেতে হবে সিমলা ছেড়ে। এই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠবে পার্লের কাছে।

তার চেয়ে নীরবে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করল পার্ল। যতদিন শিক্ষাপর্ব চলবে ততদিন সে চোখের সামনে দেখতে পাবে প্রীতমকে। তার প্রাণের একান্ত প্রিয় যুবরাজ।

ঋতুপর্বে দশটি বর্ষা দশটি বসন্ত পার হয়ে চলে গেল। পার্ল আর যুবরাজ সিক্ত হল বর্ষাধারায়, বসন্তের উতল হাওয়ায় উদ্বেল হল দুটি মিলন-সমুৎসুক মন, তবু একান্ত কাছে থেকেও দূরে রইল দুজনে। নিষ্ঠুর বিধাতা কোথায় যেন বিরহের একটা গণ্ডি টেনে রেখেছেন যাকে অতিক্রম করা আর সম্ভব হল না।

এদিকে দীর্ঘ দশটি বছরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে যুবরাজের,—এবার ঘরে ফেরার পালা।

প্রতি বছর একবার করে নিজরাজ্যে যায় যুবরাজ, পিতার আশীর্বাদ নিয়ে আসে। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি তাই প্রাসাদে দীর্ঘসময় থাকা সম্ভব হয় না। পুত্রস্নেহাতুর পিতাও শিক্ষায় বিঘ্ন ঘটবে বলে পুত্রকে কাছে রেখে দিতে পারেন না।

এতগুলি বছরেও রোজকার নিয়মে ব্যতিক্রম হয় না পার্ল আর যুবরাজের। ব্যারাক থেকে ফিরে আসার পর সেই সান্ধ্য-ভ্রমণে দু বন্ধুকে ভ্যালিতে গিয়ে বসতে দেখা যায়। কখনও বা ক্লান্ত যুবরাজ পার্লের কোলে মাথা রেখে নীলাকাশে ভাসমান চন্দ্রের কিরণ গায়ে মেখে অবসাদ দূর করতে থাকে। অসীম মমতায় প্রিয়জনের কেশগুচ্ছ নিয়ে আনমনে খেলা করতে থাকে পার্ল। কোনওদিন বা যুবরাজের কাছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গল্প শুনতে চায় সে।

শকুন্তলার গল্প শুনতে শুনতে সে নিজেই তপোবন-কন্যা শকুন্তলায় রূপান্তরিত হয়ে

যায়। সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে অরণ্যের অন্তরালে মহারাজ দুষ্মন্তের অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনার অপেক্ষায়।

সব বিষণ্ণতা, সব বিপর্যয় কাটিয়ে যখন মিলন হয় দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার তখন গভীর আনন্দে ভরে যায় পার্লের বুভুক্ষু হৃদয় নিজেরই অজান্তে সে দু হাতের ভেতর মুঠো করে ধরে রাখে যুবরাজের হাতদুটি।

মাঝে মাঝেই এই ঘনিষ্ঠ মিলনের ছবি ধরা পড়ে আর একজনের দৃষ্টিতে। উঁচু ব্যারাকের আড়াল থেকে মেজর এরিক লক্ষ করে তার প্রার্থিত নারীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য।

ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এরিক এক রবিবার চার্চে যাওয়ার পথে দেখা করে পার্লের সঙ্গে।

শুভ্র পোশাকে রাজহংসীর মতো চার্চের দিকে নেমে যাচ্ছিল পার্ল। পাইনগাছের ফাঁকে চাঁদের আলো আলোছায়ার রহস্য সৃষ্টি করছিল।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এরিক পার্লের মুখোমুখি দাঁড়াল।

গলায় হতাশার সুর, এরিক বলল, আজও কি আমার কথা ভেবে দেখার সময় হয়নি পার্ল?

তুমি আজও আমার ভালো বন্ধু এরিক, কিন্তু তোমাকে নিয়ে সংসার রচনার কথা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি আমি।

এবার কঠিন হল এরিকের কণ্ঠস্বর, তুমি কি অন্য কাউকে নিয়ে সংসার রচনার স্বপ্ন দেখছ পার্ল?

একথা কেন?

পথ থেকে সরে দাঁড়াল এরিক। বলল, উপত্যকার স্বপ্নময় ছবিগুলো কি সেই আভাস দিচ্ছে না পার্ল?

বুঝেছি, তুমি যুবরাজের সঙ্গে আমার সান্ধ্য-ভ্রমণের প্রসঙ্গটা টেনে আনতে চাইছ। কিন্তু এরিক, যুবরাজ আসার আগে আমি কি দীর্ঘদিন তোমার সান্ধ্য-ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে উপত্যকায় নেমে যাইনি? সেদিন তোমার সঙ্গে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল আজ যুবরাজের সঙ্গে তার চেয়ে অতিরিক্ত কোনও সম্পর্ক আমার নেই। দুজনেই তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এরিক।

চার্চে প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে উঠল। এরিক বলল, তুমি এগোও আমি আসছি।

উতরাইয়ের রাস্তায় নেমে চলে গেল পার্ল। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবিশ্বাসের একটা কালো অন্ধকার গ্রাস করে ফেলল মেজর এরিককে। তার অবরুদ্ধ কামনা প্রতিহিংসার রূপ নিয়ে দংশন করতে চাইল তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল রস স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার পাঠালেন বুশেহার-রাজের কাছে। সে একটি পত্র বহন করে নিয়ে গেল।

মহারাজ জেনারেলের পত্রটি খুলে পড়তে লাগলেন,—

মহামান্য রাজাবাহাদুর,

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ জানাই।

অতি আনন্দের সংবাদ এই যে আপনার সুযোগ্য পুত্র এতদিনে সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। পৃথিবীর যে কোনও শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করেছে সে। আধুনিক যুদ্ধের সকল কৌশলই এখন তার করায়ত্ত।

এখন যুবরাজ নিজরাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আপনি তাকে সসম্মানে সিমলা থেকে বুশেহারে নিয়ে গেলে আমি গভীর তৃপ্তি লাভ করব।

এ ব্যাপারে আপনার কাছে আমি নতুন একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। আপনি বিবেচনা করে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলে তবেই আমি পরিকল্পনা রূপায়ণে অগ্রসর হব।

শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার রীতি আছে। যুবরাজের শিক্ষা যথার্থ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তার একটা পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে আপনার অনুমতির ওপর।

আপনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর কোটগড় রাজ্য নিজ অধিকারে রেখে শাসন করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাজ্য আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দুর্বৃত্ত গুর্খাবা ভোগ দখল করছে। যুবরাজ যদি গুর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারে তাহলে সেটাই হবে যুবরাজের শিক্ষার পরীক্ষা। অবশ্য তার সঙ্গে থাকবে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান দক্ষ যোদ্ধা মেজর এরিক একেনবেরি।

এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত অভিমতের প্রতীক্ষায়।

আপনার বিশ্বস্ত
লেফটেন্যান্ট জেনারেল রস।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ প্রত্যুত্তরে লিখলেন,

সম্মানীয় লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল,

দশবছরের অধিককাল যুবরাজ আপনার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আপনি যথার্থ পিতার ভূমিকায় তার ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিচ্ছেন। তার পক্ষে যা মঙ্গলজনক তা যে আপনি করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কী।

ওট্‌গড় আমার হাতছাড়া হওয়ার পর থেকে আমি গভীর মর্মবেদনায় ছিলাম। এখন ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় যদি যুবরাজ হারানো সম্মান ফিরে পায় তাহলে ইংরেজ সরকারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকবে না।

যুবরাজ সিংহাসনে বসার আগে যদি এই কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারে তাহলে সারা কিন্নরবাসী যুবরাজের জয়ধ্বনি করবে।

আপনার প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে জানবেন।

আপনার একান্ত গুণগ্রাহী
বুশেহার রাজ যুগীন্দর সিং বাহাদুর।

গোর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল রস, মেজর এরিক এবং যুবরাজ প্রীতম সিংয়ের পরামর্শে স্থির হল, পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন যুবরাজ স্বয়ং। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অরণ্যের আড়াল দিয়ে যে পথ কোটগড়ের সীমান্ত অবধি চলে গেছে সেই পথে সৈন্য পরিচালনা করে নিয়ে যাবেন যুবরাজ প্রীতম সিং। এই পথের সমান্তরাল যে পথটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘাঁটি অবধি গিয়ে পৌঁছেছে, সেই পথে গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে যুবরাজকে সাহায্য করতে অগ্রসর হবেন মেজর এরিক।

দু'পক্ষ যখন গুর্খাদের ছাউনির কাছাকাছি এসে পৌঁছবে তখন আচমকা গোলাবর্ষণ শুরু করবেন ওপরের পাহাড় থেকে মেজর এরিক। গোলাবর্ষণে যখন গুর্খাবাহিনী হতচকিত হয়ে পড়বে তখন তাদের অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

জেনারেল রসের পরামর্শ সভায় এই পরিকল্পনা করা হলেও সিমলা থেকে কোটগড়ের পথে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে মেজর এরিক যুবরাজ প্রীতম সিংকে বললেন, এবার আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর পথ ভিন্ন হয়ে যাবে। আমরা দুজনেই দুটি পথে ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হব। আমি মনে করি কোটগড়ের সীমানায় এতগুলি সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার নিয়ে গেলে যে কোলাহলের সৃষ্টি হবে তাতে সজাগ হয়ে যাবে শত্রুপক্ষ। তার চেয়ে আমার একটা পরামর্শ তুমি ভেবে দেখতে পার।

যুবরাজ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পরামর্শটি শোনার জন্য মেজর এরিকের মুখের দিকে তাকালেন।

এরিক বললেন, সীমানা থেকে কিছুদূরে পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতরে তুমি সৈন্যদের রেখে অশ্বারোহণে দুজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাবে। সেখানে জঙ্গলের আড়াল থেকে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে। লক্ষ রাখবে আমি তোমার ওপরের পাহাড়ে পৌঁছে গেছি কিনা। অনুকূল পরিস্থিতি বুঝলে তুমি বিউগল্ বাজাবে। সেই শব্দ শুনে তোমার কাছে পৌঁছতে বাহিনীর অন্তত বিশ মিনিট সময় লাগবে। ততক্ষণে আমি গুর্খাছাউনি লক্ষ্য করে ওপর থেকে কামান দাগব। কামানের গোলাবর্ষণের ফলে শত্রুছাউনিতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা। এমনই গোলাবর্ষণ চলবে যতক্ষণ না অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী তোমার কাছে এসে পৌঁছয়। আমার গোলাবর্ষণ শেষ হলেও শুরু হবে তোমাদের আক্রমণ।

মেজর এরিকের শেষ পরামর্শটা যুক্তিযুক্ত মনে হল যুবরাজের।

একসময় সীমানার কিছুদূরে পৌঁছে যাত্রাবিরতি ঘোষণা করলেন যুবরাজ। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি দুজন অশ্বারোহী নিয়ে ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তোমরা আমার বিউগলের আওয়াজ শোনামাত্র দ্রুত অগ্রসর হবে।

কথাক'টি বলেই অশ্বারোহণে যুবরাজ এগিয়ে গেলেন। এখানে পথের ওপর পাহাড়টা নিচের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। অনেক নিচে বইছে খরস্রোতা শতদ্রু। মাঝে মাঝে পাহাড়ের শিথিল চূড়াগুলো ভেঙে নিচে পড়ে যায়। সে সময় কোনও পথচারী থাকলে ওই শিলাবর্ষণের ফলে মৃত্যু অবধারিত। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে মানুষ অথবা জীবজন্তু তাল পাকিয়ে শতদ্রুতে সলিল-সমাধি লাভ করে।

এ পথটি মেজর এরিকের বহুচেনা এবং তার প্ল্যানটিও পূর্বপরিকল্পিত।

সীমানায় দুই অশ্বারোহীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যুবরাজ, ওপরে কামান-শকটগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

সহসা শুরু হল কামান থেকে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ।

প্রথম কয়েকটি গোলার আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের চূড়া। মন-মন পাথর গড়িয়ে পড়ল হতভাগ্য তিন অশ্বারোহীর ওপর। যুবরাজের আর বিউগল্ বাজাবার অবকাশ রইল না।

পাথরের তলায় সমাধিস্থ হয়ে গেল তিনটি প্রাণ।

যুবরাজের পরিণতিটা স্বচক্ষে দেখলেন মেজর। উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় কাজটুকু সম্পন্ন করতে হবে। নিজেই বিউগল্ বাজাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে কামানের মুখ ঘুরিয়ে ছাউনির দিকে শুরু হয়ে গেল গোলাবর্ষণ।

এদিকে ঘাঁটির মুখে বড় ছোট অজস্র পাথরের ডাঁই দেখে থমকে দাঁড়াল সৈন্যবাহিনী। ততক্ষণে গোলাবর্ষণ থেমে গেছে। ওই ভাঙা পাথরের ওপর দিয়ে পুরো বাহিনী সীমানা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত গুর্খা ছাউনির মধ্যে।

কোটগড় ইংরেজের অধীনে এল। গভীর রাত্রে ম্যাসেঞ্জারের মুখে খবর পৌঁছল জেনারেল রসের কোয়ার্টারে। তিনি সে রাতে ব্যারাকেই ছিলেন।

বিজয় সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর দুঃসংবাদটিও তাঁর কানে এসে পৌঁছল।

পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই তিনি জানতেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা যে ঘটবে তা ছিল তাঁর কল্পনারও অতীত।

জয়ের আনন্দ পরিণত হল গভীর বিষাদে।

দশ

বৌদ্ধগুম্ফার ওপরের রাস্তায় সুদৃশ্য কঙ্কণীর তলায় বসেছিল এক বৃদ্ধা। নিচে ঝরনার কূল থেকে যে রাস্তাটা উঠে এসে ওপরের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে সেদিকে আকুল চোখে তাকিয়েছিল সে। বৃদ্ধাটি জানত, এই পথেই শ্রমণীরা স্নান সেরে জোমো-গুম্ফায় ফিরে আসবেন।

বামহাতে সিক্তবস্ত্র আর ডানহাতে কমণ্ডলুতে জল নিয়ে ওপরের রাস্তায় উঠে এলেন শ্রমণীরা।

বৃদ্ধার পাশ দিয়ে একে একে সবাই নেমে গেলেন বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গণে, কিন্তু একজন পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি নির্নিমেষ চেয়েছিলেন বৃদ্ধার মুখের দিকে। কুঞ্চিত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল বৃদ্ধাটির চোখের জল।

সন্ন্যাসিনী এগিয়ে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তুমি এখানে মা! কী হয়েছে তোমার?

বৃদ্ধা বললেন, আমার কিছু হয়নি মা, হয়েছে এক কিশোর মেষপালকের।

কী হয়েছে তার!

দুহাতে দুধের দুটো ক্যান নিয়ে পাহাড় থেকে সাংলায় নেমে আসছিল সে। বাস্পার পুলের ওপারে পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে যায়।

আকুল হয়ে জানতে চান শ্রমণী, কী হল তার?

ডান পা খানাতে ভীষণ চোট লেগেছে। আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। ডান হাতে ধরা দুধের একটা ক্যান তখনও মুঠোছাড়া করেনি সে।

বিহ্বল দৃষ্টিতে কতক্ষণ বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইলেন শ্রমণী। পরে বললেন, সে এখন কোথায়? কেমন আছে?

বৃদ্ধা বললেন, একদল রাখাল ওকে দেখতে পেয়ে আমার কোঠিতে রেখে যায়। তারা জানত, ও ছেলেটা আমার কাছে থাকে।

এবার স্পষ্ট জানতে চাইলেন শ্রমণী, এই হতভাগ্য কি যুবরাজের সন্তান?

হ্যাঁ মা, তোদের ওই সন্তানকে আমিই প্রতিপালন করেছি। এখন বড় হয়ে ও ভেড়াচারক হয়েছে।

আমি ওকে এই গুম্ফায় প্রভুর সেবার জন্য ভেড়ার দুধ নিয়ে আসতে দেখেছি মা। সে বলে গিয়েছিল, শীতের সময় আবার সে দুধ নিয়ে আসবে।

বৃদ্ধা বললেন, সুরমঙ্গল আমার কাছে জানতে চেয়েছিল তার মা এখন কোথায়?

আমি এই বৌদ্ধ-মন্দিরের নিশানা ওকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, তোর মায়ের থুতনিতে একটা কালো তিল আছে।

শ্রমণী বললেন, এই কঙ্কণীর তলায় ক'মাস আগেও বসেছিল দুধের পাত্রটি নিয়ে। আমরা যখন স্নান সেরে ফিরি তখন ও আমার মুখের দিকেই চেয়েছিল। কী জানি কেন ওর দিকে তাকিয়ে আমারও মনে হয়েছিল, ও প্রীতমের সন্তান। একেবারে যুবরাজের মুখের আদল। তুমি বল মা, এখন সে কেমন আছে?

কবিরাজ মশায় অনেক দাওয়াই দিয়েছেন, মালিশেরও ব্যবস্থা করেছেন। বাইরে বেরোতে না পারলেও ঘরের ভেতর এখন দেওয়াল ধরে হাঁটাচলা করতে পারে। তবে বেশিরভাগ সময় বিছানাতেই পড়ে থাকে। রাতে স্বপ্ন দেখে মা-মা বলে কেঁদে ওঠে। আমি প্রবোধ দিই। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে।

একটু থেমে বৃদ্ধা আবার বললেন, আমি এখন শক্তিহীন হয়ে পড়েছি মা। এত বড় ছেলেকে নিজের হাতে সেবা শুশ্রূষা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই পরামর্শের জন্য তোর কাছে ছুটে এসেছি।

স্থির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে শ্রমণী বললেন, আমি আমার সন্তানের কাছে ফিরে যাব মা। আমাদের কৃতকর্মের ফল সে কেন ভোগ করবে। সে কেন বঞ্চিত হবে তার মায়ের স্নেহ থেকে। তুমি যাও, আমি সংঘ জননীকে সব কথা জানিয়ে আমার সন্তানের কাছে ফিরে যাচ্ছি।

নিলম এখন ভেড়াচারক সুরমঙ্গলের মা। প্রবল শীতের সময় সে তার ছেলের সঙ্গে সাংলায় তার মা কুশলার কোঠিতে কাটায় দুমাস। বছরের বাকি সময় সে ছেলের সঙ্গে বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ভেড়া চরিয়ে বেড়ায়। গুহাতে থেকে খানা পাকায় ছেলে আর নিজের জন্য। ভেড়ার দুধে রুটি চুবিয়ে খায় মা আর ছেলে। মনে করে, এর চেয়ে কি অমৃত আরও স্বাদু!

উঁচু পর্বতে বুগিয়ালের দিকে যেতে যেতে নিলমের মনে হয়, দূরে তুষার পাহাড়ে তপস্যায় বসে রয়েছেন বুদ্ধ তথাগত। সে হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসে। মায়ের দেখাদেখি সুরমঙ্গলও প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পড়ে।

দুজনের কণ্ঠে তখন বাজতে থাকে অমৃত মন্ত্র,—
'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি'—
তৃতীয় পদটা অনুচ্চারিতই থাকে।

কোটগড়ে গুর্খা ছাউনি লক্ষ্য করে কামান দাগার আগে ডানদিকে কামানের মুখ ঘুরিয়ে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের মাথাগুলো যে উড়িয়ে দিতে আদেশ দিয়েছিল মেজর এরিক তা শকট-বাহী একজন সৈনিকের মুখ থেকে জানতে পারেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রস। বিচারে চরম শাস্তি হয় এরিকের।

পার্লের মুখ থেকে জেনারেল জানতে পারেন, তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল মেজর এরিক। কিন্তু তাতে সমর্থন ছিল না তার। সে জন্য এরিক প্রবল ঈর্ষা পোষণ করত যুবরাজের ওপর। আর সে কারণেই এই ভীষণ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

পার্ল কিন্তু যুবরাজকে হারিয়ে আর সংসারজীবনে আবদ্ধ থাকতে চাইল না। সে ফিরে গেল দেশে, সেখানে যোগ দিল এক বিখ্যাত নানারিতে। সেবাকর্মের ভেতর দিয়ে সে অতিবাহিত করতে লাগল তার সন্ন্যাসিনী-জীবন।

এগার

বুশেহারের মহারাজ কাতর হয়ে পড়েছিলেন একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অধীর হয়ে পড়লেন অন্য একটি ভাবনায়। এই প্রাচীন রাজবংশ কি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে?

যে বংশের রাজারা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করেন গুরু লামার দেহ ধারণ করে, সে বংশ কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে?

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা মহারাজকে নাড়া দিয়ে গেল। তিনি অতি বৃদ্ধ তপোনাথকে পরামর্শগৃহে ডেকে পাঠালেন।

তপোনাথের মুখোমুখি বসে মহারাজ বললেন, এই সুপ্রাচীন বংশধারা তো লুপ্ত হয়ে যায় তপোনাথ।

মাথা নিচু করে বসে রইলেন তপোনাথ। কী উত্তর দেবেন এর।

মহারাজ বললেন, এই অন্ধকারে ক্ষীণ একটা আলোকরশ্মি আমি দেখতে পাচ্ছি।

মাথা তুলে তপোনাথ মহারাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সাংলার সরপঞ্চ কি এখনও জীবিত? দু'তিন বছর কোনও উৎসবে রাজধানীতে তাকে দেখা যায়নি।

জীবিত মহারাজ। সাংলার তহশিলদারের মুখে তাঁর খবর পেয়েছি। তবে বার্ধক্য তাঁর দূর-পথ পরিক্রমায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তুমিও তো সরপঞ্চের প্রায় সমবয়সি তপোনাথ, তবু আজও তুমি কেমন সমর্থ আর সক্রিয়।

বিনয়ের সঙ্গে বললেন তপোনাথ, এ সৃষ্টিকর্তার কৃপা প্রভু।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বললেন, তোমাকে একটি দুরূহ কম সম্পাদনের জন্য সাংলা তহশিলের কামরু দুর্গে পাঠাতে চাই। তোমার সঙ্গে থাকবে দশজন অশ্বারোহী আর দুখানা তাঞ্জাম। একখানা অতি সুসজ্জিত রাজকীয় তাঞ্জাম, বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে বহন করে আনবে। অন্য তাঞ্জামটি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটু থামলেন মহারাজ।

আকাশ পাতাল তোলপাড় করেও মহারাজের পরিকল্পনা আন্দাজ করতে না পেরে তপোনাথ বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মহারাজ বললেন, দশ-বারো বছর আগে সাংলার সরপঞ্চের সঙ্গে বিচারপ্রার্থী দুজন মহিলা এসেছিল, তোমার কি মনে পড়ে?

হ্যাঁ মহারাজ। তারা বিশেষ একটা প্রার্থনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল। আপনি তাদের প্রার্থনা পূর্ণ কবতে না পারলেও অকাতরে প্রভূত অর্থদান করেছিলেন।

এবার মহারাজ সোজাসুজি কথাটা পাড়লেন, তাদের প্রার্থনার বিষয়টা তোমার অজানা ছিল না।

হ্যাঁ মহারাজ, সরপঞ্চের মুখ থেকে আমি সমস্ত বিষয়টা জানতে পেরেছিলাম।

সেদিন মহিলা দুটিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম আমি, তাদের প্রার্থনা আমি পূর্ণ করতে পারিনি, কিন্তু আজ আমি তাদের কাছেই প্রার্থী। আর আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমিই যাবে তাদের কাছে।

তপোনাথ বললেন, এখনও আমি অন্ধকারে মহারাজ।

যে কন্যাটি সেদিন তার অনাগত সন্তানের পিতা বলে যুবরাজকে চিহ্নিত করেছিল তাকেই আজ আমার বড় প্রয়োজন। তুমি সাংলার দুর্গে থেকে খোঁজ নিয়ে জানবে সেদিনের সেই কন্যাটি পুত্র অথবা কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তাদের মধ্যেই রয়েছে বুশেহারের রাজরক্ত। আজ আর তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তুমি জান, ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে চায়, এখন আমার অবস্থাও তাই জানবে তপোনাথ।

তপোনাথ বললেন, যথার্থ পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছেন মহারাজ। একে সফল করতে আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না জানবেন।

মহারাজ বললেন, পুত্র কন্যা যেই হোক তাকে সুসজ্জিত তাঞ্জামে চড়িয়ে রাজধানীতে নিয়ে আসবে। অন্য তাঞ্জামটি থাকবে জাতকের জননীর জন্য। মহাসমারোহে নিয়ে আসবে তাদের। দুর্গের ভেতর যে বাজনদাররা রয়েছে তারা সমস্ত পথ বাদ্যধ্বনি করতে করতে শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে আসবে।

যাত্রার সময় মহারাজ দুটি সুদৃশ্য পেটিকা তপোনাথের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি এ দুটি অতি যত্নে ও সাবধানে একটি তাঞ্জামের ভেতর তুলে রাখ। তুমি অশ্বারোহীদের সঙ্গে সেই তাঞ্জাম পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।

বিস্মিত তপোনাথ জানতে চাইলেন, পেটিকার ভেতর কী আছে মহারাজ?

একটির মধ্যে রয়েছে বহুমূল্য অলংকার, যদি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে তবে তাকে ওই অলংকারে সুসজ্জিত করে রাজধানীতে নিয়ে আসবে। রাজকীয় পোশাকও দেওয়া হল তাদের জন্য।

মহারাজ থামলে তপোনাথ জানতে চাইলেন, অন্য পেটিকাটিতে কী আছে মহারাজ?

হীরকখচিত একটি রাজমুকুট। সঙ্গে মহার্ঘ মুক্তামালা। পুত্রসন্তান হলে তাকে উপযুক্ত পোশাক পরিয়ে ওই মুকুট আর মুক্তামালায় সাজিয়ে মহাসমারোহে রাজধানীতে নিয়ে আসবে।

তপোনাথ মাথা নত করে বললেন, আমি আপনার নির্দেশ যথাযথ পালনের চেষ্টা করব।

কামরু পাহাড়ের ওপর পঞ্চতল দুর্গের দ্বারে এসে পৌঁছলে দুর্গরক্ষক সসম্মানে তপোনাথকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বপ্রকার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বুশেহারের প্রাসাদ থেকে আগত অভ্যাগতদের যথাস্থানে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল।

তপোনাথ দুর্গরক্ষক কিংবা কৌতূহলী কোনও সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করলেন না। তিনি দুর্গে আহ্বান করে আনলেন কেবলমাত্র সরপঞ্চকে। এতকাল পরে দুজন দুজনকে দেখে উল্লসিত।

সংগোপনে পরামর্শ হল দুজনের।

তপোনাথ যখন শুনলেন নিলম পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে তখন মহারাজের কথা ভেবে তাঁর আনন্দের পরিসীমা রইল না।

জানতে চাইলেন, কিশোরটি এখন কোথায়?

সে ভেড়াচারকের বৃত্তি গ্রহণ করেছে, বললেন সরপঞ্চ। শুনেছি ইদানীং তার মাকে সঙ্গে নিয়ে সে ধৌলাধার পর্বতের বিভিন্ন বুগিয়ালে (চারণক্ষেত্রে) ভেড়া চরিয়ে বেড়ায়।

চিন্তিত তপোনাথ বললেন, এখন তাহলে তাদের কীভাবে পাওয়া যাবে?

সরপঞ্চ বললেন, আমি যতদূর শুনেছি, ভেড়াচারক সুরমঙ্গলের দাদি বার্ধক্যজনিত অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি। তাই তার মেয়ে আর নাতি দূর-দূরান্তের চারণভূমিতে বর্তমানে যাচ্ছে না। তারা যেখানেই থাকুক দু-চারদিন অন্তর নিচে নেমে এসে বৃদ্ধার দেখাশুনো করে যায়।

তপোনাথ বললেন, তুমি মা ও ছেলের সঙ্গে আমার নিভৃত সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করে দাও।

সাতদিন পরে সরপঞ্চ সংবাদ নিয়ে জানালেন, মাতা পুত্র এখন বাস্‌পা-তীরের অরণ্যভূমির কিছু ওপরে ধৌলাধার পর্বতের একটি গুহায় ভেড়া নিয়ে অবস্থান করছে। কয়েকদিন আগে তারা অসুস্থ কুশলার সঙ্গে দেখা করে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদির পর ওপরের পাহাড়ে যাত্রা করেছে। এখন মাসাধিককাল ওরা ভেড়ার পাল নিয়ে ওপরের পাহাড়গুলিতে উঠতে থাকবে।

তপোনাথ কিছু সময় চিন্তা করে বললেন, আগামীকাল পূর্ণিমা। আমরা শেষরাতে তাঞ্জামে চড়ে সবার অলক্ষে পাহাড়ের ওপর উঠে ওদের সন্ধান করব। আশা করি ওরা অনেক ওপরে উঠে যাওয়ার আগে আমরা ওদের কাছে পৌঁছে যাব।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে দুটো তাঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। তখনও সাংলার জনপদ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন।

অবশেষে ওরা পাহাড়ের ওপর দ্বিতীয় গুহায় ওদের সন্ধান পেল। ধিকধিক করে আগুন জ্বলছিল গুহামুখে। প্রভাতে ওপরের চারণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য আগুনে রুটি সেঁকে নিচ্ছিল নিলম। পাশেই ঘুমন্ত ভেড়াদের কুণ্ডলীর ভেতর একখানা কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শেষ রাতের ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছিল সুরমঙ্গল। শুকতারাটি বিরাট একখণ্ড হীরের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল তুষার পর্বতের শীর্ষে।

নিঃশব্দে তাঞ্জাম এসে থামল গুহার কিছুটা দূরে। সজ্জিত তাঞ্জামের ত্রিকোণ কাচখণ্ডগুলির ওপর পূর্ণচন্দ্রের আলো পড়ে মায়াময় বর্ণালির সৃষ্টি করছিল।

হঠাৎ ভেড়াদের পাশে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত কুকুরটা অচেনা গন্ধ পেয়ে ডেকে উঠল।

সচকিত হল চরাচর বাতাস বিদীর্ণ করা সেই শব্দে।

সামনে শিখা মেলে জ্বলছে আগুন, পেছনে উঠে দাঁড়িয়েছে অগ্নিশুদ্ধা এক দিব্যরমণী। আগুল্‌ফলম্বিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাজি। জ্যোৎস্নার জলে মুখখানি জেগে আছে পদ্মের মতো। দৃষ্টিতে বিস্ময়! পাহারাদার কুকুর সহসা ডেকে উঠল কেন? কোনও পো-থার (তুষারচিতা) কি এগিয়ে আসছে!

ততক্ষণে ভেড়াদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছে এক কিশোর। দীর্ঘদেহী যুবা পুরুষের অবয়ব যেন। ছুবায় সারা দেহ ঢাকা। কোমরে জড়িয়েছে মোটা একখণ্ড দড়ি, গাচ্ছং। হাতে একটি কুঠার নিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। কুকুরের ডাকে তারও সন্দেহ জেগেছে, কোনও রিখের (ভালুক) গন্ধ কি পেয়েছে তার পাহারাদার কুকুর।

মাতা পুত্রের সমস্ত অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করে তাদের সামনে এগিয়ে এলেন সাংলার সরপঞ্চের সঙ্গে বুশেহারের তপোনাথ নেগী।

বিস্মিত স্তম্ভিত নিলম করজোড়ে নমস্কার করল দুজনকে।

বৃদ্ধ তপোনাথ নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালেন সেই দিব্যরমণীকে। তপোনাথের দেখাদেখি তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন সরপঞ্চ।

এবার কথা বলল নিলম, আপনারা আমার পিতৃতুল্য, অনুগ্রহ করে আমার অপরাধ বাড়াবেন না।

ভেড়াদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল সুরমঙ্গল। সে এগিয়ে এসে তার গায়ের কম্বলটা খুলে অগ্নিকুণ্ডের ধারে পেতে দিয়ে যুক্ত করে বলল, অনুগ্রহ করে আপনারা এই কম্বলের ওপর বসুন।

সেই দিব্যসুন্দর কিশোরটির দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন তপোনাথ। এ কাকে দেখছেন তিনি! তাঁর সামনে কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন যুবরাজ প্রীতম সিং!

বুশেহারের ভাবী মহারাজকে নত হয়ে নমস্কার জানালেন অশীতিপর তপোনাথ।

বিস্মিত অভিভূত সুরমঙ্গল ত্রস্তে এগিয়ে এসে বৃদ্ধকে মাটি থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল।

পূর্ব পরিচিত সরপঞ্চের দিকে তাকিয়ে নিলম বলল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না চাচা। শেষরাতে এতখানি ওপরে বৃদ্ধ মানুষটিকে নিয়ে আপনি এলেনই বা কীভাবে? আর কী প্রয়োজনেই বা এলেন?

সে অনেক কথা মা। তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, তুমি আশ্বাস দিলে তপোনাথ নেগী মশায় তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবেন।

নিলম বলল, প্রার্থনা নয়, আপনাদের প্রয়োজনের কথাটা বলুন আগে। আমি সামান্য কপর্দকশূন্য সম্বলহীন এক রমণী, আমার সাধ্যমতো আপনাদের সেবার চেষ্টা করব।

তপোনাথ আবেগভরে বলে উঠলেন, তুমি রাজরাজেশ্বরী মা, ভিখারিনির সাজে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছ।

অগ্নিকুণ্ডের ধারে সুরমঙ্গলের পেতে দেওয়া কম্বলাসনে বসল চারজন।

নিলম বলল, এবার বলুন বাবা কী অভিপ্রায়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন?

দুটি সংবাদ নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি মা।

নিলম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ তপোনাথের মুখের দিকে।

একটি বেদনার, অন্যটি আনন্দের, কোন্‌টি আগে তোমাকে শোনাব তাই ভাবছি।

পরক্ষণে নিজেই বললেন, দুঃখ দিয়েই শুরু হয়েছিল তোমার জীবন, তাহলে চরম দুঃখের সাগরে স্নান করে তুমি অমৃত কলস হাতে শুভলক্ষ্মীর মূর্তি ধরে উঠে এসো মা। যুদ্ধক্ষেত্রে যুবরাজ প্রীতম সিং বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। শোকসাগরে ভাসছে সমগ্র বুশেহার। এখন কিন্নরবাসী তোমার কাছে তাদের সান্ত্বনা খুঁজছে।

কুয়াশার মতো একটা পর্দা ধীরে ধীরে সরে গেল নিলমের চোখের সামনে থেকে।

নিচের সবুজ অরণ্য আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোল ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত বাস্‌পার অসিকান্তি জলধারা। বনের গোপনাশ্রয় থেকে বেরিয়ে দুই তরুণ-তরুণী দুটি প্রজাপতির মতো উড়ে চলেছে নদীতীর লক্ষ্য করে।

সেই পূর্ণিমার রাত, সেই অরণ্য, সেই নদীতীর সেদিন যে সৃষ্টির বীজ বুনেছিল, সে আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বলিষ্ঠ তরুণ বৃক্ষের রূপ ধরে।

মনটা ক্ষণকালের জন্য উদাস হয়ে গিয়েছিল নিলমের। সে এখন অতীতের স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে সহজ দৃষ্টিতে তাকাল তপোনাথের মুখের দিকে। বলল, এবার বলুন আপনার দ্বিতীয় সংবাদ।

বৃদ্ধ তাঁর কম্পিত দুটি হাত নিলমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তুমি সগৌরবে তোমার নিজরাজ্যে ফিরে চল মা। অতিবৃদ্ধ অসহায় মহারাজ সিংহাসন সাজিয়ে বসে রয়েছেন তাঁর সূর্যবংশীয় উত্তরাধিকারীর অপেক্ষায়। আমি তাঞ্জাম নিয়ে এসেছি তরুণ রাজরাজেশ্বর আর তাঁর জননীকে বরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

নিলম বলল, এ প্রার্থনার উত্তর তো আমার কাছে নেই বাবা, সুরমঙ্গলই এর উত্তর দিতে পারে।

এতক্ষণ সবকিছু শুনছিল সুরমঙ্গল, এবার উঠে দাঁড়াল সে। এক দিব্য পুরুষের দীপ্তি তার ললাটে।

বলল, বুশেহারের রাজবংশ অতি পবিত্র বলে শুনেছি। আমি 'পুগ্‌লাং', সমাজের এক গোত্রহীন সন্তান। আমার জননীকে যেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বুশেহারের মহারাজ সেদিনই এই শিশুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তাঁর। শুধু রাজ্যের লোভে সে কি তার জননীকে নিয়ে ফিরে যাবে সেই হৃদয়হীন রাজ্যে। বুশেহারের সম্মানীয় মহারাজকে জানাবেন, আমিও একটি রাজ্যের অধীশ্বর। আমার ধন একপাল ভেড়া। আমি সীমাহীন চারণক্ষেত্রে ওদের চরিয়ে বেড়াই। আমার রাজ্যের মাথায় প্রসারিত নীল আকাশের সামিয়ানা। তুষারপর্বত থেকে প্রবাহিত জলে আমরা স্নান করি আর সেই অমৃতধারা পান করি। আমার জননী নিজের হাতে ভুট্টা পুড়িয়ে রুটি পাকিয়ে যে খাওয়ার তৈরি করে দেন তা পরমস্বাদু, অমৃততুল্য। উদ্বেগহীন আনন্দে আমি বাঁশুরি বাজাতে বাজাতে ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াই। এই সুখের সাম্রাজ্য ছেড়ে কে চায় অশান্ত, দুঃখদীর্ণ সমস্যাজর্জরিত এক সাম্রাজ্যের সিংহাসন পেতে।

কথাগুলি বলে, সবিনয়ে সুরমঙ্গল নমস্কার নিবেদন করল রাজপুরী থেকে আগত প্রবীণ বার্তাবহকে।

এবার প্রসন্নমূর্তিতে পূর্বদিকে ফিরে দাঁড়ালেন সম্রাট। দুটি হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন প্রভাত সূর্যকে।

ধীরে ধীরে তুষারশৃঙ্গের আড়াল থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল সূর্যের সোনালিরশ্মি।

সেদিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে তপোনাথের মনে হল, দেব দিবাকর তাঁর সোনার মুকুটটি পরিয়ে দিলেন এক সংসারবিবাগি তরুণ কিশোরের মাথায়।

●

বীজের উৎস

অরণ্যের ঘুমন্ত যৌবন
অনাবৃত করে প্রভাতি পবন
লুণ্ঠন করল কুহেলিকার অংশুক।
উড়িয়ে নিয়ে গেল লীলাভরে
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

বনপ্রান্তের স্রোতস্বিনী
দূরগামিনী বঙ্কিম বিভঙ্গে,
চরণে বেজে উঠেছে
উপলের নন্দিত নূপুর।
কোন্ প্রিয়তমের আকুল আহ্বান
উন্মদ করেছে তাকে!

জলতরঙ্গের ধ্বনিতে
পত্র মর্মরের সংগতে
শুভ্র দুকূল উড়িয়ে
সে কী আবেগ মধুর হৈমন্ত-অভিসার।

এই শুভ্র শুদ্ধ ঊষালগ্ন
একান্ত প্রিয় ও প্রার্থিত
রাজাধিরাজ চেদিপতি বসুরাজের।
দেবদিবাকরের আবির্ভাবের মঙ্গল লগ্নে
তিনি উপস্থিত হন বনপ্রদেশে,
বেগবান শ্বেত হয়রাজ শুভ্র কেশর দুলিয়ে
বসুরাজকে বহন করে আনে পৃষ্ঠে।
মহারাজ অরণ্যে প্রবেশ করে
পুষ্পবাস আমোদিত বায়ু সেবন করেন।
ধীরে ধীরে অগ্রসর হন
অনিকেত অরণ্যলোকের অভ্যন্তরে।
একসময়ে অরণ্যপ্রান্তের তটিনী তটে
অবতরণ করেন অশ্ব থেকে।

পরিধান করেন প্রাতঃস্নানের পরিচ্ছদ।
স্রোতস্বিনীর সলিলে নেমে
তাকান পূর্বাস্য হয়ে।
শৈল শীর্ষে লক্ষ্য করেন,
দেব দিবাকরের আবির্ভাবের মঙ্গল মুহূর্ত।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়ের
লগ্ন সমাসন্ন।
রক্তরাগে রঞ্জিত হয় পূর্ব দিগন্ত।
অঞ্জলিতে পূত সলিল ধারণ করে
তদ্গত চিত্তে উচ্চারণ করেন বসুরাজ—
'জবাকুসুম সঙ্কাশং
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধান্তারিং সর্ব পাপঘ্নং
প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।'

❀

সুরপতি বাসবের স্নেহধন্য বসুরাজ,
ইন্দ্রের অনুগ্রহে রাজরাজেশ্বর তিনি।
কণ্ঠে তাঁর শোভা পাচ্ছে
চির অম্লান বৈজয়ন্তী মালা।
পঙ্কজ কুসুমে রচিত সেই গন্ধমধুর মালিকা
ইন্দ্রের সানন্দ উপহার।
গগন বিহার করেন তিনি
পুষ্পক রথে দেবতার মহিমায়,
সে রথখানিও দেবরাজেরই দান।
দৈবানুগ্রহপুষ্ট অমিত বীর্যবান
নৃপতি বসুরাজ শিষ্টের পালন করেন
বেণু-যষ্টি দ্বারা, সে যষ্টিখানিও
সুরপতির সানুগ্রহ দান।
আর যা তাঁর একান্ত নিজস্ব,
পৈতৃক অধিকারসূত্রে প্রাপ্ত,
তা হল তাঁর ভুবনজয়ী ভুজবল—
যা দিয়ে তিনি করেন দুষ্টের দমন
আর আসুরিক শক্তির নিষ্পেষণ।

❀

সেদিন সংক্রান্তির পুণ্যস্নানে
চলেছেন বসুরাজ পদব্রজে।
তখনও তাল তাল অন্ধকার
গুঁড়ি মেরে বসে আছে অরণ্যের অন্দরে কন্দরে।
পথ বহু পরিচিত প্রত্যহ যাত্রায়।
বৃক্ষদের স্পর্শ আর গন্ধ নিতে নিতে
অন্ধকার দুহাতে সরিয়ে
মহারাজ দাঁড়ালেন এসে প্রবাহিণী তীরে।
এখানে তরল হয়ে আসছে অন্ধকার।
তরুণ আলোর প্লাবনের প্রতীক্ষায়
শৈল শৃঙ্গগুলির দিকে
তাকিয়ে রইলেন বসুরাজ।

❀

আর্তনাদ! নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত শীৎকার!
ব্যাঘ্রদন্তে বিক্ষত হরিণী!
শব্দ যেন নিশিত সায়ক,
বিদ্ধ করে শ্রবণ মনন।
মহারাজ দ্রুতগামী শব্দানুসরণে।
অন্ধকার গুহার গভীরে
আক্রান্তের তীব্র আর্তনাদ।

❀

শুধু শব্দ এত শক্তি ধরে!
অন্ধকারে অবলুপ্ত কায়া,
কেবল স্বরের এক সুতীব্র প্রক্ষেপ!
অসীম ক্ষমতাধর বাক্‌যন্ত্র,
হৃদয়ের সকল ভাবের রূপ
প্রকাশিত শব্দের লহরে।

❀

নারীর ভয়ার্ত রবে
ধর্ষণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।
আর্তের রক্ষক রাজা
অবশেষে আবির্ভূত সেই অকুস্থলে।
আলোর ছোঁয়ায় দূরে সরে যায় ছায়া,
জাগরিত সুপ্ত চরাচর।

গুহা থেকে বিনির্গত
নররূপী লোমশ লোলুপ দ্বিপদ শ্বাপদ।
বিস্ময়ে বিহ্বল বসুরাজ!
এই সেই দস্যু 'কোলাহল'
যার গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়েছে,
তাঁর নগর-কোটাল।
সৈন্যেরা সন্ধানে আছে তার।
চপলার চকিত চমকে
দেখা দিয়ে ক্ষণিকে মিলায় সে অধরা।
দেখেছেন তাকে বসুরাজ,
দূর থেকে চোখের পলকে।
বিপুল বলিষ্ঠ দেহ কদাকার ঘোর কৃষ্ণকায়।
অশ্বারোহী কতবার ছুটেছে পশ্চাতে,
ঝঞ্ঝার বিপুল বেগে সর্বগ শ্বাপদ
মিশে গেছে অরণ্য পর্বতে লোকালয়ে।
সন্ধান পায়নি তার কেউ।
কি আশ্চর্য! সেই ধূর্ত, সেই বেগবান
অমিত বিক্রমী দস্যু সম্মুখে রাজার!

আদিরিপু চরিতার্থ, প্রস্থান সময়ে
একী বিপর্যয়, সম্মুখেতে স্বয়ং সম্রাট!
অস্ত্রহীন দুই বীর্যবান মুখোমুখি।
গুহার প্রবেশদ্বারে ধর্ষিতা রমণী
ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ঢাকে লজ্জাস্থান তার।
আলুথালু কেশগুচ্ছ চক্ষে অশ্রুধার।
এবার পালাবে কোথা?
বজ্রের নির্ঘোষে শব্দ ছুঁড়ে দেন রাজা।

শঙ্কাহীন দস্যুরাজ হাতে তোলে
প্রস্তরের গোলা,
বিপুল বিক্রমে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড
ভীমবেগে শূন্যে ধেয়ে আসে।
মহারাজ বসুরাজ ক্ষিপ্রহস্তে লুফে নেন
সেই মহাশিলা অতি ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডবৎ।

জানি তুমি বিক্রমকেশরী মহারাজ,
বাসবের বরে তুমি অক্ষত অজেয়।
কণ্ঠে ওই অম্লান কুসুমমালা,
সেও দেবতার দান।
পর্বত শিখরে বসে দেখেছি তোমার রথ
উড়ে যায় মহাব্যোম লোকে। জানি তুমি
গগন বিহারী। দেবতার দানে পুষ্ট
তোমার জীবন।
আমি এক দস্যুর সন্তান।
দস্যুবৃত্তি আমার জীবিকা।
দয়ার দানকে আমি প্রত্যাখ্যান করি।
ধনশালী কেড়ে নেয় দরিদ্রের সামান্য সঞ্চয়,
আমি সেই বিত্তবানে নিস্ব করে
অপহৃত ধন দরিদ্রে বিলাই।

এসব রাজার কাজ, সাজে না তোমার।
প্রজাপালনের ভার অর্পিত রাজার 'পরে।
সমাজ পালন বিধি যুগযুগান্তের।
মহামুনি মহাজ্ঞানীজন রচেছেন এই বিধি।
বিত্তাপহরণ, সামাজিক বিধিভঙ্গ
মহাপাপ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
সেই পাপে অভিযুক্ত তুমি।
তাছাড়া ধর্ষণ! ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহভোগ,
এ পাপের শাস্তি শুধু মৃত্যুদণ্ড নয়,
গভীর যন্ত্রণাময় অতি ঘৃণ্য ভয়ঙ্কর মৃত্যুর আস্বাদ।

রমণীরমণে কোনও দোষ নেই মহারাজ।
জীবের জীবনধর্ম পালন করেছি আমি।

তারও বিধি আছে। সমাজ বিধান মেনে
যে নারীকে বধূরূপে বরণ করবে পতি,
শুধু তারই আছে, নারীকে ভোগের অধিকার।
সম্মতি উভয়পক্ষে, তাই সেই ভোগ
চরম আনন্দদায়ী, সমাজের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর।

তারা হবে একদিন জনক জননী বৈধ সন্তানের।
সুস্থ সমাজের রথ চলে এই পথে।

❀

বারবণিতাকে জানি ভোগ করে সর্বজন,
রাজা প্রজা সেথা একাকার।
কোন ধর্মে বারবধূ সমাজে স্বীকৃত?
বিবাহবন্ধনে কভু বদ্ধ নয় তারা।

❀

সমাজ উপান্তে আছে নিবাস তাদের।
হাস্যলাস্য নৃত্যগীতে তারা জেনো জন চিত্তজয়ী।
যারা যায় পতিতা সকাশে তারা নয় ধর্ষক দুর্জন।
সাদরে গৃহীত তারা পতিতা-আলয়ে।
আনন্দ সম্ভোগে আছে সকলের সম অধিকার।
সমাজ বাহিরে অবস্থান বারবণিতার,
সমাজের অভ্যন্তরে কভু নয় সমাদৃত তারা।

❀

মহারাজ পিতৃসূত্রে পাওয়া এই দেহ,
ভীষণদর্শনকায় দেখে সবে দূরে সরে যায়।
আমারও জীবনে আছে কামনার দাহ,
সম্ভোগে মিটাব ক্ষুধা সে সুযোগ পাইনি কখনো,
তাই,
ধর্ষণের পথ ছাড়া সম্ভোগের
অন্য কোনও পথ খোলা নাই।
গুহাদ্বারে আবার ক্রন্দন,
ওই নরপশুটার শাস্তি চাই মহারাজ।

❀

দুষ্কর্মের শাস্তি পাবে দোষী,
কেউ নয় সমাজবিধান বহির্ভূত।
ধর্ষণের চরমশাস্তি মৃত্যুদণ্ড ওর
ললাট লিখন।
তবে যুক্তিবাদী এ ধর্ষণকারী
পাবে মাত্র একটি সুযোগ জীবনরক্ষার।
মল্লযুদ্ধ হবে দুজনের,

সে যুদ্ধে বিজয়ী হলে কোলাহল পাবে মুক্তি,
পরাজয়ে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

❀

মল্লযুদ্ধে, রাজি আছি আমি
তবে কানুন জানি না মহারাজ।

❀

বেকানুন যুদ্ধ হোক,
লক্ষ্য শুধু জয় পরাজয়।
মুখমণ্ডল রবে আঘাতের সম্পূর্ণ বাহিরে।

❀

ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে
দেহের সমস্ত পেশী বিস্ফারিত করে কোলাহল।
হিংস্র মত্ত ভীষণ ভল্লুক,
কৃষ্ণলোমে সম্বৃত শরীর
পশ্চাতের দুই পদে রেখে দেহভার
সম্মুখের হস্তদ্বয় বক্ষে মারে
দুন্দুভির মত।
বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষু শত্রুর দর্শনে।
বাহ্বাস্ফোটে কাঁপে বন,
রণহুঙ্কার ধ্বনি, তোলে প্রতিধ্বনি পর্বতে কন্দরে।

❀

মৃত্তিকায় বদ্ধ পদ স্থির মহারাজ,
মনে মনে নামজপ,—'রুদ্র মহাদেব'।
আস্ফালন, উল্লম্ফনে স্বনিত পবন,
চক্রাকারে বিঘূর্ণিত দুই প্রতিযোগী।
আঘাত করেন রাজা প্রত্যাঘাত হানে কোলাহল,
জীবন মরণ যুদ্ধ দেবাসুরে যেন অবিকল।
শাণিত নখরযুক্ত দুই বাহুমেলি
ব্যাদিত বদনে তুলে হুহুঙ্কার ধ্বনি
শূন্যে লম্ফ দেয় দস্যু, বিপুল বিক্রমে।
ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে প্রবল শত্রুর
উন্মুক্ত কণ্ঠের নালি।
সেই মহাসুযোগের সদব্যবহার
করেন নৃপতি বসুরাজ, অতি ক্ষিপ্রতায়।

বজ্রমুষ্ঠি হেনে বিদীর্ণ করেন বক্ষ
ঊর্ধ্বোত্থিত ধর্ষক দস্যুর।
বলকে বলকে রক্ত ক্ষণে ক্ষণে উথলায়
বিক্রমী দস্যুর মুখ থেকে।
ভুলুণ্ঠিত স্তব্ধ কোলাহল।
গতপ্রাণ নিস্পন্দ নিঃসাড় মহাবলী।

❀

অরণ্য বিহগকুল ভেসে চলে যায়
নীল নভোলোকে।
কণ্ঠে তোলে জয়ধ্বনি সুমধুর
মহাপাপী দস্যুর বিনাশে।
নিরুদ্বিগ্ন মহারাজ স্থির পদক্ষেপে
নেমে যান তটিনীর সুশীতল নীরে
শুদ্ধ হন, শান্ত হন পুণ্যতিথি-স্নানে।

❀

চরণে প্রণতি পিতা।
ধীর পদক্ষেপে চলেছেন তরুণ সম্রাট।
সম্মুখে প্রণত সেই ধর্ষিতা রমণী।
স্থির হল চঞ্চল চরণ।
রক্ষাকর্তা পিতা, তাই পিতৃসম্ভাষণে
অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায় রমণী।

❀

কি নাম তোমার?
শুক্তিমতী মহারাজ।
থাকো নিরুদ্বেগে। প্রয়াত ধর্ষক আর
আসবে না এই ধরাধামে।
কিন্তু মহারাজ...
কিসের সংশয় আর?
তুমি মুক্ত, নির্ভয় এখন।
শান্তমনে নদীতীরে কাটাও জীবন।
ভুজঙ্গ বন্ধন হতে মুক্ত করে দিয়েছেন পিতা,
কিন্তু বিষ তার সঞ্চারিত আমার শরীরে।
একথার অর্থ নারী অবোধ্য আমার।
মহারাজ তীব্র অনুভবে সুনিশ্চিত আমি,

দস্যুর ঔরস,
আমার গর্ভেতে করে প্রাণের সঞ্চার।
অনুভব, সত্য হতে পারে।
তবে মহারাজ, ধর্ষণজাত এই বীজ
যখন স্ফুটিত হবে পুষ্পের মতন
তখন কি অমলিন থাকবে মহিমা?
নিরুত্তর মহারাজ।
বলুন, বলুন পিতা, কেন নিরুত্তর!
গর্ভজাত আমার সন্তান
পাবে তো স্বীকৃতি সমাজের?

কি করে তা আশা কর নারী!
বৃক্ষের বীজ থেকে জন্মায় বৃক্ষেরা,
শ্বাপদের থেকে শুধু শ্বাপদই জন্মায়।
মানুষের বীর্য থেকে মানুষই ভূমিষ্ট হয়,
সে পায় অধিকার নর-সমাজের।
ধর্ষক কখনও নয় মনুষ্যের পদ-অধিকারী।
মহারাজ, জানি পশুরও অধম কোলাহল
তবুও সে মানুষেরই আকৃতি ধরেছে,
মানব মানবীর সন্তান সে প্রণয় সঞ্জাত।
নির্দোষ সন্তান তার কেন রবে সমাজ বাহিরে?
দস্যু 'কোলাহল' শ্বাপদের থেকে ঘৃণ্য।
পশুর সমাজে আছে অলিখিত নিয়ম-বন্ধন,
সে নিয়ম মেনে চলে তারা। দস্যু কোলাহল
সকল নিয়ম বহির্ভূত, তাই পশ্বাধম
সেই নরাকৃতি জীব। তুমি নারী উৎকণ্ঠিত কেন
সেই বিষবৃক্ষের বীজ নিয়ে?
লোকপাল, ধর্মের রক্ষক, জানেন কেবলই লোকধর্ম
নারীধর্ম পরিজ্ঞাত নয় আপনার।
দশমাস গর্ভে নারী লালন করেছে যারে তিলে তিলে,
সেই প্রাণ সঞ্জীবিত হয় জননীর স্নেহ সুধা রসে।
তার কল্যাণের চিন্তা জন্মদাত্রী করে সারাক্ষণ।
তাই এত প্রশ্ন মহারাজ সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে।
তুমি ভাব ভবিষ্যৎ, আমি জানি
হিংস্র শ্বাপদের বীজে শ্বাপদই জন্মায় শুধু।

(প্রস্থান)

সারা বন আলো করে
ফিরে ফিরে এসে গেছে
অষ্টাদশ বসন্ত-বাহার।
শিমুল পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া
উড়িয়েছে রঙীন কেতন।
মুকুতাখচিত চ্যুত মঞ্জরি-মুকুটে
সুশোভিত শির, এসেছে বসন্ত সখা।
হাওয়ার দুকূলে বিধুনিত পুষ্পের পরাগ।
কোকিল ডেকেছে কত আকুল পঞ্চমে,
ডালে ডালে পাতার আড়ালে।
ফুটেছে কুসুমকলি মধুপের সোহাগ চুম্বনে।
অষ্টাদশ বসন্তের রেণু অঙ্গে মেখে
প্রস্ফুটিত এক বনবালা,
ঘুরে ফেরে কাননে কান্তারে
প্রবাহিণী তীরে, স্নান করে স্নিগ্ধ নদীনীরে।
কণ্ঠে তার সুরের মূর্ছনা।
নিত্য করে সূর্যস্তব,
'হে পূষণ দূর কর পাপ,
রক্তে সঞ্চারিত বিষ হোক অপগত
সর্বপাপঘ্নদেব তোমার কৃপায়।

সেদিন বসন্তোৎসবে প্রমত্ত জনতা,
ফাগুয়ার ফাগ ওড়ে দক্ষিণ পবনে।
নগরে প্রান্তরে জনপদে
নরনারী আনন্দ বিহ্বল।
প্রাসাদের অন্দরমহলে
মদনের পূজা-মহোৎসবে
উপস্থিত মহারাজ, সাক্ষাৎ মদন।
বসুরাজে ঘিরে মণ্ডলি রচনা করে
রানিমহলের নৃত্য ফাগের লীলায়,
অপার্থিব।
রতি পতি মহারাজ, পুষ্পধনু হাতে
শরসন্ধানে মগ্ন রানিদের বক্ষ লক্ষ্য করে।
উচ্ছ্বাসে উল্লাসে হাস্যে তরঙ্গিত অন্দরমহল।

খেলা শেষে মহারাজ স্নান অভিলাষে
এসেছেন বনপ্রান্তে প্রবাহিণী নীরে।
স্নান সমাপন অন্তে
নববস্ত্র পরিধানে উজ্জ্বল সুন্দর মহারাজ।
রতিপতি যেন চলেছেন লীলাভরে,
হাওয়ায় ওড়ায় তাঁর ক্ষৌম উত্তরীয়।
দুরন্ত পবনে উড়ে চলে উত্তরীয়
নদীতীর ধরে, যেখানে অরণ্য এসে
থেমে গেছে বালুকা বেলায়।
কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের শাখায়
দোলে সেই উত্তরীয়খানি।
এস্তপদে মহারাজ চলেছেন
সুবর্ণখচিত ক্ষৌম বস্ত্রের সন্ধানে।
একী অপার্থিব সঙ্গীতের সুর
ভেসে আসে হৃদয়-হরণ!
এ রাগ বসন্তরাগ,
যৌবনের স্পর্শে যার দেহকান্তি হেমপ্রভা ধরে,
পীত অঙ্গবাসে সুশোভিত যার তনু,
যে পরেছে অলঙ্কার আম্রমঞ্জরীর,
সেই সদা সচঞ্চল চক্ষু বসন্তের,
রূপরেখা ধ্বনিত হয়েছে সেই সুরে।
মূর্তিমান বসন্তের মত
কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষতলে এলেন নৃপতি।
ততক্ষণে থেমে গেছে গান।
উদ্ভিন্ন যৌবনা কন্যা বৃক্ষশাখা থেকে
টেনে নিয়ে রাজ-উত্তরীয়
জড়িয়েছে অঙ্গে তার বরাঙ্গী তরুণী।
সহসা রাজার দরশনে
সচকিত সন্ত্রস্ত যুবতী
অঙ্গ থেকে খুলে নিয়ে উত্তরীয়খানি
অঞ্জলিতে তুলে ধরে রাজার উদ্দেশে।
বসুরাজ বস্ত্রখানি নিয়ে
জড়ান তরুণী অঙ্গে আদরে সোহাগে।
সঙ্কুচিত বনবালা রাজ-আপ্যায়নে।
কি নাম তোমার?

গিরিকা আমার নাম
পিতার নাম কি কন্যা?
আমার অজানা মহারাজ।
সে কি কথা!
অবশ্যই তুমি কোনও ঋষিকন্যা হবে।
ঋষিকন্যা নই মহারাজ।
তবে তুমি দেবতার কন্যা সুনিশ্চিত।
এমন অপূর্ব কান্তি অম্লান বদন
কখন সম্ভব নয় এই ধরাধামে।

সত্য বলি, আমার এ দেহ
দেবতার দান নয় মহারাজ।
কি তোমার পরিচয় তবে?
কীট পতঙ্গ পশু তাদের যা পরিচয়
তার থেকে বেশি কোনও
পরিচয় নেই মহারাজ।
কে তোমায় বলেছে এ কথা?
আমার জননী, যিনি আজ নেই ধরাধামে।
তিনি আরও বলেছেন, অশুদ্ধ আমার রক্ত,
সারা দেহে প্রবাহিত পাপীর শোণিত।
তাই আমি নিত্য ডাকি দেব দিবাকরে।
শুদ্ধ কর, দূর কর পাপের কণিকা।

সমস্ত চৈতন্য জুড়ে চলে কোলাহল,
এই সেই স্থান অদূরে পর্বতগুহা
শোনা যায় ধর্ষিতার আর্ত কণ্ঠস্বর।
অষ্টাদশ বর্ষপূর্বে এই নদীতীরে
চলেছিল প্রচণ্ড সংগ্রাম,
কোলাহল নামে দস্যু, শ্বাপদ অধম
প্রাণত্যাগ করেছিল এই মুষ্টাঘাতে।
—কি নাম তোমার জননীর?
শুক্তিমতী মহারাজ।
স্তব্ধ বসুরাজ, উর্ধ্বলোক থেকে
আলোকের সূক্ষ্মরশ্মি
স্পর্শ করে ললাট রাজার।
দিব্যানুভূতিতে পূর্ণ সমস্ত অন্তর।

তুমি নও পাপীর সন্তান,
মহাভুল জেনে গেছে জননী তোমার।
আমারও ছিল সে ভ্রান্তি, আজ আর নেই।
এই মহাসত্য আমি জেনেছি এখন,
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু
সবেতেই সেই প্রেমময়,
তাঁরই সৃষ্টি আমরা সবাই।
এক কণা বীজ থেকে সৃষ্টি হয়
তৃণগুল্ম মহামহীরুহ।
সামান্য শশক থেকে সিংহ পশুরাজ।
ক্ষুদ্র মীন থেকে তিমিঙ্গিল।
কীট থেকে প্রজাপতি,
পক্ষীরাজ গরুড় মহান্।
সর্বশ্রেষ্ঠ নরজন্ম ওই একবিন্দু বীজে।
তিনি সর্বময়, তিনি সকলের পিতা,
প্রাণদাতা, প্রাণের হরণকারী তিনি।
তুমি নিত্য শুদ্ধ আত্মা,
পাপ স্পর্শ করে না তোমাকে।
চল তুমি আমার প্রাসাদে,
তোমার অমৃতস্পর্শে,
ধন্য হবে চেদিরাজ্য,
সুজলা সুফলা হবে সাম্রাজ্য আমার।
তুমি হবে রানি সর্বোত্তমা,
সাম্রাজ্যের রাজ রাজেশ্বরী।

* মূল কাহিনির স্রষ্টা ব্যাসদেব। মহাভারত থেকে গৃহীত।

কিন্নরী

কিন্নর কৈলাসের আড়ালে অস্তগামী চাঁদটা তাম্রপ্রস্তর যুগের একটা ধাতুপাত্রের মতো তলিয়ে যাচ্ছে। আকাশের অগণিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল চোখ মেলে চেয়ে দেখছে তাকে।

কামরু পাহাড় থেকে নেমে আসছে সে। ছায়া ছায়া পাকদণ্ডীর পথ। অভ্যস্ত পায়ে দ্রুত উতরাই বেয়ে পাহাড়ি ঝোরার মতো নামছে সে। বাঁকের মুখে অদৃশ্য হচ্ছে, আবার জেগে উঠছে। মাথার ওপর পরে নেওয়া সুন্দর ভেলভেটের শেউখানা উঁকি দিচ্ছে। তার তলায় সোনালি সেব ফলের মতো মুখখানা। উদ্ধত বুক চোলির বাঁধনে বাঁধা পড়তে চাইছে না। পা অবধি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দামি কম্বলের দোরি কাঁধ থেকে বুক ঢেকে নেমে গেছে নীচে। মোটা রেশমি গাচ্ছং বা কাপড়ের প্যাডে কটিদেশ বাঁধা পড়েছে।

পাহাড়ের ওপর কয়েক শতাব্দী আগেকার রহস্যময় কাঠের কেল্লা পেছনে পড়ে রইল। সে সুপ্ত কামরু গাঁওয়ের ঘুম না ভাঙিয়ে নেমে এল সাংলা উপত্যকায়। হলুদ দুপ্‌রু ফুলের খেত থেকে ভেসে আসছে একটা মিষ্টি গন্ধ। বুক ভরে সেই বাতাসের গন্ধটা টেনে নিতে নিতে সে একটা কুহলের কাছে এসে দাঁড়াল। এক ঝাঁক বাসরজাগা তরুণীর মতো খল খল হাসিতে লুটোপুটি খেতে খেতে ছুটে চলেছিল ঝরনাটা। একটু থমকে থেমে মুখখানা নামিয়ে জলের ওপর জেগে থাকা পাথরের মাথায় সাবধানে পা ফেলে ফেলে পেরিয়ে এল সে।

আখরোট গাছের প্রান্তর। ডালপাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। অল্প অল্প বাতাসে পাতাগুলো নড়ছে। একটা হাতপাখা যেন চালাচ্ছে কেউ। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে শব্দ, আবার ঝরঝর আওয়াজ উঠছে। ঘুমে ঝিমুতে ঝিমুতে যেন পাখা চালাচ্ছে গাছগুলো।

দুটো ধাপ পাহাড়ে উঠে ইয়াক ব্রিডিং সেন্টারের তারের বেড়ার পাশ দিয়ে সাংলা তহশিল অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চারদিকে একবার চেয়ে দেখল। সাংলা পি. ডব্লিউ. ডি. রেস্ট হাউস। বেড়া দেওয়া চত্বরের নীচে পুলিশ চৌকি। পেছনের টিলায় ওভারসিয়ারের কোয়ার্টার। পোলট্রি ফার্ম, ফ্রুট নার্সারির অফিসঘর। দূরে বাস্পা নদীর ধারে ট্রাউট ফার্ম। জাফরান খেতের চাষিদের ঘরগুলো অনেক দূরের থেকে কয়েকটা কালো ভালুকের মতো দেখাচ্ছে।

তহশিলদারের অফিসের পেছনে একখানা শ্লেটপাথরের চালা দেওয়া কাঠের ঘর। একটা বড় গোছের আখরোট গাছ ডালপাতা মেলে ছোট্ট ঘরখানাকে যেন আদরে সোহাগে আগলে রেখেছে। ঝোরকার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাক দিল সে, সুজয়, সুজয়।

অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে একটা মিশ্রিত আওয়াজ শোনা গেল। কেউ যেন আচমকা ঘুম ভেঙে খাটিয়ার ওপর উঠে বসল। সারা ঘরে দড়ি আর কাঠের একটা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল।

কে, তোসি?

হ্যাঁ আমি, আমি! ঝটপট বেরিয়ে এসো। উখাং-এর ফুল আনতে যাবে না? ভুলে গেলে নাকি?

ভেতরে এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ?

আমি ঠিক আছি। ভেতরে গেলেই দেরি হয়ে যাবে। তুমি বরং চটপট চলে এসো।

ধৌলাধার পর্বতের মাথায় বরফ, তার ঠিক উলটোদিকে হিমালয়ের প্রধান শাখায় কিন্নর কৈলাস। ছোট-বড় অনেকগুলো বরফে ঢাকা শৃঙ্গ। তার চারদিকে বরফের তলার পাহাড় দেওদার, কাইল, সিডার আর ফার গাছের জঙ্গলে ছাওয়া।

কনকনে কঠিন ঠান্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে রইল তোসি। ভ্যালির চারদিকে বরফের মাথা-উঁচু পাহাড়গুলো যেন ডিপ ফ্রিজের ভেতর সারা উপত্যকার সব কিছুকেই ভরে রেখেছে।

এতটুকু উত্তাপ আবহাওয়ার কোথাও নেই। তা না থাক, উত্তাপ ছিল তোসির বুকে। রাত পোহালেই ক্যালেন্ডারের পাতা জানিয়ে দেবে পাঁচই সেপ্টেম্বরের তারিখটা। উখাং উৎসবের উন্মাদনাময় চিহ্নিত দিন। 'উ' মানে ফুল। 'খাং' মানে চেয়ে দেখা। ফুলের সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখার উৎসব। কিন্নরের মানুষ ফুল ভালোবাসে। তাই সব উৎসবেই তাদের ফুলের সমারোহ। কিন্তু এই উখাং বা ফুলের উৎসবটি ফুলেরই খেলা। ফুল আনতে হবে দূর দুর্গম পাহাড়ের চুড়ো থেকে। পাহাড়ের গায়ে গভীর বনের ভেতর থেকে আর তুষার পাহাড় থেকে ঝরে পড়া স্রোত ধারার তীর থেকে।

সে ফুল দেওয়া হবে মাহাসু দেবতা, বদরীনাথ আর মহাকালীর চরণে। তারপর দেওয়া হবে গোপনে একান্ত প্রিয়জনের কবরীতে।

উৎসবের ফুলের সন্ধানে ছুটবে প্রতিটি ঘরের যুবা পুরুষেরা। কে কত ফুল সংগ্রহ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলবে। ডঙর, লোসকার্চ, খাসবল, গালচি —কত বিচিত্র রঙ আর গন্ধে ভরা ফুল গিরিগাত্র থেকে সংগ্রহ করে আনবে প্রতিযোগীরা।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সুজয়। ছামু কুর্তির ওপর পরেছে একখানা লম্বা ছুবা। ছামু সুতান বা উলের পাজামা পরেছে সে। কে বলবে সুজয় বাঙালি সন্তান। ভূগোলের মালমশলা সংগ্রহ করতে এসে তরুণ অধ্যাপক সুজয় সেন হয়ে গেছে টিপিক্যাল কিন্নর। প্রবল ভূমিকম্পে ওলট-পালট হয়ে গেছে সারা দেশটা। পথঘাটের চিহ্ন নেই। আজ চার মাস সে একই জায়গায় বন্দি।

তোসি সুজয়ের দিকে চেয়ে বলল, কোটিং আননি, ফুল নিয়ে আসবে কীসে?

বাস্কেট তো আমার কাছে নেই,—অসহায় গলায় বলল সুজয়।

তুমি একেবারে ভুলো, কাল আমি তোমার চারপাইয়ের তলায় রেখে দিয়ে গেছি না?—বলতে বলতে ঘরে ঢুকে কোটিংখানা বের করে আনল তোসি। সুজয়ের হাতে দিয়ে বলল, নাও ধর। এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

ওরা আবছা আলো-আঁধারির ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। সাংলা গ্রাম ঘুমিয়ে আছে। পায়ের জোম্বা বা উলের তৈরি রবারের সোল আঁটা জুতো থেকে বিশেষ কোনও শব্দ উঠছে না। সাংলা ডানদিকে রেখে ওরা নেমে এল বাস্পা নদীর ছামের কাছে। কাঠের ছাম্ বা পুল বেরিয়ে ওরা এল পাহাড়ের তলায়। পথ দেখা যায় না। চাঁদ ডুবে গেছে। ক্যালমং গাছের বনও শুরু হয়ে গেছে।

থমকে দাঁড়াল সুজয়। তোসি পেছন ফিরে বলল, কি দাঁড়ালে যে, হাত ধরতে হবে নাকি?

বলতে বলতে সে সুজয়ের দিকে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। সুজয় কুর্তির পকেটে ডানহাতখানা ভরে হাঁটছিল এতক্ষণ। শীতে তার জমে যাবার জোগাড়। এখন কুর্তির পকেট থেকে হাত বের করে ধরল সে তোসির হাত।

একপা একপা করে পাহাড়ের ওপর উঠছিল ওরা। পথ যেন মুখস্থ তোসির। মানচিত্রের ওপর দক্ষ জিয়োগ্রাফারের না তাকিয়ে পয়েন্টিং করার মতো। কিন্তু এই ধৌলাধার পর্বতের ওপর সুজয় একেবারে আনাড়ি।

অনেক চড়াই ভেঙে ওরা এসে দাঁড়াল একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে। কনকনে ঠান্ডায়ও হাঁপাচ্ছিল সুজয়। তোসি হঠাৎ সুজয়ের ছামু কুর্তির ভেতর দিয়ে হাতটা চালিয়ে দিল বুকের মাঝখানে। হাত দিয়ে বারকয়েক বুকটা ঘষে দিল। হাত বের করে নিয়ে বলল, এখন তোমাকে যার জিম্মায় দিয়ে যাব, সে তোমাকে পাহাড়ি ফুলের সন্ধান বলে দেবে। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব না। মেয়েদের ফুল তুলতে যেতে নেই উখাং-এর দিনে। ভোরের আগেই আমাকে আমার কিমে পৌঁছতে হবে।

আবার সুজয়ের হাত ধরল তোসি। মুখখানা সুজয়ের দিকে সরিয়ে এনে বলল, তুমি জয়ী হবে। আমি চাই, কাল উখাং মেলায় সবাই তোমার জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরুক।

পাথরের চাঁইটা ঘুরে ওপারে যেতেই সুজয়ের চোখে পড়ল একটা দৃশ্য। এই রাতের অন্ধকারে পাহাড় আর বনের ভেতর দৃশ্যটাকে অলৌকিক বলে মনে হল তার।

একটা বড়সড় গুহার মতো আস্তানা। একখানা পাথর মূল পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে ছাদের মতো আচ্ছাদনের সৃষ্টি করেছে। তার তলায় আগুন জ্বলছে। কাঠ পুড়ছে চিড় চিড় আওয়াজ তুলে। একপাল ভেড়া সমুদ্রের বেলাভূমিতে জমে থাকা ফেনার মতো পেটের ভেতর মুখ গুঁজে লটকে পড়ে আছে একটু দূরে। একটা মেয়ে আগুনের পাশে শুয়ে আছে কম্বলমুড়ি দিয়ে, আর একটা লোক পাহাড়ে পিঠ ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বসে ঘুমোচ্ছে।

ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় এরা। পাহাড়ে পাহাড়ে বহুদূর চলে যায়। অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ও ওদের কাছে অনধিগম্য নয়। কাংড়া আর কুলু উপত্যকায় ওরা গদ্দী, কিন্নরে ওদের নাম হয়েছে পালস।

এসব জানে সুজয়। পালসদের পাল পাল ভেড়া চরিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে সে। মুখে চিৎ চিৎ করে অদ্ভুত একরকমের শব্দ তুলে ভেড়াগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ওই আওয়াজকে ওরা বলে সিসরং।

তোসি এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। হাঁটু গেড়ে তার কাছে বসে অসংকোচে গায়ে হাত রেখে বলল, তেতে, তেতে।

সুজয় দেখল লোকটি চোখ মেলে চাইল আর সঙ্গে সঙ্গে তোসিকে দেখে ছড়ানো পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে ভদ্র হয়ে বসল।

কী রে, কখন এলি?

তোসি বলল, এই এখুনি এলাম। সঙ্গে আমার সেই কানেশ এসেছে। বন্ধুটির কথা তো আগেই বলেছি।

লোকটি সুজয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নামিয়ে বলল, বসুন, হাত-পা একটু গরম করে নিন।

সুজয় আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে গা-হাত-পা সেঁকতে লাগল। সে এইটুকু বলার অপেক্ষাতেই ছিল।

তোসি বলল, পাহাড় পেরিয়ে সালং নিয়ে কবে যাচ্ছিস ওপারে?

হাসল লোকটি। বলল, তুই কি আমাকে এই রাং থেকে তাড়িয়ে দিতে চাস নাকি রে?

তোসি বলল, এ কথা বললি তুই! আর কোনওদিন তোর কাছে আসব না।

রাগ করিস কেন,—বলেই লোকটি তোসির বিনুনি ধরে টেনে দিয়ে হাসতে লাগল।

তোসি বলল, তোর সঙ্গে কথা বলার সময় এখন আর আমার নেই। সন্ধে থেকে ওপারের পাহাড়ের গুহায় কামরুর ছেলেগুলো সব ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে। ভোরের আলো ফুটলেই ওরা ছুটবে ফুলের খোঁজে। আমি আমার বন্ধুকে এদিকে নিয়ে এলাম শুধু তোর ভরসায়।

হাসল লোকটি। বলল, ভরসা যখন করেছিস তখন চুপচাপ বসে থাক।

হঠাৎ পা বাড়িয়ে এক ঠ্যালা লাগাল ঘুমন্ত মেয়েটাকে।

যুবতী মেয়েটি দেহটাকে ভেঙেচুরে দুটো হাত ছড়িয়ে মুঠো পাকিয়ে আলসেমি ভাঙল। তারপর ঝাঁকুনি মেরে উঠে বসল।

পালস লোকটি বলল, তোসি তার কানেশকে নিয়ে এসেছে, দুধ গরম করে দে।

সুজয় বলল, এসবের কী দরকার। অকারণে ভোর রাতের ঘুমটা ভাঙানো হল।

তোসি বলল, ও তোমাকে গরম দুধ না খাইয়ে ছাড়বে ভেবেছ? ও চলে ওর নিজের খেয়ালখুশিতে, কারও কথায় কান দেবার দরকারই মনে করে না।

মেয়েটি একটা বাটি হাতে তুলে নিয়ে ছাগলের দঙ্গলের কাছে উঠে গেল। একটা ছাগলীকে গুঁতো মেরে তুলে তার থেকে খানিকটা দুধ চুঁই চুঁই করে দুয়ে নিল।

নির্জন পাহাড়ে অন্ধকারের কালো জোব্বা পরে দাঁড়িয়ে আছে সিডার আর ফার গাছের সারি। তুষার পাহাড় থেকে নেমে আসছে একটা কনকনে ঠান্ডা। সমস্ত পার্বত্য প্রকৃতিকে সে যেন তার নিঃশব্দ শাসনে স্তব্ধ করে রেখে দিয়েছে। তারই মাঝে খানিকটা গনগনে আগুন দপ দপ করে জ্বলে উঠছে। এক চিলতে জায়গা জুড়ে তার রাজত্ব। সেখানে সারা ধৌলাধারের শীতের শাসন অচল।

গরম দুধ খাওয়া শেষ হলে তোসির কানের কাছে লোকটি মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কী যেন বলল।

তোসি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে সুজয়ের দিকে চেয়ে বলল, থারচেন বলছে, তার কাছে তো আঙ্গুরী নেই, তুমি কি ঘণ্টি খেতে পারবে?

সুজয় বলল, মদে আমার আসক্তি কম, তবে আঙ্গুরী নেই বলে যে অন্য কোনও ফাসুর ছোঁব না, এমন গোঁড়ামি আমার নেই।

ওই দুধের পাত্রেই ঘণ্টি ঢালা হল। সুজয় সামান্য নিলে, কিন্তু তোসি স্পর্শ করল না।

সুজয় এ ক'মাসে দেখেছে, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বাড়িতে গেলেই তারা আঙ্গুরী অফার করে অতিথিকে। তারা নিজেরা খায়, কিন্তু মেয়েরা খায় না। সারা কিন্নরে সাধারণত মদ চোলাই করে মেয়েরা, কিন্তু পুরুষ ছাড়া কোনও মেয়েকে ফাসুর খেতে দেখা যায় না।

আঙ্গুরী অনেক দামি সুরা, আঙুর থেকে জন্ম তার। তোসির বাড়িতে ওই আঙ্গুরীরই চলন। সুজয় গেলেই তোসির মা আর বোনেরা তাকে আঙ্গুরী এগিয়ে দেয়, কিন্তু কেউ ঠোঁটে ছোঁয় না সে ফাসুরের পাত্র।

অনেকখানি ঘণ্টি গলায় ঢেলে থারচেন নামের পালসটি উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সুজয় আর তোসিও উঠল।

থারচেন বলল, চলুন, যাওয়া যাক।

তোসি রহস্যভরা চোখে একবার তাকাল সুজয়ের দিকে, তারপর যে পথে এসেছিল সেই পথে পা বাড়াল।

থারচেনকে অনুসরণ করে সাবধানে চলতে লাগল সুজয়। একবার পিছন ফিরে দেখল, থারচেনের বউ মাথা নীচু করে বসে আগুনে কাঠের টুকরো ফেলছে।

মেলা-প্রাঙ্গণ সুজয়ের জয়ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একজন বিভুঁইয়ের লোকের এই কৃতিত্ব ভাবাই যায় না। ঈর্ষা নেই কারও মনে। মেয়েরা গলা সপ্তমে তুলে সুজয়ের সাধুবাদ দিচ্ছে, কামরুর ছেলেরা সুজয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

সুজয় সবরকম ফুলই এনেছে, তার ওপর নিয়ে এসেছে দুর্লভ চম্বক।

মেলা-প্রাঙ্গণের ওপরে একটা পাহাড়ি গুহা। সেই গুহা বা উদাব্রোতে সকলের সংগ্রহ করা সব ফুল রাখা হয়েছে। উখাং উৎসবের এই নিয়ম। মাহাসুর পুরোহিত অভ্যর্থনা করে এনেছে পুষ্প-সংগ্রহকারীদের। তারপর মহাকালীর মন্দিরে পুজো দিতে গেছে সকলে। বলি পড়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে বেজে উঠেছে ঢোল, রণসিং, কন্নাল। পুজো হয়েছে কামরুর মহাদেবতা বদরীনাথের। করদার পাহাড়ি ঝরনা থেকে জল নিয়ে এসে বদরীনাথের গ্রোচের মাথায় ছিটিয়ে দিতেই এক ধরনের অস্বাভাবিক রূপান্তর ঘটে গেছে তার। লোকটি তখন বলে গেছে দেশের আগামী শস্যের সম্ভাবনার কথা। শুভ-অশুভ ভবিষ্যৎবাণী।

তার ঠিক পরেই বুশেহারের রাজা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। দেবতার গ্রোচ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে প্রথম পুষ্পগুচ্ছ। এরপর উদাব্রো উজাড় করে সবার হাতে দেওয়া হয়েছে ফুল। অমনি শুরু হয়ে গেছে নাচ। দোলনায় দুলছেন দেবতা, আর তাঁকে ঘিরে উখাং-এর গান গাইতে গাইতে নাচের দোলায় দুলছে সারা কামরু আর সাংলা দেশাং-এর নারীপুরুষ।

নেই শুধু তোসি। সারা মেলায় ঘুরে ঘুরে সুজয়ের সন্ধানী চোখ খুঁজে পায়নি তোসিকে। সে কাউকে প্রশ্ন করেনি, কারণ তোসি সম্বন্ধে তার সীমাহীন কৌতূহল থাকলেও কামরুর মানুষদের মনে অকারণ সন্দেহ সে জাগাতে চায়নি। তোসির বোনেদের সে দেখেছে উৎসবে

যোগ দিতে। তোসির মা অতি সম্ভ্রান্ত পোশাকে একবার এসে দাঁড়িয়েছিলেন উৎসব-প্রাঙ্গণে। সে সময় পুরোহিত উদাব্রো থেকে আনা ফুল দিচ্ছিল বুশেহারের রাজার অঞ্জলিবদ্ধ হাতে। বুশেহারের প্রৌঢ় রাজা গুলাব সিং হাসতে হাসতে সে ফুলের কিছু দিলেন তোসির মায়ের হাতে। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভ্রান্ত নারী-পুরুষের আরও কেউ কেউ সে ফুল পেল। যতক্ষণ না রাজার হাতের ফুল নিঃশেষিত হল ততক্ষণ রাজা গুলাব সিং জনতাকে প্রীতি দেখালেন তাঁর ফুল বিলিয়ে দিয়ে।

তিন দিন ধরে চলল মেলার নাচ-গান। একসময় সমাপ্তি ঘটল উৎসবের, কিন্তু সুজয়ের সীমাহীন বিস্ময় আর উদ্বেগকে শান্ত করতে কেউ এসে দাঁড়াল না তার সামনে।

তহশিলদারের দেওয়া ছোট্ট ঘরে সুজয় বিমর্ষ হয়ে বসেছিল। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সে ভাবছিল তার অবস্থার কথা। হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ আর তাদের গতিপ্রকৃতি, হিমবাহ সৃষ্ট বিভিন্ন লেক ও তাদের স্রোতস্বিনীর রূপান্তরের ছবিগুলি স্বচক্ষে দেখার জন্যেই সে বহুদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ের অদম্য একটা ইচ্ছা ছিল তার মনে। তাই ছুটি হলেই সে বেরিয়ে পড়ত। কষ্টকর ভ্রমণে সে কাউকে সঙ্গী করত না। একা একা ঘুরে বেড়ানোতেই ছিল তার উৎসাহ আর উন্মাদনা। কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে বহুবার, কিন্তু সাহসের সঙ্গে সে সব বাধার মোকাবিলা করেছে।

শুধু হার মানতে হল তাকে এই কিন্নর ভূমিতে এসে। জায়গাটা যেমন দুর্গম, তেমনি রহস্যময় আর সুন্দর। রোমাঞ্চকর রমণীয়তা আছে কিন্নর দেশে। যত গভীরে প্রবেশ করা যায় ততই যেন রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে। পাহাড়ের পর পাহাড় ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথ অতি সংকীর্ণ। পায়ে হেঁটে চলা, অথবা পথ পরিষ্কার থাকলে গাড়ি চড়ে কিছু পথ এগিয়ে চলা। বিরাট বিরাট পাহাড় কল্পকথার দৈত্যপুরীর মতো জেগে আছে। পথের ওপরে ঝুঁকে আছে পাথরের ছাদ। যেন হাজার হাজার স্থপতি সিস্ট রকগুলোকে কেটে কেটে দৈত্যরাজের পাষাণ প্রাসাদ বানিয়েছে। একটা দুরন্ত মেয়ের মতো পাহাড়ের অনেক নীচ দিয়ে শতদ্রু নদীটা পালাচ্ছে, কিন্তু পালাতে পারছে না। যেদিকে ছোটে সেদিকে পাহাড়। ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে নদী।

মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে সব জায়গায়। সিস্ট রক পেরিয়ে গিয়ে পড়ছে ঝুরো পাথরের তৈরি পাহাড়। বাতাসে মাটি মেশানো পাথর ঝুর ঝুর করে ঝরছে। কখনও বা ধুলোর ঝড়ে পথঘাট অন্ধকার। তার ভেতর সরে যাওয়া ঝুরো মাটি থেকে নেমে আসছে ছোট-বড় ঝাঁক ঝাঁক বোল্ডার। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে আসছে নীচে। পথ ভেঙে লাফিয়ে পড়ছে বহু নীচে শতদ্রুর জলে। আবার কতক্ষণ পরে সবকিছু প্রশান্ত। পথ থেকে বোল্ডার সরানো হচ্ছে, মেরামত হচ্ছে পথ। বোল্ডারপাতের সময় মানুষ, যানবাহন সামনে পড়ে গেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে শতদ্রুর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সীমাহীন সৌন্দর্যের দেশ এই কিন্নর। ধৌলাধার আর হিমালয়ের প্রধান শাখাটি যেন মেতে উঠেছে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায়। ঝক ঝক করছে ধবল তুষার। সূর্যের উদয়

আর অস্তের মুহূর্তগুলোতে তুষার চূড়ায় রঙের আশ্চর্য খেলা চলে। সবুজ সিডার আর ফারের অরণ্য আদি যুগ থেকে আবৃত করে রেখেছে পর্বতের নিম্নদেশের নগ্নতা। কোথাও শুভ্র ফেনা তুলে তরঙ্গিত ভেড়ার পাল চলেছে গিরিপথ বেয়ে। পালসদের মুখে বেজে উঠছে সিসরংয়ের অদ্ভুত সব শব্দ।

কিন্নর পেরিয়ে যারা বিভুঁইয়ে গেছে, কিন্নরে ফেরার জন্যে তাদের প্রাণ আকুল। গানে গানে ঝরে পড়ছে তাদের মনের ব্যথা।

জ্যেষ্ঠং আষাঢ়ং গরমি দোয়ারা
ইয়ালুচি উ উ।
নিঙমাজোন সারগেও
কিনোরিং বিমু চালসে
মন বন সুন চেয়াসে।—

গরমের মরশুম এখন। ইয়ালু ফুল ফুটেছে। ওই ফুলের দেশে যাবার জন্যে মন আমার উদাস। আমার মা-বাবার কাছে ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে মন।

জ্যোৎস্নারাতে গাঁয়ের ঘরবাড়ি গাছপালা আর অদ্ভুত বৌদ্ধ স্তূপের মতো মন্দিরচূড়া যখন মায়াময় হয়ে ওঠে তখন কিন্নর-কিন্নরীর দল সন্তং-এর মাঝে দাঁড়িয়ে নাচে আর গায়। কিন্নরীদের উচ্চগ্রামী গলার সুর পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজতে বাজতে, সিডার বনের শন শন শব্দের সঙ্গে মিশে বাস্পা, স্পিতি, শতদ্রু নদীর তরঙ্গের ধ্বনির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

ভূগোলের মালমশলা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে রূপ দেখবে দুচোখ ভরে এই ছিল সুজয়ের ইচ্ছা, কিন্তু বাদ সাধল ভূগর্ভের অদৃশ্য সংক্ষোভ। সাংলার উপত্যকায় বেড়াচ্ছিল সে। সন্ধান করে ফিরছিল ইউসেপ ভ্যালির। পাশে দাঁড়িয়েছিল তোসি। তাকে বোঝাচ্ছিল সুজয়, কেমন করে সহস্র সহস্র বছর আগে একটা শ্বেত দৈত্যের মতো হিমবাহ নেমে এসেছিল পাহাড় কাটতে কাটতে পথ করে। তারপর এই ভ্যালির মধ্যে গলে গিয়ে তার শ্বেত দেহখানা হয়ে গিয়েছিল নীলকান্ত মণির মতো। একসময় সেই নীল সরোবর খুঁজে পেয়েছিল তার মুক্তির পথ। বাস্পা নদীর রূপ ধরে সে ছুটে গিয়েছিল নুড়ির নূপুর বাজিয়ে বনের পথ চিরে। একসময় মিশে গিয়েছিল কলনাদিনী শতদ্রুর সঙ্গে।

সুজয় নদীতীর থেকে নুড়িগুলো হাতে তুলে নিয়ে তোসিকে দেখিয়ে বলেছিল, এই দেখ মোরেণ। হিমবাহের গতিপথের পরিত্যক্ত চিহ্ন। তোসি গল্পের মতো শুনছিল সে কাহিনি। হাতে নিয়ে দেখছিল সুজয়ের দেওয়া মোরেনগুলো। এমন সময় ধৌলাধারের শিখরে শেষ সূর্য কাঁপতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সারা পর্বত। কেঁপে উঠল বন পাহাড় উপত্যকা। সুজয়ের বুকের কাছে টলে পড়ল তোসি। ভূমিকম্প, ভূমিকম্প। একটা আর্তনাদ বেজে উঠল তোসির ভয়ার্ত কণ্ঠে।

সাংলার বৌদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টা তখন পাহাড় কাঁপিয়ে ঢং ঢং শব্দে বেজে চলেছে।

রাত তখন কত অনুমান করা কঠিন, আলোর চিহ্ন কোথাও নেই। ছোট ছোট কম্পনে তখনও ধরিত্রীর দেহ শিউরে শিউরে উঠছে। বাস্পার অতি শীতল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ভয়ার্ত দুটো দেহ। নিবিড় বাঁধনে তখন দুটো দেহ এক হয়ে গেছে।

তোসিকে দুহাতে তুলে ধরে উঠল সুজয়। দুটো দেহ তখনও শঙ্কাতুর উত্তেজনায় কাঁপছে।

তোসি এবার সুজয়কে বেষ্টন করে ধরেছে। অন্ধকার পথে সুজয় একেবারে অন্ধ। তোসি তাকে নিয়ে চলল রেস্ট হাউসের দিকে। পথ ভেঙে গেছে, মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়েছে গভীর গর্ত, বড়-ছোট বোল্ডার গড়িয়ে নেমে এসেছে পাশের পাহাড় থেকে। অতি সন্তর্পণে সুজয়কে ধরে রেস্ট হাউসের সামনে দুজনে এসে যখন দাঁড়াল তখন তারার অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল, শ্লেটপাথরের একদিকের ছাদ ধসে গেছে। কয়েকটা কাঠের বর্গা প্রেতাত্মার লম্বা কালো হাতের মতো ঝুলে আছে।

তোসি ছুটে দরজা খুলতে যেতেই তাকে বাধা দিল সুজয়। ভূমিকম্পের জের মেটেনি, সারা বাড়িখানা যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত বাইরে ফাঁকা জায়গাটুকুতে অপেক্ষা করা ভালো।

তোসি বলল, তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি কামরুর অবস্থাটা দেখে আসি। ওরা বেঁচে আছে তো!

বলতে বলতে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল তোসির। সুজয় জানে, মানসিক শক্তির দিক থেকে তোসির তুলনা হয় না। তবু তাকে এমন করে ভেঙে পড়তে দেখে সুজয় বলল, চলো আমরা একসঙ্গে যাই, তোমাকে একা আমি কিছুতেই যেতে দিতে পারব না।

তোসি বলল, দুজনে একসঙ্গে বিপদের মুখে পড়ে কী লাভ বল? তুমি তো পথ চিনে যেতে পারবে না, তাই আমি একা যেতে চাই।

সুজয় বলল, বিপদ হলে দুজনেরই হোক! যখন বড় বিপদটা একই সঙ্গে থেকে পার হয়ে এসেছি তখন ছোটখাট বিপদে আর ছাড়াছাড়ি কেন।

সেদিন তোসি আর বাধা দিতে পারেনি সুজয়কে। দুজনেই ভাঙাচোরা উঁচু-নীচু পথের ওপর দিয়ে এগিয়েছিল।

কামরু গ্রাম আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছিল। ভূকম্পন-তরঙ্গ হিমালয়ের এই প্রস্থিত অংশটিকে স্পর্শ না করে চলে গেছে চিনি ভ্যালির দিকে। চিনি ভ্যালির বহু অংশ যেখানে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে সেখানে কামরু পাহাড় প্রায় অক্ষত থেকে গেছে। তার পাঁচতলা প্রা বা কেল্লা, মন্দির, ঘরবাড়ি সবই দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব মহিমায়।

ছোটখাট দু'একটি অনুল্লেখ্য ক্ষয়ক্ষতি এত বড় একটা ভূমিকম্পের কাছে কিছুই নয়। মানুষগুলি কিন্তু কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে নেমে এসেছিল আখরোট গাছের প্রান্তরে। দূর থেকে ওরা শুনেছিল কামরুর আর্ত অধিবাসীদের বদরীনাথের জয়ধ্বনি দিতে।

তোসিকে ফিরে পেয়ে শুধু তার পরিবার নয়, গাঁয়ের সকলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল।

বিদেশি সুজয়কে তোসির সঙ্গে দেখে সেদিন অখুশি হয়নি কামরুর অধিবাসীরা।

সেই থেকে এই ক'মাস তোসির বাড়িতে তার আসা-যাওয়াকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই দেখে আসছে সকলে। বিপদের দিনের বিদেশি এখন সারা গাঁয়ের আশ্রিতজন। রেস্ট হাউসে

বেশি দিন থাকার নিয়ম নেই, তাই গ্রামের মানুষদের সাহায্যে সে তহশিল অফিসের পেছনের খালি ঘরখানাতেই থাকার সুযোগ পেয়েছে। আর সেখানেই তোসির চলেছে রাত্রিদিন যাওয়া-আসা। কামরু থেকে সাংলার স্কুলে সে পড়াতে আসে। পথেই তহশিল অফিসের সেই ঘর। আখরোট গাছের আড়ালে পথটা অদৃশ্য হয়ে যায়। তোসি সুজয়ের ঘরে ঢুকে আসে। চরাচরের কেউ দেখতে পায় না তাকে।

এদিকে সুজয়ের দেশে ফেরার পথ এখনও খোলেনি। পাহাড়ি পথ মেরামতের কাজ অত সহজ নয়। তাই বাধ্য হয়ে সুজয়কে থাকতে হয় তার ঘরে, তার কাজকর্ম ভুলে। তার এই দুঃখের দিনে সান্ত্বনার একমাত্র উৎস এই তোসি মেয়েটি।

আশ্চর্যভাবে পরিচয় হয়েছিল তার তোসির সঙ্গে। সিমলা থেকে কিন্নরের পথে আসছিল সে। রামপুরে এসে বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকটি যাত্রী নেমে গেল। কয়েকজন পুলিশ সেই শূন্য সিটগুলোতে উঠে এসে বসল। সঙ্গে উঠল একটি সুবেশা তরুণী। পথে সুজয় রামপুর বুশেহারের যেসব মেয়েকে দেখেছে তাদের থেকে এর রং আর গড়নই শুধু সুন্দর নয়, পোশাক-আশাকও অন্য ধরনের। বিশেষ করে এ অঞ্চলের মেয়েদের মতো তার মাথায় স্কার্ফ ছিল না, একটা সুন্দর টুপি ঘিরে ছিল তার চুলে ভরা মাথাটা।

গাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির কাছে সামান্য সময় থেমেই আবার চলতে লাগল। একটু দূরে বাস-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়াবে। সেখানেই নামবে সুজয়। একদিন রামপুরে থেকে এস. ডি. এম.-এর কাছে কিন্নর প্রবেশের অনুমতি-পত্র নিতে হবে তাকে। সুরক্ষিত এলাকা কিন্নর। পারমিশন ছাড়া কোনও ভারতীয়ের পক্ষেই প্রবেশের অধিকার নেই।

বাসস্ট্যান্ডের কাছে এস. ডি. এম.-এর অফিস। কন্ডাক্টর সেখানেই নামিয়ে দেবে বলেছে। চুপচাপ বসে সুজয় লক্ষ করছে মেয়েটিকে। মেয়েটি পুলিশ অফিসারটির পরিচিত বলে মনে হল। নাইলনের সুতোয় বোনা ব্যাগ থেকে কয়েকটা আড়ু বের করে সে অফিসার আর ক'টি পুলিশের হাতে একটি একটি করে দিয়ে দিল। অফিসারটি হেসে বলল, কোত্থেকে জোগাড় করলেন?

মেয়েটি সুন্দর একমুখ হাসি দর্শকদের উপহার দিয়ে বলল, গাছ থেকে।

অফিসারটি হেসে বলল, সে তো বটেই। ফল কি গাছে ছাড়া হয়?

মেয়েটি বলল, আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গাড়ি ধরার জন্যে আসছিলাম, পথের ধারে গাছটা পড়ল। একেবারে আড়ুর ভারে নুয়ে পড়েছে। তাই গাছটার ভার একটু হালকা করলাম।

কপট গম্ভীর্য গলায় এনে অফিসারটি বলল, তাহলে তো মালসুদ্দো চোরকে অ্যারেস্ট করতে হয়।

ততক্ষণে অফিসার আর পুলিশদের আড়ুতে কামড় বসানো হয়ে গেছে।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, চোরাই মালে ভাগ বসানোও সমান অপরাধের।

সুজয় হেসে উঠতেই মেয়েটি তার দিকে এক ঝলক হেসে একটি আড়ু এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি দেখছি আমার পক্ষে, এই আড়ু নিন।

সুজয় অমনি বলল, ঘুষ কিংবা চুরির দায়ে পড়ব না তো?

পুলিশ অফিসার সমেত সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

অফিসারটি সুজয়ের দিকে চেয়ে বলল, কোত্থেকে আসছেন?

কলকাতা।

আবার প্রশ্ন, যাবেন কোথা?

সুজয় বলল, আপাতত রামপুর বাসস্ট্যান্ড। কাল এস. ডি. এম.-কে দিয়ে অনুমতি-পত্রে সই করিয়ে কিন্নরে ঢুকব।

অফিসারটি বলল, এস. ডি. এম. আজ সকালেই সিমলা রওনা হয়ে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে শুনেছি। ওখানে বিভিন্ন কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করবেন।

সুজয়ের মাথায় যেন পাথর খসে পড়ল।

এখন উপায়! আমার তো বসে থাকা চলবে না।

অফিসারটি বলল, অনুমতি আপনাকে নিতেই হবে। অনুমতি ছাড়া কিন্নরে ঢোকা অসম্ভব।

সুজয় বলল, তাহলে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই আমার। এখান থেকেই ফিরতে হবে।

এমন বিষণ্ণ হতাশ গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করল সুজয় যে মেয়েটি তার সিটে একটু নড়েচড়ে বসে পুলিশ অফিসারটিকে ফিস ফিস করে কী যেন জিজ্ঞেস করলে।

দুজনের বেশ কিছু সময় কথা হল। কথা হচ্ছিল ওদের দেশোয়ালি ভাষায়, তাই কোনও কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

কন্ডাক্টর সুজয়ের কাছে এসে বলল, এখানেই আপনাকে নামতে হবে।

সুজয় সিট থেকে উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলল।

দোটানায় পড়ে গেল সুজয়। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা তার। ফিরে যদি যেতে হয় তাহলে রামপুরে নামাই ভালো। কিন্তু কী আশ্চর্য মোহিনী শক্তি ওই মেয়েটির। সুজয় ওর ইঙ্গিতটুকু উপেক্ষা করে গাড়ি থেকে নেমে যেতে পারল না। ওকে ওর সিটের ওপর কে যেন জোর করে বসিয়ে দিলে।

একটু উত্তেজিত কথাবার্তা চলছিল মেয়েটির সঙ্গে পুলিশ অফিসারটির। শেষে একটি ইংরেজি বাক্য উচ্চারণ করে মেয়েটি তার কথায় ছেদ টেনে দিল। অমনি সুজয় বুঝল, মেয়েটি পুলিশ অফিসারের কাছে একটা কীসের চ্যালেঞ্জ রাখল।

কন্ডাক্টর আবার এল সুজয়ের কাছে। জিজ্ঞেস করল, এখন কোথায় যাবেন?

সুজয় একেবারে অন্ধকারে। সে জানে না কোথায় যেতে হবে। মেয়েটি তার সিট থেকে কন্ডাক্টরকে বলল, নাচারের টিকিট দিন।

সুজয় কন্ডাক্টরের কাছ থেকে নাচারের টিকিট নিয়ে পয়সা দিয়ে আবার চুপচাপ বসে রইল।

নাচার এলে মেয়েটি সুজয়ের কাছে এসে বলল, এখানেই আমাদের নামতে হবে।

সুজয় বাধ্য ছেলের মতো পাশে রাখা স্লিপিং ব্যাগ আর অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে নেমে পড়ল।

গাড়ি ছেড়ে দিতেই মেয়েটি পুলিশ অফিসারটির দিকে চেয়ে হাত তুলল। অফিসারটি একটুখানি হাত তুলে হাসল।

পথের ধারে পাহাড়। গাড়িটা শতদ্রুর তীর ধরে ভয়ংকর পাহাড়ি পথে এঁকে বেঁকে তাপ্‌রির দিকে ছুটে চলল।

গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ওরা দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের গা ঘেঁষে।

মেয়েটি সুজয়ের দিকে চেয়ে অসংকোচে বলল, আমার নাম তোসি, আপনার?

সুজয়।

মেয়েটি আবার বলল, আপনি যদি কিন্নরের ভেতরে ঢুকতে চান সিধে পথে, তাহলে একটু দূরেই চেকপোস্টের কাছে আপনাকে আটকাবে। এখন পেছনে যে পাহাড়টা দেখছেন, ওটার গা বেয়ে একটা 'ওম্' পথ আছে। বনের ভেতর দিয়ে পথ, তাই বড় একটা কেউ হাঁটে না ওই পায়দলের পথে। আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে ওপথে হয়তো আপনাকে পার করে নিয়ে যেতে পারি। ওখানে আপনাকে আটকাবে ফরেস্ট গার্ড, কিন্তু এই রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার আমার আত্মীয়। ওঁকে যদি কোনওরকমে সামনের ব্লকে পেয়ে যাই তাহলে আমাদের অনেক দিক থেকে সুবিধে হয়ে যাবে।

সুজয় হেসে বলল, আমি যে-কোনও রকম কষ্ট সইব বলেই এসেছি, কিন্তু আপনাকে কষ্টে ফেলার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। আপনি সোজা পথে চলে যেতে পারতেন, আমার জন্যে অকারণে আটকে পড়লেন। আমার খুবই খারাপ লাগছে আপনাকে ঝামেলায় ফেললাম বলে।

তোসি বলল, বিশ্বাস করুন, আপনাকে সাহায্য করব বলে বাস ছেড়ে পথে নামিনি। পুলিশ অফিসারের কাছে চ্যালেঞ্জ রেখে এই দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়েছি। উনি বলেছিলেন, পারমিশান ছাড়া চেষ্টা করলেও আমি আপনাকে কিন্নরের ভেতরে নিয়ে যেতে পারব না।

সুজয় বলল, মিথ্যে ঝুঁকি নিলেন।

মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, কোনও কিছু পারব না বললেই দারুণ একটা জেদ চেপে যায়। এ ব্যাপারটা পুরোপুরি সেই জেদের ব্যাপার।

সুজয় বলল, তাহলে আমি তৈরি, যেদিকে নিয়ে যাবেন সেদিকে যাব।

তোসি পাহাড়ের দিকে পা চালিয়ে বলল, চলুন।

সুজয়ের পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস আছে, তাই খাড়াই পাহাড়ে উঠতে তার তেমন কষ্ট হচ্ছিল না, কিন্তু যেভাবে তোসি অবলীলায় চড়াই ভেঙে উঠছিল, তা সুজয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সুজয় পিছিয়ে পড়ছিল। তোসি কোনও একটা ঝোরার কাছে অথবা গাছের তলায় পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে সুজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুজয় কাছে এলে আবার ওরা চলতে শুরু করে দিচ্ছিল।

ফরেস্ট বাংলোর কাছে এসে তোসি বলল, জানেন, আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।

সুজয় চিন্তিত মুখে বলল, কেন, কী হল?

তোসি ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল, বুঝছেন না, কত বড় রিস্ক নিয়ে আমি নিয়ে এসেছি আপনাকে। এখন যদি রেঞ্জ অফিসারকে না পাই তাহলে আর মুখ থাকবে না।

মনে মনে খুশি হল সুজয়, ও তাই বুক ঢিপ ঢিপ।

মুখে বলল, আপনি কিন্তু খুব দুঃসাহসী মেয়ে।

আর বলবেন না, এ সব জেদের কাজ করতে গেলে ফ্যাসাদ কি কম।

সুজয় একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, মেয়েটি ওকে কথা বলার কোনও সুযোগই দিলে না। সামনের দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগল, সুন্দরলাল, সুন্দরলাল।

কে, রেঞ্জার সাহেব নাকি ?—জানতে চাইল সুজয়।

তোসি বলল, আপনি কিচ্ছু জানেন না, ও রেঞ্জ অফিসার হতে যাবে কেন, ও তো চৌকিদার সুন্দরলাল।

সুজয় চুপ করে রইল। একটা লোক এগিয়ে এল জঙ্গলের লতাপাতা সরাতে সরাতে।

নমস্কার করে বলল, সাহেব তো নেই, তবে আজ সন্ধেয় আসার কথা আছে।

তোসি গম্ভীর হয়ে বলল, আমি কি সাহেবের কথা জানতে চেয়েছি? এখন তোমার বাংলোতে রাত কাটাবার মতো জায়গা আছে কিনা বল?

চৌকিদার সুন্দরলাল বলল, সাহেব এলে এক নম্বরে থাকবেন। দু'নম্বর পুরো খালি। তবে দু'নম্বরে একখানা খাট আছে। আর একখানা খাট দরকার হলে লাগিয়ে দেব।

তোসি বলল, চলুন, আজকের মতো চলায় ইতি। অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে রেঞ্জ অফিসারের জন্যে।

বাংলোতে এল তিনজনে। সুজয় ভাবল, মজা মন্দ নয় তো। এ যে রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার।

দু'নম্বর স্যুইট মূল বাংলোর থেকে একটুখানি তফাতে। সংলগ্ন কিচেন।

ঘরে ঢুকে দুজনেই খুব খুশি। নতুন প্ল্যাস্টিক কালারে ঘরখানা ঝকঝক করছে। সুন্দর ডিজাইনের পর্দা। সাদা জাফ্রি কাটা পেলমেট। ধবধবে সাদা দরজায় লাগানো পেতলের নব। ডানলোপিলোর গদির ওপর পিঙ্ক কাপড়ের কভার। তার ওপর বড় বড় গোলাপ ফুলের ডিজাইনওয়ালা সাদা চাদর।

একমুখ খুশি নিয়ে তোসি বলল, আজ তাপ্‌রি পৌঁছতে পারলাম না বলে মনে কোনও ক্ষোভ রইল না, কী বলেন?

সুজয় বলল, সবটাই তো আমার অনিশ্চিত। তার ভেতর এক রাতের জন্য এ আশ্রয়টা অনেকখানি নিশ্চিন্ত করল বইকি।

চৌকিদার সুন্দরলাল রসিক বলেই মনে হল। সে এক চক্কর দিয়ে এসে বলল, মেমসাব, আর একটা খাটের পায়া ভেঙে আছে। মিস্ত্রি লেগেছে কিন্তু সারাই হয়নি এখনও। দড়ির একখানা চারপায়া রয়েছে, আনব কি ?

তোসি তার চাঁদা মাছের মতো চকচকে সুন্দর চোখের কোনা দিয়ে ঘরের একপাশে পড়ে থাকা ইজিচেয়ারখানার অবস্থা দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আর কষ্ট করে খাটিয়া বয়ে আনতে হবে না।

রাতে রেঞ্জার সাহেব এলেন না। তোসি আর সুন্দরলাল যৌথ প্রচেষ্টায় চাউল, চাপাটি, ডাল আর একটা সবজি বানাল। ফরেস্ট রেস্ট হাউসে এই খাবার জোগাড় করাই এক মুশকিল ব্যাপার।

খাবার পাট চুকলে চৌকিদার তার ডেরায় চলে যেতেই বাধল আসল ঝঞ্ঝাট। সুজয় তার স্লিপিং ব্যাগটা খুলে নিয়ে বসল গিয়ে ইজিচেয়ারে।

অমনি চেঁচিয়ে উঠল তোসি, আমার জায়গাটা দয়া করে অকৃপাই করবেন না। আপনি ওই ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

সুজয় আরামের ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারের মাথায় হাত দুটো তুলে দিয়ে বলল, দোহাই আপনার, আর ঠাঁই নাড়া করবেন না। দারুণ আরামের জায়গা পেয়ে গেছি।

তোসি অনুনয়ের সুর গলায় ঢেলে বলল, আমি অনেকক্ষণ থেকে ওটায় শোব বলে তাক করে রয়েছি, আমাকে জায়গাটা ছেড়ে দিন, প্লিজ।

দুজনেই দুজনকে শোবার জন্যে ভালো জায়গাটা ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু উপভোগ্য একটা অভিনয় চলল কিছুক্ষণ।

শেষে সুজয়কে মুখের কথায় কোনও রকমে ওঠাতে না পেরে হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিল মেয়েটা।

সুজয় তোসির কাছে হেরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, খাটে যেতে পারি একটা শর্তে।

তোসি কথাটা শোনার জন্যে সুজয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে সুজয় বলল, আমার এই স্লিপিং ব্যাগটা আপনাকে নিতে হবে তাহলে।

তোসি বলল, আমি ব্যাগটা নিয়ে নিই আর আপনি সারারাত পাহাড়ি শীতে হি হি করুন আর কি!

কিছু হবে না আমার। আমি তো আরাম করে খাটের ওপর শুয়ে থাকব। দরকারটা হবে আপনারই।

তোসি বলল, ব্যাগের ভেতর ঢুকে গেলে মনে হবে, আমি যেন কোথায় হারিয়ে গেছি, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাই তো বলছিলাম, যার যেথা স্থান। ব্যাগটা আমাকে দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপচাপ শুয়ে পড়ুন গিয়ে বিছানার ওপর।

শেষে ঠিক হল, স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকবে তোসি। সে ইজিচেয়ারেই শোবে।

সুজয় বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে বলল, আপনি ব্যাগটায় ঢুকুন, আমি সুইচ অফ করছি।

তোসি মাথা নেড়ে বলল, করুন।

সুজয় আলো নিভিয়ে দিল। কিছুক্ষণ একটানা খসমস একটা শব্দ উঠল, তারপর সব চুপচাপ।

সুজয় শুয়ে শুয়ে ভাবছে, সারাদিনের আশ্চর্য সব ঘটনার কথা, এমন সময় একটা খসখস শব্দ মনে হল তার খাটের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে খাটের ওপর কে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল।

বেডসুইচটা জ্বেলে দিতেই দেখা গেল তোসি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার খাটের একপাশে। হাতে ধরা গরম একখানা চাদর। স্লিপিং ব্যাগের ভেতর আধখানা দেহ ঢোকানো।

কী হল?—সুজয় তাড়াতাড়ি উঠে বসে প্রশ্ন করতেই তোসি হেসে কুটিপাটি।

বলল, ধরা পড়ে গেলাম। চুপি চুপি এসে চাদরখানা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে পারলাম না।

সুজয় হেসে বলল, তাই মহাপুরুষরা বলেন, গোপনে কোনও কাজ করতে নেই।

তোসি বলল, এসব স্লিপিং ব্যাগ-ট্যাগের ভেতরে ঢোকার অভ্যেস নেই। আমাকে মুক্তি দিন এর থেকে। বিশ্বাস করুন, শীত আমাকে একটুও কাবু করতে পারবে না। বরং আমার গরম চাদরখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ওতেই আমি ঘেমে নেয়ে উঠব।

তোসি সুজয়ের কোনও কথাই আর শুনতে চাইল না। সে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে নিজেকে টেনে বার করল। তোসির গায়ে তখন সোয়েটার ছিল না, শুধু বুকে জড়ানো একখানা চোলি আর কম্বলের দোরি নিম্নাঙ্গে।

তোসি ইজিচেয়ারে শুয়ে আরামে একটা আওয়াজ তুলল। তারপর আলো নিভল, চরাচর চুপচাপ।

ভেন্টিলেটারের ভেতর দিয়ে প্রথম ভোরের আবছা আলো এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে সুজয় উঠে বসল বিছানায়। সামনে চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। ম্যাজিক নাকি, ইজিচেয়ারখানাও হাওয়া। মেয়েটির কোনও চিহ্নই ঘরে দেখা গেল না।

হাতমুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সুজয়। ইজিচেয়ারটা বারান্দার একপাশে পড়ে আছে, মানুষজন নেই। ঘরের ভেতরের চেয়ারখানা নিঃশব্দে বাইরে কখন বের করে নিয়ে গেল মেয়েটি, তার সামান্যতম আঁচও পায়নি সুজয়।

সে বাইরে পায়চারি করছে, এমন সময় দুটো বড় বড় রিঠে গাছের ফাঁকে উঁকি দিতে দেখা গেল তোসিকে।

সুজয় তার দিকে তাকাতেই তোসি এগিয়ে এসে বলল, রেঞ্জ অফিসার কাল অনেক রাতে এসেছেন। আমি দূর থেকেই গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম। শেষ রাতটা আরামেই কাটিয়েছি এক নম্বর বাংলোতে।

সুজয় বুঝল, রেঞ্জার ভদ্রলোকটির গাড়ির আওয়াজ শুনে তোসি তাড়াতাড়ি চেয়ারখানা বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে তারই ওপর শুয়েছে। তারপর আত্মীয় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। চলে গেছে এক নম্বর বাংলোয় আরামদায়ক শয্যায়।

কেন জানি না, সেই মুহূর্তে সুজয়ের বুকে অদ্ভুত এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ব্যথার ঢেউ উঠেছিল। কে এই রেঞ্জার, কী ধরনের সম্পর্কে ভদ্রলোক তোসির সঙ্গে জড়িত, কতখানি বয়স তাঁর, দেখতেই বা কেমন। এই সব অবান্তর প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসছিল সুজয়ের।

সাধ্যমতো নিজের মনোভাবটুকু গোপন করে রেখে সুজয় বলল, একটুও টের পাইনি আমি। ঘুমিয়েছি নিঃসাড়ে। আপনার অন্তত রাতের বিশ্রামটা সুখের হয়েছে জেনে খুশি হলাম।

তোসি ওদিক দিয়ে আর গেল না। বলল, অনেক রাত অবধি আমাদের প্ল্যান হয়েছে। আজ দুপুর নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব।

সুজয় বলল, ওই চেক পোস্ট পার হয়েই কি আমাদের যেতে হবে?

তাছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই।

ধরা পড়লে হাজতবাস, কী বলুন?

তোসি বলল, সবকিছুর জন্যে তৈরি থাকতে হবে। ভয় পেলে এখনও রামপুরের উলটো বাসে চড়ার সুযোগ আছে।

আমি সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরি। কোনও রকম অঘটনের পরোয়া করি না। কিন্তু আমার জন্যে আপনারা বিপদ ডেকে আনবেন, এটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।

বলেছি তো, তোসি বলল, এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়া।

সুজয় চুপ করে রইল। তোসি বলল, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না, তাহলে ওরা তন্ন তন্ন করে গাড়ি তল্লাশি করবে।

তাহলে?

তোসি বলল, আপনি যাবেন রেঞ্জ অফিসারের জিপে। একটু কষ্ট করে ডজন কয়েক চারাগাছের ভেতর খানিক সময় আত্মগোপন করে থাকতে হবে।

আর আপনি?

তোসি বলল, তাপ্‌রির আগে অথবা তাপ্‌রিতে দেখা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে। তাপ্‌রিতে পি. ডব্লিউ. ডি. ডাকবাংলোতে অপেক্ষা করতে হবে। যিনি আগে যাবেন তিনিই অপেক্ষা করবেন।

রেঞ্জার সাহেব চমৎকার মানুষ। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। কথায় কথায় সরস মন্তব্য। তোসির সঙ্গে একটা কী যেন রসিকতার সম্পর্ক ওঁর। তোসির সঙ্গে সুজয়কে জড়িয়ে রসিকতা করতে ছাড়লেন না।

সুজয় লজ্জা পাচ্ছিল দেখে ভদ্রলোক বললেন, লজ্জা একমাত্র নারীরই ভূষণ, পুরুষের নয়।

তোসি বলল, তাহলে পুরুষকে কি আপনি নির্লজ্জ হতে বলেন?

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠে বললেন, অসংকোচ আক্রমণেই পুরুষের পৌরুষ আর শোভা। লজ্জায় নয়।

বলেই দুটো বলিষ্ঠ হাতে তোসিকে জড়িয়ে ধরলেন। সুজয়ের সামনে তিনি এমন আচরণ করলেন, যেন কেউ কোথাও নেই।

তোসি বলল, আপনার বজ্জাতির জ্বালায় গেলাম। কী ভাবছেন বলুন তো এই অপরিচিত ভদ্রলোকটি।

রেঞ্জার বললেন, উনি শিক্ষানবিশি করছেন। নারীকে কীভাবে বলের দ্বারা বশীভূত করতে হয় তাই দেখে উৎসাহিত হচ্ছেন।

তোসি বলল, বলের দ্বারা না হাতি। অতর্কিতে আক্রমণ করাকে বল বলে না।

রেঞ্জার সাহেব তোসিকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এসো তাহলে, সামনা-সামনি এক হাত লড়াই হয়ে যাক।

তোসি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হেরে গেছি।

রেঞ্জার বললেন, এত সহজে হারার পাত্রী তো তুমি নও তোসি।

তোসি বলল, আপনার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে ভদ্রলোকের কাছে আর এক দফা অপ্রস্তুত হই আর কি।

খাওয়া-দাওয়া চুকলে গাড়ি করে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেল তোসি।

যাবার সময় সুজয়ের দিকে চেয়ে হাত তুলে মিষ্টি করে হাসল।

এখন সুজয় গাড়ি ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করবে ফরেস্ট বাংলোতে। তারপর আবার সে যাবে রেঞ্জার সাহেবের জিপে বৃক্ষশিশুদের ভেতর আত্মগোপন করে।

একসময় জিপ এল। চৌকিদার সুন্দরলাল তৈরি গাছগুলোকে কাঠের চৌকো টবে বসিয়ে একটি একটি করে জিপে তুলতে লাগল। পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন রেঞ্জ অফিসার।

কিছুটা বোঝাই হয়ে গেলে রেঞ্জার সাহেব বললেন, এবার কিছু সময়ের জন্য আপনাকে বনবাসে যেতে হবে মিঃ সেন।

সুজয় হাসিমুখে উঠে পড়ল। অমনি আরও কতকগুলো বাক্স সাজানো হল তার সামনে। এখন চারদিকে অরণ্য আবৃত সুজয়।

জিপে উঠে স্টিয়ারিং ধরলেন রেঞ্জার সাহেব। জিপ পাহাড়ি পথে গড়িয়ে চলল। রেঞ্জ অফিসারের মুখে এখন আর কোনও কথা নেই।

কিছু পরেই সংকীর্ণ পথ ছেড়ে গাড়ি এসে পড়ল প্রধান সড়কে। তারপর ছুটে চলল তাপ্‌রির দিকে।

এক সময় গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল চেকপোস্টের কাছে।

রেঞ্জার সাহেব গাড়িতে বসে কাকে যেন ডাক দিলেন। একটি অফিসার গাড়ির কাছে এগিয়ে এল। রেঞ্জার একটা গোলাপের চারা টব সমেত তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এতদিনে ঋণমুক্ত হলাম। কেমন ফুল ফুটল জানাবেন।

বাইরে থেকে কৃতজ্ঞতাসূচক আওয়াজ আসতে লাগল।

রেঞ্জার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, চলি তাহলে।

বলেই তিনি গাড়িখানা চেকপোস্ট থেকে বের করে নিয়ে সামনে এগিয়ে চললেন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু চেকপোস্ট থেকে একটি পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছিল জিপের পেছনে। সুজয় তাকে দেখতে পেলেও অরণ্যের আড়ালে আত্মগোপনকারীকে সে দেখতে পায়নি। তারপর অফিসারটি এসে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে সে গুমটির ভেতরে সরে গেছে।

তোসির দেখা পাওয়া গেল কিছু পথ এগিয়ে। একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে চেঁচাতে লাগল। তার কাছে গিয়ে জিপ থামিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন রেঞ্জার সাহেব।

আর্ত গলায় বললেন, হেরে গেলে তোসি, একেবারে হার। ইন্সপেক্টর সুদ ছিলেন ভাগ্যিস, নাহলে আমার বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নেওয়া হত।

তোসি কান্নামাখা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কী হল তাঁর।

রেঞ্জার বললেন, অনেক অনুনয় করলাম দুজনে মিলে, কিন্তু ছাড়া পেলেন না ভদ্রলোক।

তোসি বলল, আমি এখুনি যাব সেখানে।

রেঞ্জার সাহেব অমনি বলে উঠলেন, পাগলের মতো কী যা তা বলছ। তুমি যাবে ওঁর হয়ে ওকালতি করতে? আমি গভর্নমেন্টের লোক হয়ে পারলাম না, আর তুমি পারবে?

দেখব চেষ্টা করে, তোসি বলল, আমার জন্যেই ভদ্রলোক এই বিপদে পড়লেন। আপনি একটুখানি আমাকে চেকপোস্টের দিকে এগিয়ে দিন। একমিনিটও আর দেরি করবেন না, দোহাই আপনার।

শেষের দিকে গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল উদ্গত কান্নায়।

সুজয়ের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে চুপচাপ গাছের আড়ালে বসে রইল।

গাড়িতে উঠল তোসি। রেঞ্জার বললেন, মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে ভালোবেসে ফেলেছ।

তোসি দুহাতে মুখ ঢেকে এবার সত্যিই ফোঁপাতে লাগল।

রেঞ্জার গাড়িতে উঠে বললেন, একদিনের পরিচয়ে এত ভালোবেসে ফেললে। পথে এমনি কত মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়। তা বলে এত বড় বিপদের ঝুঁকি কেউ কি কারও জন্যে নেয়?

একটু থেমে আবার বললেন, তুমি তোমার সাধ্যের বাইরে করেছ তোসি।

অমনি তোসি রেঞ্জার সাহেবের কথা শেষ হতে না হতেই বলল, আমার শেষ চেষ্টায় বাধা দেবেন না দয়া করে। আমি অফিসার-ইন-চার্জের হাতে-পায়ে ধরব দরকার হলে। বলব, শুধু মানুষটিকে ফিরে যেতে দিন তাঁর নিজের দেশে।

রেঞ্জার বললেন, তুমি না পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ. পাশ করেছ, গভর্নমেন্ট স্কুলের মিস্ট্রেস, তুমি যাবে অফিসারের হাতে-পায়ে ধরতে, আশ্চর্য!

তোসি বলল, দোহাই আপনার, আমাকে ওসব আর মনে করিয়ে দেবেন না, আমার মাথায় এখন আর কিছু নেই।

হঠাৎ রেঞ্জার সাহেব বলে উঠলেন, মাথায় কিছু না থাক, বুকের ভেতর নিশ্চয়ই আছে। সেখানে এক ভিনদেশি বহাল তবিয়তে বাসা বেঁধেছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে চললেন রেঞ্জার।

তোসি করুণ গলায় বলল, কোথায় চললেন? গাড়ি ফেরান।

রেঞ্জার সাহেব ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে বললেন, বিশ্বাস কর তোসি, তোমার বন্ধুটিকে বিপদমুক্ত করে তবে এসেছি তোমার কাছে।

তোসি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, সত্যি?

রেঞ্জার বললেন, আমার কথায় আস্থা রাখতে পার, তাঁর বিপদ কেটে গেছে।

তোসি বলল, তিনি কি ফিরে গেছেন রামপুর বুশেয়ারের পথে?

রেঞ্জার বললেন, ফিরে গেলে খুশি হবে না তুমি? এত বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেছে বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে না?

তোসি বলল, খুশি হয়েছি কিনা বলতে পারব না, তবে তাঁর মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাব।

রেঞ্জার বললেন, ভদ্রলোক কিন্তু ছাড়া পেয়ে তোমার কথাই আমাকে বলেছিলেন। তোমার চেষ্টা সফল হল না বলে তিনি তোমাকে দুঃখ করতে বারণ করে গেছেন। আর একটা কথাও সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, তোমাকে কোনওদিনও তিনি ভুলতে পারবেন না।

তোসি কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবল। তারপর একসময় বলল, আপনি আমাকে এইখানে নামিয়ে দিন, এখুনি তাপ্‌রি থেকে সিমলার বাস এসে পড়বে, আমি ওই বাসে রামপুর চলে যাব। তাঁর সঙ্গে আজই আমার দেখা হতে পারে। হয় উনি রামপুরে আজ রাত কাটিয়ে ভোরের বাস ধরে সিমলা যাবেন, নয়তো এই তাপ্‌রি-সিমলার বাসটাই ধরবেন। আমি এই বাসে গেলে রামপুরে অথবা পথে ওঁকে নির্ঘাত পেয়ে যাব।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, এত কষ্ট করে ভদ্রলোকের কাছে যাবার কারণটা জানতে পারি কি?

তোসি বলল, ক্ষমা চেয়ে নেব। আমার খেয়ালের খেলায় ওঁর যে মেহনত হল, সেজন্যে ক্ষমা চাইব। নাহলে শান্তি পাব না।

রেঞ্জার বললেন, শুধু ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাবে, আর কোনও ভিক্ষা নেই? সত্যি করে বল, আমার কাছে কিছু লুকিও না।

আবার নীরবতা, আবার ফোঁপানির শব্দ। তোসি কোনও কথা বলতে পারল না।

রেঞ্জার বললেন, তোমাকে যদি তাঁর কাছে পৌঁছে দি তাহলে তুমি আমাকে কী পুরস্কার দেবে?

কান্না থেমে গেছে তোসির। হাসি হাসি মুখ করে বলল, যা চাইবেন।

রেঞ্জার বললেন, চাইবার কি শেষ আছে? জান তো মানুষ বড় লোভী। তাই সবকিছু উজাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি কাউকে দিতে নেই, বলতে হয় সাধ্যমতো দেব।

তোসি বলল, আমি যে কথা একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি তা কখনও ফিরিয়ে নিই না।

রেঞ্জার বললেন, বেশ, এতই যখন তোমার অহংকার তখন চাইব। তোমার সবটুকু ভালোবাসা নিঃশেষে উজাড় করে দাও আমাকে। আমি ইচ্ছেমতো বিলিয়ে দেব কাউকে। অবশ্য কারু যদি প্রয়োজন থাকে সে ভালোবাসায়।

একটু থেমেই পেছন ফিরে বললেন, কী মশায়, এই সুন্দরী, শিক্ষিতা, বিদেশিনী তরুণীটির ভালোবাসায় প্রয়োজন আছে আপনার? অবশ্য জোর করে দান করতে চাই না। ভেবে দেখুন। কিন্নরের সেরা আপেল।

সুজয় মাথা নাড়া দিয়ে জিপ থেকে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। ততক্ষণে মার শুরু হয়ে গেছে। রেঞ্জার ভদ্রলোকের বুকে মুখ লুকিয়ে তোসি তাঁর পিঠে কিল মেরে চলেছে।

ভদ্রলোক সকাতরে বলছেন, দেখুন তো মশাই, পরোপকার করার কী বিপদ!

অন্ধকার ঘরে বসে এসব স্মৃতির জোনাকিদের নিয়ে খেলা করছিল সুজয়। উখাং উৎসবের শেষে বিজয়ীর উত্তেজনা ছিল না তার মনে, একটা দুশ্চিন্তা আর অবসাদ তাকে অক্টোপাশের নিষ্পেষণে অবসন্ন করে ফেলেছিল।

রাত তখন কত, অনুমানের উপায় ছিল না। এ কোঠিতে বিজলি বাতি নেই। মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ চালায় সুজয়। পথের ধারে একটা মুদির দোকানের সঙ্গে সামান্য খরচে প্রাণধারণের মতো একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে সে।

বিছানায় শরীরটা ঢেলে দেবার আগে উখাং উৎসব থেকে নিয়ে আসা ম্যাগনোলিয়া ফুলটাকে ঠোঁটে ছুঁইয়ে স্পর্শ করল সে। জলের মধ্যে যত্ন করে সুজয় রেখে দিয়েছে ফুলটিকে। এই দুর্লভ ফুল সে উপহার দেবে তাকে, যে উখাং উৎসবে বিজয়ীর সম্মান লাভের পথ দেখিয়েছে। কিন্তু সে কোথায়? সারা সাংলা উপত্যকার বাতাসে বিষণ্ণতার ঢেউ তুলে সে হারিয়ে গেল কোথায়? তোসি চিরদিনই খেয়ালি। তার চলাফেরায় বিধি-নিষেধ আরোপ করার মতো ব্যক্তি কেউ নেই কামরু গ্রামে। সে স্বাধীন, সে স্বেচ্ছাবিহারিণী।

ক্লান্তির ঘুম নেমেছিল সুজয়ের চোখে, কে যেন তাকে স্পর্শ করে জাগিয়ে দিল।

কে, কে? সুজয় উঠে বসল।

চুপ্, আমি আমি।

তোসি?

বিছানার ওপর উঠে বসে তোসিকে জড়িয়ে ধরল সুজয়।

তুমি কোথায় ছিলে তোসি? সারা উখাং উৎসব আমার অন্ধকার হয়ে গেল। বিশ্বাস কর, তোমার এই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি।

তোসি বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা গলার শব্দ তুলে বলল, বড় ক্লান্ত সুজয়। আমি স্নান করে ঘুমুব।

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্নানের ঘরে জল তোলা আছে, কিন্তু গরম করার ব্যবস্থা তো নেই।

দরকার নেই, ক্লান্ত গলায় বলল তোসি, আমার গায়ের ভেতরটা একেবারে জ্বলে যাচ্ছে, সারা ধৌলাধারের বরফগলা জলেও আমার সে জ্বালা জুড়োবে না।

সুজয় অনুভব করল, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। সে বাতি জ্বালাতে যাচ্ছিল কিন্তু তোসি তাকে বাধা দিয়ে বলল, একটুও আলো না। আমি অন্ধকারেই স্নান করব।

একটু থেমে বলল, আমার সারা শরীর বড় নোংরা হয়ে আছে, তুমি আমাকে ছুঁয়েছ। আগে তুমি স্নানের ঘরে গিয়ে শুদ্ধ হয়ে এসো।

সুজয় বলল, ওতে আমার কিচ্ছু হবে না।

তোসি অধীর গলায় বলল, বড় ক্লান্ত সুজয়, আমাকে বেশি কথা বলিও না। লক্ষ্মীটি, যা বলি শোন।

সুজয় অগত্যা স্নানের ঘর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল। তোসির ইচ্ছেমতো পোশাক পরিবর্তন করল। তারপর খাটের ওপর বসে ভাবতে লাগল তোসির কথা।

তোসি স্নানের ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে কনকনে ঠান্ডা জল গায়ে ঢালতে লাগল। প্রচণ্ড শীতে ওই বরফ জলগুলো তোসি গায়ে ঢালছে, আর ঘরের ভেতর বসে সেই জল ছড়িয়ে পড়ার শব্দে সুজয় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কতক্ষণ পরে তোসি বলল, তোমার একখানা সুতান আর ছুব্বা আমাকে দাও। অন্ধকারে সুজয় তাকে এগিয়ে দিল।

তোসি কিছু পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, দাও তোমার দেশলাইটা।

তাই দিল সুজয়। দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল তোসি।

কিছুক্ষণের ভেতরে বাইরে কাপড় পোড়ার একটা গন্ধ পাওয়া গেল। সুজয় মুখ বাড়িয়ে দেখল, কতকগুলো পোশাক দাউ দাউ করে জ্বলছে। তোসি দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। তার ছায়াটা অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। অশরীরী কোনও আত্মার মতো মনে হচ্ছে তোসিকে।

কতক্ষণ পরে এক বোঝা পোশাক পুড়িয়ে আগুনটা নিভল। তোসি ঘরে ঢুকে বালতিতে জল ভরে নিয়ে গিয়ে সেই ছাইয়ের স্তূপে হুড় হুড় করে ঢেলে দিল।

ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুজয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল।

সুজয় তার এইসব অদ্ভুত অনুষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, মনে হচ্ছে তুমি বড় ক্লান্ত, এসো, একটু ঘুমিয়ে নাও।

তোসির হাত ধরে টানতেই সে সুজয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সুজয় যত সান্ত্বনা দেয়, কান্না তত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

ওই কান্না ভাঙা গলায় তোসিকে বার বার বলতে শোনা গেল, আমি অপবিত্র হয়ে গেছি সুজয়, আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি।

সুজয় কিছু না বুঝেই বলল, কিছু হয়নি তোমার। এমন করে মিথ্যে ভেঙে পোড় না। কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না কখনও। নিজে ছাড়া নিজেকে নষ্ট করার সাধ্য আর কারও নেই। তুমি শান্ত হও।

সুজয় তোসির মাথাটা বুকে চেপে ধরে তার ভেজা চুলের ভেতর হাত বুলোতে লাগল। সুজয়ের কোল আর বুক জুড়ে তোসির তরুণী দেহটা কীসের এক সান্ত্বনাহীন শোকে থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

তোসি বলে চলল, উখাং-এর ফুল তোলার ব্যাপারে তোমাকে পাহাড়ে তুলে দিয়ে আমি নেমে এলাম। বাম্পার তীরে এসে ছাম পার হতে গিয়ে দেখলাম ওপারে আবছা আলো-আঁধারিতে একখানা জিপ দাঁড়িয়ে। প্রথমে ভাবলাম, এত ভোরে জিপ! এখানে তো বড় একটা জিপ আসে না। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছামের ওপর এক পা আর নীচে এক পা, —আমি ভাবছি তো ভাবছিই। পাশে এসে দাঁড়াল একটা লোক! আমি ভীষণ রকম চমকে উঠলাম। লোকটাকে তো এপারে দেখিনি। ছামের তলায় লুকিয়েছিল নাকি!

লোকটা কিন্তু বিনয়ের একটা নমস্কার ঠুকে বলল, আপনাকে বিদ্যাসিংজি একখানা চিঠি দিয়েছেন।

মুহূর্তে আমার কী যেন হয়ে গেল। বললাম, ভালো আছেন তিনি? আঃ বাঁচলাম। সেই ভূমিকম্পের পর পথ ভেঙে যাওয়ায় সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি তাঁর কোনও খোঁজই পাচ্ছিলাম না। কই, চিঠি কই?

লোকটা আমার হাতে চিঠি দিল, কিন্তু এত অল্প আলোয় চিঠি পড়া সম্ভব হল না।

বললাম, কোথায় আছেন এখন তিনি?

লোকটি বলল, রুণাং ফরেস্ট বাংলোতে। হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়েছেন। ভূমিকম্পে পায়ের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ে দুটো পা-ই প্রায় থেঁতলে গেছে। মেডিক্যাল হেল্প কিছু পেলেও পথ খারাপের জন্যে বড় কোনও হস্‌পিটালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

দারুণ ধাক্কা খেয়ে বললাম, তাঁর স্ত্রী কাছে আছেন তো?

লোকটি বলল, আমি ছাড়া ওঁর পাশে বলতে এখন আর কেউ নেই। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কল্পাতে রয়েছেন। তাঁরাও যে কে কেমন আছেন কেউ জানে না। আমি অনেক কষ্টে আপনার খোঁজ করে এখানে এসেছি। পথ বড় দুর্গম। রাতে এসে এপারে ফরেস্ট বাংলোতে ছিলাম। বাংলোর চৌকিদার বলল, আপনাকে সে পাহাড়ে উঠতে দেখেছে। সে ওই ছামের কাছে সিপ্‌ ব্রিডিং সেন্টারে রাত কাটিয়েছে। উখাং-এর ফুল তুলতে যাবে বলে উঠেছে অনেক রাতে।

আমার তখন কথা বলার মতো অবস্থা নয়। বললাম, আপনি কি জিপ নিয়ে এখুনি ফিরছেন?

লোকটি বলল, কাল সন্ধ্যার মুখে এসে পড়েছি, তাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। যদি আপনার দেখা পেতাম তাহলে যত দুর্গম হোক কাল রাতেই সাহেবের কাছে ফিরে যেতাম। একা পড়ে রয়েছেন তিনি।

কী যে ঢুকল আমার মাথায়, আমি লোকটাকে বললাম, চলুন, আমিও যাব আপনার বাড়িতে।

তুমি বুঝতে পারছ সুজয়, বিদ্যাসিং ফরেস্ট অফিসার আমার পিসতুতো দিদির স্বামী। তাঁরই চেষ্টায় তুমি চেকপোস্ট অফিসারের চোখে ধুলো দিয়ে চলে এসেছিলে।

তারপর শোন, আমি অপরিচিত লোকটির জিপে কিছু না ভেবেই উঠে বসলাম। সাত-আট ঘণ্টা জিপ চালিয়ে লোকটা পুরনো তিব্বত-হিন্দুস্থান রোডের পাশে একটা জঙ্গলে ঢুকল। চারদিকে কোনও জনবসতি নেই। জঙ্গলের ভেতর কিছু পথ গিয়ে দেখা গেল একটা বিধ্বস্ত ডাকবাংলো। জিপ থামলে আমি লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ে ঢুকে গেলাম ওই পোড়ো বাড়ির ভেতর।

না, আমার ভগ্নীপতি সেখানে ছিলেন না। তার জায়গায় দেখলাম, অনন্তরাম নেগীকে। একটা চারপায়ার ওপর বসে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে।

সুজয় তুমি জান এই লোকটাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাকে বহুদিন নানারকমের কথা জিজ্ঞেস করে উত্ত্যক্ত করেছে। এই সাংলা তহশিলের সবচেয়ে বড় ক্লথ মার্চেন্ট এই লোকটা। ভেতরে ভেতরে তেজারতি কারবারও করে। মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর রোগ আছে।

আমি যখন স্কুলের ওপর ক্লাসের ছাত্রী তখন ও আমাকে একবার কৌশলে প্রপোজও করেছিল। আমি হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বাড়িতে বলিনি। গ্রামের কোনও লোককে তো নয়ই। আর তা ছাড়া তুমি জান, আমার বাবা ছিলেন বিলাসপুরের ডি-সি। তিনি মারা যাবার পর আমিই সংসারে বড়। অবশ্য মা থাকলেও তিনি চিরদিনই শান্ত

প্রকৃতির। পুজো-আর্চা নিয়ে থাকেন। ছেলেবেলা থেকেই প্রায় আমি ছেলেদের মতো সব কাজকর্ম করতাম। আজও তাই আমাকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। আমি কখন কোথায় থাকি কী করি, সে কৈফিয়ত কাউকেই দিতে হয় না আমাকে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ওই অনন্তরাম নেগীকে আমার সামনে দেখে আমি মুহূর্তে ব্যাপারটা আঁচ করে নিলাম। বিরাট এক জালে বন্দি হয়ে গেছি, পালাবার পথ নেই। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললাম, হিম্মত আছে আপনার লালাজি। আর এমনি মরদকেই আমি ভালোবাসি। যোগাযোগ করে একটা ভোঁতা বুদ্ধির লোকের সঙ্গে বিয়ে হল, সংসার করলাম, সে আমার পছন্দ নয় আদপেই। এমনি একটা অদ্ভুত বন্য জায়গায় একটা শেরের সঙ্গে খেলা করলাম, এর চেয়ে বড় থ্রিল জীবনের আর কোথায় পাওয়া যাবে?

লোকটার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে যাব, কান্নাকাটি করে ওর পায়ে গড়িয়ে পড়ব, কিন্তু তার কিছুই হল না দেখে ও কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেল।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে খাটের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।

আমি বিনা দ্বিধায় খাটের এক কোনায় বসে পড়ে বললাম, কী চালাকিটাই না করলেন লালাজি। এখন আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রেঞ্জার বিদ্যাসিংয়ের নামে চিঠি দিলেন কেন?

অনন্তরাম বলল, যাওয়া-আসার পথে বিদ্যাসিংজির সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। আমি সাংলায় থাকি জেনে ভদ্রলোক তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন। তুমি যে তাঁকে কী পরিমাণ ভক্তি কর আর ভালোবাস তাও তিনি বলেছেন। তোমার ওই বাঙালি বন্ধুটির পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে চোরের মতো ঢুকে পড়ার খবর তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। তিনি অবশ্য আমাকে বন্ধুর মতো ভেবে নিয়ে সব কথা বলেছেন। তোমার ওই পেয়ারের বন্ধুটিকে যাতে ফিরে যাবার সময় সাহায্য করতে পারি, সেজন্যে অনুরোধও জানিয়ে রেখেছেন। পুলিশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, কথাটা উঠতেই উনি আমাকে চেকপোস্ট পার করে দেবার ব্যাপারে তোমার ওই বন্ধুটিকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। এইসব দেখে-শুনে ওঁর নামেই চিঠিটা লিখে পাঠাই।

বললাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্যাডটা জোগাড় করলেন কী করে?

লালা অনন্তরাম বিরাট বিরাট দাঁতগুলো বের করে হাসল।

হাসি থামলে বলল, এই ফরেস্ট বাংলো থেকেই জোগাড় হয়েছে।

বললাম, বাংলোর রেঞ্জ অফিসার বিদ্যাসিংজি এখন কোথায়?

অনন্তরাম ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, আর্থকোয়েকের বলি হয়ে গেছে বেচারা।

কথাটা শুনেই আর স্থির থাকতে পারলাম না, কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তখন আমার মনের ভাব গোপন করে অভিনয় করার মতো অবস্থা ছিল না।

লোকটা সেই সুযোগে আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বুকে জড়িয়ে ধরল।

আমার কান্না থেমে গেল। সারা শরীরটা শিউরে উঠল। আমি কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলাম সুজয়।

একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, লালাজি আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন। অনেক পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে, তাও আবার ভাঙা পথের ওপর দিয়ে।

হেসে বললাম, খাবারের ব্যবস্থা কিছু রেখেছেন কি এখানে?

নিশ্চয়, নিশ্চয়—লালা ব্যস্ত হয়ে উঠতেই বললাম, আমার জন্যে বলছি না, সবাইকে তো খেতে দিতে হবে, আর এরপর থেকে রান্নার ভার তো রইবে আমারই ওপর।

লালার মুখ থেকে যেন নাল গড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার সংসার তুমি দেখে নাও। আমি জানতাম, তুমি মনে মনে আমাকে ভালোবাসা। স্কুলে যাবার সময় আমার দোকানের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে, আমি তখনই ভাবতাম, তোমার ভালোবাসা একদিন আমি পাবই।

আমি ইঙ্গিতপূর্ণ একটা হাসি হেসে ঘরের ভেতরে চলে গেলাম। বুকের ভেতর কিন্তু অজস্র চিন্তার পাষাণভার। কী করে মুক্তি পাই। কী করে এই শয়তানটার হাতের মুঠি আলগা করে পালিয়ে যেতে পারি।

এক ঝলক বিদ্যুৎচমকের মতো মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। লালাকে ভেতর থেকে ইশারায় ডাকলাম।

একটা জিভ ঝোলা লোভী কুকুরের মতো লোকটা ছুটে এল আমার পাশে।

বললাম, ক'টি শাগরেদ আছে আপনার?

লালা বলল, শাগরেদ বলতে আমার ড্রাইভার।

বললাম, ব্যস, আর কেউ নেই?

লালা বলল, তোমার দরকার হলে সারভেন্ট আনিয়ে নিতে পারি।

বললাম, আমার কোনও দরকার নেই। তবে একটা উপকার যদি কাউকে দিয়ে করাতে পারেন তাহলে বড় ভালো হয়।

লালা অমনি বলল, বল কী করতে হবে?

বললাম, কাছেপিঠে কোনও ওষুধের দোকান আছে?

লালা বলল, ঠিক কাছে তো নেই, আছে কারছামে। যদি দরকার হয় তাহলে এখুনি ড্রাইভার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে আজ তো বেচারা ফিরতে পারবে না, কাল সকাল সকাল ওষুধ পেয়ে যাবে।

একটা ওষুধের নাম লিখে দিলাম লালার কাছ থেকে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে।

ড্রাইভার লোকটা কিছু খেয়ে নিয়ে হুকুম তামিল করার জন্যে বেরিয়ে গেল।

এখন ওই পোড়ো বাড়ির ভেতর রইলাম আমি আর ওই লালা।

লোকটা বার বার ভেতরে আসছে আর আমার দিকে লোলুপ চোখে চাইছে। যেন একটা মুহূর্তও সে আর বৃথা কাটাতে চাইছে না।

আমি টুকটাক বিকেলের রান্নার কাজগুলো সারার ভান করছি আর ওকে মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি।

বেলা যখন পড়ে এল, পাশের বাগান থেকে একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে এলাম। আয়না, চিরুনি ছিল, চুল বাঁধলাম। বিছানাটা তারই মধ্যে ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিকঠাক করলাম। টিপয়টা টেনে এনে একটা খালি মদের বোতলে ওই ফুলগুলো সাজিয়ে তার ওপর বসিয়ে দিলাম।

মনে হল যেন আমি লোকটাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। আমার এইসব কাজ সে দারুণ আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছিল, আর ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছিল। আমি ওর সামনে যেন একটা চঞ্চল হরিণের মতো খেলা দেখাচ্ছিলাম।

লালা বলল, তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যেতাম তোসি।

আমি বললাম, আপনি একটা ভুল প্রথমেই করেছেন। আমাকে যদি ভালোবাসতেন তাহলে আমার এত কাছে থেকে মতামতটা আগেই জেনে নিতে পারতেন। আপনি জানেন, আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি, আর আমি কারও ভালো বলা-মন্দ বলার তোয়াক্কাই করি না। তাছাড়া আমি যদি কাউকে কোনও কথা দিই তাহলে সব খুইয়েও তা রাখার চেষ্টা করি।

লালা বলল, এ কাজ আমি না বুঝে করেছি তোসি। মনে ভয় ছিল তোমাকে পাব না।

বললাম, তা বেশ করেছেন, এসব বোঝাপড়া পরে হবে। এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এ ঘরটা বসার ঘর, পথের দিকের জানালাটাও ভাঙা, রাতে কি এখানেই শোবেন, না ভেতরের ঘরখানায় বিছানা করব?

লালা বলল, ঠিক বলেছ, কিন্তু ভেতরে তো কোনও খাট-বিছানা নেই।

হেসে বললাম, ধরাধরি করে এই খাটখানা দুজনে ভেতরে নিয়ে যেতে পারব না? কী রকম শক্তি আপনার তা পরীক্ষা হয়ে যাক।

লালা পৌরুষে আঘাত পেল। বলল, পারব না মানে, তোমাকে সুদ্দু খাটের ওপর বসিয়ে তুলে নিয়ে যেতে পারি।

বললাম, তার আর দরকার নেই, আসুন, দুজনেই ধরে নিয়ে যাই।

আমি আগেই দেখে রেখেছিলাম, ভেতরের ঘরখানার ভেন্টিলেটার ছাড়া কোনও জানালা নেই।

লালা খাটের একদিক ধরে প্রথমে কসরত করতে করতে ঘরের ভেতর ঢুকতে লাগল। দরজা পেরিয়ে অনেক কষ্টে খাটখানাকে ঘরের ভেতর ঢোকানো হল। দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে তখন আমি। লালা ভারী খাটখানাকে ধরে নুয়ে প্রাণপণ জোরে টানছে। কে যেন আমার কানে কানে বলল, এই সুযোগ, না হলে তোমাকে সর্বস্ব খোয়াতে হবে।

মুহূর্তে দরজা টেনে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা দরজার ওপর আছড়ে পড়ল। দমাদ্দম লাথি চালাতে লাগল। একটা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের প্রবল গর্জন আমি শুনতে পেলাম। এক মুহূর্ত আর বিলম্ব নয়। ছুটতে লাগলাম হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে। বোল্ডারে ক্ষতবিক্ষত হল আমার পা, তবু চলায় ছেদ পড়ল না।

তিনটে রাত আর দিন কী করে যে কাটিয়েছি তা তোমাকে বলতে পারব না সুজয়। জিপের শব্দ পেলেই লুকোতাম পাহাড়ের চাঁইয়ের আড়ালে, কখনও বা বনের ভেতর। এক সন্ধ্যায় জিপের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি লুকোবার জায়গা খুঁজতে গিয়ে পা পিছলে পড়লাম নদীর দিকে। কিন্তু বিধাতার কী দয়া, আটকে গেলাম একটা গাছের কাণ্ডে। ভয় ভাবনার বাইরে তখন আমি, তাই ভয়াবহ পরিণতির কথা না ভেবে স্বাভাবিক আত্মরক্ষার চেষ্টায় গাছের কাণ্ডটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম।

পথের ওপর আলো ফেলতে ফেলতে জিপটা চলে গেল।

তোমার কথা আমার মনে হত সুজয়। বাড়ির কথা বড় ভাবতাম না। কারণ আমার এখানে ওখানে যখন খুশি কিছু না বলে যাওয়া-আসাটাকে সকলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম তুমি উখাং মেলায় আমাকে দেখতে না পেলে অস্থির হবে। তোমার হাত থেকে গোপনে ফুল নেব বলে কত আশা ছিল। পথের কষ্টে আমার একটুও জল আসেনি চোখে, কিন্তু আমি তোমার হাত থেকে উৎসবের ফুল পেলাম না বলে পথ চলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছি।

সুজয় গ্লাসের জলে রাখা ম্যাগনোলিয়া ফুলটা তুলে এনে অন্ধকারে তোসির হাতে দিয়ে বলল, তোমার জন্যে তুলে রেখেছি তোসি, দেখ এখনও কেমন তরতাজা রয়েছে। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত আমার তোমার ভাবনাতে কেটেছে। দূরদেশে মা ভাইবোন বুড়ো বাবা পথ চেয়ে আছে, হয়তো বা তারা এখন আমার ফেরার আশা একটু একটু করে ছেড়ে দিতে শুরু করেছেন। তাদের কাছে যাবার জন্যে মন আমার অস্থির, তবু কেন আজকাল মনে হয়, দিনান্তে একবার তোমাকে দেখতে না পেলে মন আমার একেবারে শূন্য হয়ে যাবে।

তোসি বলল, আমার বদরীনাথজি বড় দয়ালু, তোমার হাত দিয়ে ভালোবাসার ফুলটি ঠিক পাঠিয়ে দিলেন। এখনও কী মিষ্টি গন্ধ জড়িয়ে আছে ফুলটির গায়ে।

সত্যি তুমি কত ভালোবাসো আমাকে সুজয়। আমার সব কষ্ট কোথায় চলে গেছে। এই মুহূর্তে আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

সুজয় ফুলসমেত তোসির দুটো হাত ধরে এই প্রথম চুমু খেল। কতদিন দুজনে আখরোট গাছের তলায় পাশাপাশি বসেছে। কত কথা বলে গেছে। সুজয় তার সংসারের কত ছবি এঁকেছে তোসির কাছে। কিন্তু কোনওদিন এমন করে স্পর্শ করেনি তোসিকে। তাই তোসিও সুজয়কে ভালোবেসেছে গভীর একটা শ্রদ্ধা মিশিয়ে।

সারারাত নিবিড় হয়ে ওরা দুজনে কাটাল। শেষ রাতে জানালার ফাঁকে কিন্নর কৈলাসের মাথায় চাঁদটাকে স্পর্শ করতে দেখে সুজয়ের কপালে আলতো করে একটি চুমু এঁকে উঠে গেল তোসি।

সূর্যের উদয় হয়। ধৌলাধার আর কিন্নর কৈলাসের চূড়ায় রঙের ছোঁয়া লাগে। সন্ধ্যার ছায়ায় সে রং আবার মুছে যায়। তাল তাল মেঘ কখনও ভেসে আসে দূরদিগন্ত থেকে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে মুক্তোর দানা ছড়িয়ে পড়ে। স্নোরেঞ্জে সে বৃষ্টির ফোঁটা ধবধবে

সাদা বিন্দুতে জমে যায়। বৈশাখে খুবানির ডাল ভরে পিঙ্ক ফুল ফুটে ওঠে। ছোট ছোট লাল রঙের কিমপেয়াচ পাখিগুলো হুটোপুটি করে। খুবানির গোলাপি ফুল ঝরতে থাকে পাহাড়ি প্রান্তরে। দুপুরে কুপ্‌পু পাখিটা কুপ্‌পু কুপ্‌পু করে বুক ফাটিয়ে ডাকে। মন উদাস হয়ে যায় সে ডাকে সুজয়ের, ঘরে ফেরার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে সে।

পথ মেরামতের কাজ শেষ হয়ে আসে। প্রতিদিন শোনা যায়, তাপ্‌রি থেকে সাংলার পথ দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওদিকে রামপুর বুশেয়ারার পথও তাপ্‌রি ছুঁই ছুঁই করছে। তোসি এসে বলে, আর তোমাকে ধরে রাখা যাবে না সুজয়।

সুজয় বলে, এই আখরোট গাছের তলায় বসে কিন্নর কৈলাসের দিকে দুজনের চেয়ে থাকার কথা কী করে ভুলি তোসি? চাঁদের ঢেউ দেওয়া রাতগুলোতে বাস্পা নদীর উপল মাড়িয়ে হাতে হাত ভরে নিয়ে চলার কথা কী করে ভোলা যায়? ঘরে ফিরে যে আমার অন্য জগৎ, অন্য মুখ, ভিন্ন কাজ। সেখানে যে আমার তোসি নেই।

তোসি বলে, তবু যেতে হয়। সেখানে তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে যে মানুষগুলো বসে আছে, তারা যখন তোমাকে দেখে আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়ে চেঁচাতে থাকবে, তখন সে ছবির তুলনা কই।

সুজয় বলে, তোসি, তুমি কি দূরদেশে কারও সঙ্গী হতে পার না?

তোসি কিছু সময় চুপ করে থেকে বলে, আমার ওপর নির্ভর করে বসে রয়েছে আমার মা আর ছোট দুটি বোন। তাদের অসহায় দুর্গতির মধ্যে ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো কোথায় পালাব সুজয়? মন কাঁদলেও কামরু পাহাড়ের একখণ্ড পাথরের ভার বুকে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে আমাকে এই সাংলা ভ্যালিতে।

কামরু আর সাংলা দেশাংয়ের কুমারী মেয়েরা 'তোসিমিগ কন্যা' উৎসবে মেতেছে। ওদের দলের নেত্রী হয়েছে তোসি। 'তোসিমিগ কন্যা' উৎসবের আয়োজন হয়েছে পি. ডব্লিউ. ডি. ওভারসিয়ার সাহেবের বাংলোতে। জায়গাটা একেবারে পাহাড়ি একটা স্পারের শেষ প্রান্তে। কয়েকটা কনহোর গাছ হালকা ভায়োলেট রঙের ঊর্ধ্ব-শিখা ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে মৃনাল পাখি খেলা করে। একেবারে যেন ছোট আকারের ময়ূর। রঙের কী বাহার।

ওভারসিয়ার গেছেন বউ বাচ্চা নিয়ে ছুটি কাটাতে দেশের বাড়ি মাণ্ডীতে। চৌকিদার খুলে দিয়েছে কোয়ার্টার। সেখানে উৎসব চলছে। সাতদিন ওরা কেউ ঘরে ফিরবে না। খাওয়া-দাওয়া, নাচগান চলবে ওখানে। মেয়েরা রান্না করে ডেকে আনবে তাদের প্রেমিক পুরুষদের। তারা এসে ভোজে যোগ দেবে। নাচ-গান করবে মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা কিন্নর কণ্ঠের সুর তুলবে বাতাসে। ছেলেরা নাচের তালে তালে বাজাবে ঢোল, বাগজল, বাঁশরিং, ডাল্‌কি বান আর সোন্নাল। জ্যোৎস্নারাত গভীর হবে, ওরা এমনি নাচগান আর হুল্লোড় করবে! সে এক অলৌকিক জগৎ বলে মনে হবে। তাদের গানের সুর পাহাড়ে-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে। বুড়ো-বুড়িদের কানে সে সুর গেলে তারা আর ঘুমুতে পারবে না। তারা

হেঁটে হেঁটে পার হয়ে যাবে অনেকগুলো বছর। তরুণ-তরুণীর শরীর আর মন পেয়ে যাবে তারা! তাদের অনুচ্চারিত গলায় বাজতে থাকবে সংগীত শুরুর প্রাথমিক আলাপ :

গুলি গোহনা
হায়া বিহনা
দশংস বিনা
গুলদার গোরিংডেন।

দিন আর রাতের সীমা উঠে গেছে। আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দ। রান্নার আনন্দ, নাচে আনন্দ, কথায় আনন্দ।

একটি ছেলে গেয়ে উঠল,

'এলি কুন্তা বরেইয়ো অংদুরি মাভোনা?'

(কুন্তা, তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবে কিনা বল?)

অমনি ছেলেটির প্রেমিকা জবাব দিয়ে গাইল,

'গতা কান্দোরি মাভোইয়ো কাতা রখতন।'

(তুমি কালো : আমি ফরসা ছেলেকেই ভালোবাসি।)

ছেলেটি অমনি ভারী গলায় ধাক্কা দিতে দিতে গাইল,

'এলি কুন্তা বরেইয়ো
কানু পুয়মিব কেতকিয়ো'

(আমি সবার চোখের সামনে দিয়ে তোমাকে তুলে নিয়ে চলে যাব। রমণী বীরভোগ্যা।)

মেয়েটি অমনি গেয়ে উঠল,

'কানপোমিভ কানবালে পাথেয়।'

(কেমন করে নিয়ে যাও তো দেখি, আমি তোমার নজরের বাইরে চলে যাব।)

দৌড়োদৌড়ি খেলা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটিকে ধরার জন্যে ছেলেটি ছুটেছে। খল খল খুশি ছড়াতে ছড়াতে মেয়েটি ঘুরছে কনহোর গাছগুলোতে পাক দিয়ে। শেষে এক দৌড়ে এসে দাঁড়াল মণ্ডলীর মাঝখানে। মেয়েরা রইল তাকে ঘিরে। ছেলেটা চারদিকে ফাঁক খুঁজছে আর মেয়েটা এক একবার সবার আড়ালে লুকোচ্ছে, আবার উঠে দাঁড়িয়ে কিল মারার অভিনয় করছে।

এ খেলা হুল্লোড়ে শেষ হল। অমনি তোসির উচ্চগ্রামী গলা বেজে উঠল,

'কনিচ ইহাই কনিচ
আং কিসমৎ খোটা,
ডোংখং দেন গরিচ্ছং'

(সাথী, আমার সাথী, কী খারাপ ভাগ্য আমার। পাহাড়ের ওপারে আমার শাদি হয়েছে।)

করুণ কান্নাব মতো সুরটা বাজতে লাগল। যারা এতক্ষণ হুল্লোড় করছিল তারা গালে হাত রেখে করুণ মুখ করে শুনতে লাগল তোসির গান।

শেষ দিনটি বিষাদের। উৎসবের শেষ, গান ভাঙার পালা। প্রতিটি মেয়ে তাদের

ভালোবাসার জনকে পৌঁছে দিয়ে আসছে তাদের ঘরে। বিদায় নিচ্ছে ব্যথাভরা চোখ তুলে। চার চোখে পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি। এই হল এ উৎসবের রীতি।

তোসি শেষ রাতে সুজয়কে নিয়ে এসে দাঁড়াল তহশিল অফিসের পেছনের ডেরায়। আখরোট গাছের আড়ালে চাঁদটা আটকে আছে, বুকের ভেতর ভালোবাসার যন্ত্রণার মতো।

ওরা বিশেষ কোনও কথা বলতে পারছিল না। বিচ্ছেদের সময় এগিয়ে এসেছে। ওরা জানে কাল থেকে সারাই পথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। হিমাচলের পরিবহনমন্ত্রী আসছেন সিমলা থেকে সাংলায়। কাল পি. ডব্লিউ. ডি. ডাকবাংলোয় অবস্থান। পরশু চিটকুল ঘুরে আবার সাংলা ছুঁয়ে কল্পায় যাত্রা। তারপর পু সামদো হয়ে ফিরবেন চারদিনের হ্যারিকেন ট্যুর শেষ করে।

পি. ডব্লিউ. ডি. ডাকবাংলো ছেয়ে আছে সরকারী কর্মচারি আর পুলিশে। সিকিউরিটি বিভাগের লোকেরা ঘোরাফেরা করছে। সারাদিন কামরু আর সাংলা অঞ্চলে চাঞ্চল্য।

কাল ওভারসিয়ারের বাংলোটা ছেড়ে দিতে হবে! অনেক অফিসারের আমদানি হয়েছে, তাদের থাকার জায়গা চাই।

'তোসিমিগ কন্যা' উৎসব ঠিক সময়েই শেষ হয়েছে, নইলে অনুষ্ঠানের স্থান নিয়ে বিপর্যয় ঘটত।

তোসি বলল, তোমার চলে যাবার কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে বাধছে সুজয়। তবু তোমাকে আটকে রেখে তোমার ঘরের মানুষদের দুঃখ বাড়াতে চাই না। তাঁদের দীর্ঘশ্বাস অনেক দূর থেকেও কানে এসে বাজছে।

সুজয় তোসির দুটো হাত চেপে ধরে বলল, আমি আবার আসব তোসি। যেখানে থাকি আমার তোসিকে আমি কোনওদিন ভুলব না।

তোসি আর কোনও কথা বলল না, হয়তো কথা বলতে পারল না। সে তহশিল অফিস পেছনে রেখে উদ্‌গত অশ্রু চাপতে চাপতে কামরুর পথে পা বাড়াল।

আখরোট গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে তোসির চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল সুজয়।

তোসির হাতে বোকা বনে যাবার দিন থেকে লালা অনন্তরাম চুপচাপ বসে থাকত তার দোকানে। ওই পথে তোসি যখন ইস্কুলে যেত তখন ঘাড় হেঁট করে বসে থাকত সে। তোসি আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত। তার খুব মজা লাগত।

সেদিনের লালার কীর্তিকলাপ একমাত্র সুজয় ছাড়া সে কাউকেই জানায়নি। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষগুলোর মহাজন লালা। সোনা রুপো বন্ধক রেখে টাকা দেয়। তাছাড়া চড়া দামে লালার কাছ থেকে রোজকার ব্যবহারের জিনিসপত্র ধারে কেনে প্রায় সকলে। লালা বলত, সবার টিকি আমার হাতে বাঁধা। টান দিলেই হুমড়ি খেয়ে পায়ে এসে পড়বে।

বেলা দশটায় ইস্কুলের পথে চলেছিল তোসি। ক'দিন ছুটির পর এই তার প্রথম ইস্কুলে যাওয়া। মনটা বিষণ্ণ। আসন্ন একটা বিদায়ের যন্ত্রণা বুকটাকে মোচড় দিয়ে যেন ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে। সে ক্লান্ত পায়ে চলছিল। লালার দোকানের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

তার মনে পড়ে গেল, লালার সাহায্য ছাড়া সুজয়ের পক্ষে সিমলা যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ জিপ ছাড়া রামপুর বুশেয়ারা অবধি যাওয়ার অন্য কোনও যানবাহন নেই। আর লালার দু'তিনখানা জিপ সাংলা থেকে রামপুর অবধি যাওয়া আসা করে মালপত্র নিয়ে। পথের যাত্রীরা ওতেই চড়ে বসে।

তোসি অনেকদিন পরে ঢুকে পড়ল অনন্তরামের দোকানে।

অনন্তরাম তখনও বোধ করি সুদ কষছিল। খদ্দের ছিল না দোকানে।

তোসি ঢুকেই বলল, লালাজি, একটু দরকারে এলাম আপনার কাছে।

লালা অনন্তরাম চোখ তুলে চেয়ে রইল তোসির দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকা।

তোসি বলল, দু'এক দিনের ভেতর আপনার জিপটা কি রামপুর বুশেয়ারার দিকে যাবে?

কেন, কী দরকার?

তোসি বলল, আমার এক বন্ধু যাবেন। তাঁর সিমলা ফেরার তাড়া আছে।

লালা বলল, সেই বাঙালি আদমি, যে আজ চার-পাঁচ মাহিনা কিনোরে ডুব দিয়ে আছে?

রাগ হলেও রাগের কথা বলল না তোসি। কার্যোদ্ধার করা চাই। শুধু বলল, ভদ্রলোককে জানেন দেখছি।

লালা বলল, আমার জানা-না-জানায় কিছু যায় আসে না। যাঁদের জানার দরকার তাঁরা জেনে বসে আছেন। আমার কাছে জিপের খোঁজ নেবার দরকার কী, তোমার বন্ধুটির জন্যে সরকারি রথ আসছে শিগ্‌গির, তাতে চেপে সরকারি অতিথিশালায় যাবেন, আর অন্তত বছরখানেক সরকারি ভোগ খেয়ে ঘুমোবেন।

তোসির সমস্ত শরীরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে মুহূর্তে বুঝতে পারল লালাই পুলিশকে খবরটা দিয়েছে। এখন উপায়? কী করে সে রক্ষা করবে তার সুজয়কে? কেমন করেই বা সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কিন্নরের এলাকা পার করে দেবে তার এই প্রাণের মানুষটিকে।

অসহায়ের মতো তোসি চেয়ে রইল লালার মুখের দিকে। সুজয়ের কথা ভেবে বুক ঠেলে কান্না উঠে এল।

লালা হাসছে। ক্রূর একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে লালার সারা মুখে।

তোসিকে কে যেন এগিয়ে দিলে। সে লালার গদির নীচে নতজানু হয়ে বসল। লালার হাতখানা দুহাতে তুলে নিয়ে চেপে ধরে বলল, একটা অনুরোধ আমার রাখতে হবে লালাজি। দুটো দিন অন্তত পুলিশকে আপনি ঠেকিয়ে রাখুন। এর জন্য যে কোনও দাম দিতে আমি প্রস্তুত।

লালা আর একখানা হাত তোসির হাতের ওপর চেপে দিয়ে বলল, কথা ঠিক থাকবে তো, না সেবারের মতো ফিকির এঁটে পালাবে? তোমাকে বিশ্বাস নেই।

তোসির গলা কান্নায় বুজে এল। অনেক কষ্টে কান্নাভেজা গলায় বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কথা দিলে সে কথা প্রাণ গেলেও রাখব।

লালা বলল, বেশ, পুলিশ অফিসারকে আমি এ দুদিন ঠেকিয়ে রাখছি, কিন্তু তৃতীয় দিনে যদি তোমাকে না পাই, মানে তুমি যদি ফাঁকি দিয়ে পালাও, তাহলে তোমার ওই বন্ধুর দফাটি একেবারে নিকেশ হয়ে যাবে। আর দেখ, জিপ দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারব না, কারণ ওর লুকিয়ে থাকার খবরটা চারদিকে জানাজানি হয়ে গেছে। বর্ডার লাইনের খবর সংগ্রহের ও একটা এজেন্ট। কী করে যে ওই চালিয়াতটার চালে পড়লে তুমি, তাই ভাবছি। যাক, এ দুদিনে ওকে যেখানে পার লুকিয়ে রাখ, আমি কিছু বলব না, কিন্তু তৃতীয় দিনটিতে আমি তোমাকে চাই! স্পষ্ট করে কথাটা বললাম বলে কিছু মনে কোরো না যেন। সোজাসুজি কথা বলতেই আমি ভালোবাসি।

তোসি উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে বলল, পরশু রাত শেষে বাম্পা নদীর ওই ছামের ধারে আপনি আমার দেখা পাবেন।

কথা পাক্কা? বলল লালা।

চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল তোসি, আমি কখনও কথা দিলে কথার খেলাপ করি না।

তোসি স্কুলে বসে সুজয়কে চিঠি লিখল :

বন্ধু,

তুমি দেশে পৌঁছে দেখবে আমার চিঠিখানা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তুমি অবাক হয়ে যাবে। হয়তো আর কোনওদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না, তবে জেনো ফুলের মৃত্যু নেই। সে ভালোবাসায় বন্দি। ইয়ালু ফুল ঝরে যায় শুধু নতুন করে ফুটে ওঠার জন্যেই।

তোমার জন্মান্তরের বন্ধু।

চিঠি লেখা শেষ করে ড্রয়ার থেকে খাম বের করে যত্ন করে ভরল চিঠিখানা। সুজয়ের নাম আর দেশের ঠিকানা লিখল খামের ওপর। তারপর উঠে গিয়ে স্কুলের বাইরে লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে এল।

আবছা আলো-অন্ধকারে দুটি ছায়ামূর্তি সিডার বনের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে উঠছে পাহাড়ের ওপর। আজ পূর্ণিমা। আলো ছড়িয়ে পড়ছে সাংলা আর কামরুর ঘুমন্ত গ্রামে। কেউ জেগে নেই। মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। এত রাত্রে জ্যোৎস্নার জলে স্নান করছে কিন্নর কৈলাস আর ধৌলাধার।

ওরা নিঃশব্দে উঠে এল সেইখানে, উখাং উৎসবের দিন তোসি সুজয়কে যেখানে এনেছিল। সেই খাড়া পাথরখানা দাঁড়িয়ে আছে।

তোসি দাঁড়াল। সুজয় দাঁড়াল। তোসি বলল, থারচেন তোমাকে রুপিন গিরিপথ পার করে নিয়ে যাবে পাবার ভ্যালিতে। সেখান থেকে পুবমুখে হেঁটে যেও। একসময় চেনাপথে

গিয়ে পৌঁছবে। অবশ্য এ পথে বড় কষ্ট পেতে হবে তোমাকে, সেই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ রইল। আমিই তোমার সব কষ্টের কারণ হয়ে রইলাম সুজয়।

সুজয় তোসিকে বুকের মাঝে টেনে আনল। তার মুখখানা চাঁদের আলোয় কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। একসময় বলল, তুমি সারাপথ আমার ভাবনার সঙ্গী হয়ে থাকবে তোসি। আমার সব কষ্ট আনন্দের ফুল হয়ে ফুটবে।

থারচেন তৈরি হয়েই ছিল। অনেক পথ যেতে হবে। ভেড়াগুলো পাহাড়ি প্রপাতের মতো চলতে লাগল। থারচেন মুখে সিসরং-এর আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে, পাশে সুজয়।

নীচে থেকে চেয়ে চেয়ে তাদের দেখছে তোসি। একবার পাহাড় আর বনের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে উঠছে।

কতক্ষণ পরে দুটো কালো পুতুলের মতো নড়তে নড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

চোখ মুছল তোসি। এখন ফিরে যেতে হবে তাকে। কথা দিয়েছে সে অনন্তরামকে। কথা সে রাখবেই। দ্রুত নামতে লাগল তোসি। এ কী, পা দুটো যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। পায়ের তলার পাথর ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচে। সে সিডার গাছের কাণ্ডটা ধরে হাঁপাতে লাগল। অনেক পথ নেমে এসেছে সে। ওই তো বাস্পা নদীর ওপর ছামটা দেখা যাচ্ছে। ওখানে তাকে পৌঁছতে হবে। অনন্তরামকে কথা দিয়েছে ওইখানে তার সঙ্গে দেখা হবে। কথা সে রাখবেই।

একটা হরিণীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে সে নামতে লাগল ছামের দিকে। কী হল, হঠাৎ, পা দুটো টলে উঠল তোসির। এতদিন যে পা দুটো অনেক বিপদ থেকে তাকে পার করে এনেছে তারা হঠাৎ তার দেহের ভার বইতে অক্ষম হয়ে গেল। তোসি ঝাপসা চোখ মেলে দেখল কিন্নর- কৈলাসের মাথায় চাঁদ ডুবছে।

আদিম নারীর মতো একখণ্ড পাথরের ওপর পড়ে আছে তোসি। প্রাণহীন দেহটাকে স্পর্শ করছে ধৌলাধারের তুষারছোঁয়া বাতাস। বাস্পা নদীর জলকণা বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার গায়ে। আদিম অরণ্য আর পাহাড়ের স্তূপগুলো স্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ভোর হবে। ছুটে আসবে অনন্তরামের জিপ তোসিকে তুলে নিতে। এসে দেখবে রক্তাক্ত প্রাণহীন শিকারের মতো পড়ে আছে তার কামনার নারী। তোসি তার কথা রেখেছে, সে পালিয়ে যায়নি তার কানেচের সঙ্গে। সে ফিরে এসেছে সাংলায়।

●

কিন্নর মিথুন

সেকাল

আন্দোলিত পুষ্পিত প্রেঙ্ক্ষা থেমে গেল। উঠে দাঁড়াল লপিতা। তার স্থির দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়িয়েছে কান্তিমান এক ঋষিতনয়। চূড়াবদ্ধ কেশপাশ। হাতে কমণ্ডলু। পরিধানে পীতবস্ত্র, স্কন্ধ থেকে প্রলম্বিত শ্বেত উত্তরীয়।

আলোড়িত হল অনূঢ়া ঋষিকন্যা লপিতার হৃদয়।

আশ্রমপ্রান্তে পুষ্পিত নিকুঞ্জ কাননে লপিতার একান্ত ভুবন। প্রথম ফাল্গুনে পিকরবে কুহরিত বজস্থলী। পত্রপুষ্পে সজ্জিত কুঞ্জভূমি যেন পুষ্পধনুর প্রতীক্ষায় কালগণনা করছিল।

মদন-মহোৎসবের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ঋষিকুমার মন্দপাল সুসজ্জিত সেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। এই অভাবিত আবির্ভাবে রোমাঞ্চিত হল লপিতার প্রিয়মিলন সমুৎসুক হৃদয়।

ধীর চরণক্ষেপে লপিতা এগিয়ে গেল ঋষিকুমারের দিকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল মন্দপাল। লপিতার দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা, মন্দপালের দৃষ্টিতে বিস্ময়!

লপিতার কণ্ঠে প্রশ্ন, আপনি কি পথ হারিয়েছেন ঋষিকুমার?

মন্দপাল নারীর এমন রূপ আগে কখনও দেখেনি। লপিতার প্রশ্নে ঋষিকুমার সম্বিৎ ফিরে পেল।

যাত্রার শুরুতে আমি জেনেছিলাম পশ্চিমের পথ ধরে গেলেই আমি খাণ্ডব-কাননে পৌঁছতে পারব, তাই পশ্চিমাস্য হয়ে হেঁটে চলেছি। আপনি কি ওই কাননভূমির সন্ধান দিতে পারেন?

আপনি সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন, সম্মুখে একটি স্রোতস্বিনীর দেখা পাবেন। সেটি অতিক্রম করতে নৌকার আবশ্যক হবে না। নদীর ওপারে অনুচ্চ বৃক্ষ সমাকীর্ণ একটি পর্বত। সেই পর্বতের ওপারে খাণ্ডবকানন। পর্বতের দক্ষিণপ্রান্ত বেষ্টন করে আপনাকে সেই কাননে পৌঁছতে হবে।

আকাশে সূর্যের অবস্থানের দিকে একবার তাকাল লপিতা। বলল, মধ্যাহ্ন তো অতিক্রান্ত হতে চলল। আপনি দ্রুত পদক্ষেপে গেলেও খাণ্ডববনে পৌঁছতে আপনার আগামীকাল মধ্যাহ্নের আগে সম্ভব হবে না। এখন কৃষ্ণপক্ষ। রাতের তমিস্রায় পথ চলা সম্ভব নয়।

কথাগুলি শুনে মন্দপালের ললাটে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

মন্দপালকে চিন্তান্বিত দেখে লপিতা বলল, আপনার যদি কোনও দ্বিধা না থাকে তাহলে আপনি আমার এই নিকুঞ্জ-ভবনের অতিথি-নিবাসে অবস্থান করতে পারেন। আমি প্রভাত থেকে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত এই সুরম্য কাননে অবস্থান করি। সায়াহ্নের পরে দূরে

তপোবন-দীপ জ্বলে ওঠে। ঋষিকণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়। তপোবনের হোম শুরু হয় এই সময়। আমি সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দিই, এবং ওই তপোবনেই নিশাযাপন করি। প্রভাতে হোম শেষে সামান্য কিছু গৃহকর্ম থাকে, সেই কর্ম সমাপ্ত করে আমি চলে আসি আমার এই নিকুঞ্জ-ভবনে। এখানেই আমি পদ্ম সরোবরে স্নান সেরে বিশ্রামনিকেতনে আহার প্রস্তুত করি।

প্রতিদিন পুষ্পচয়ন আমার কাজ।

কোনও এক অবসরে সেই পুষ্প আমি দিয়ে আসি তপোবন আশ্রম কুটিরে। ফিরে এসে মালতী বিতানের এই পুষ্পিত প্রেঙ্ক্ষায় আমি দোল খাই। আহারের পর এই প্রেঙ্ক্ষাতেই দোল খেতে খেতে আমি বিশ্রাম সুখ উপভোগ করি। এখন আমার রন্ধনকার্য সম্পূর্ণ, আমি কি অতিথি সেবার সুযোগ পেতে পারি?

মন্দপাল বলল, খাণ্ডবকাননের দূরত্ব সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, সামনে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, পথ চলা অসম্ভব। করুণাময়ের ইচ্ছায় আপনার সমীপে এসে পড়েছি, আপনার আতিথ্যগ্রহণ করলে আমি বিশেষ উপকৃত এবং ধন্য হব।

লপিতা ঋষিকুমার মন্দপালকে এনে তুলল তার নিকুঞ্জ কুটিরে। বলল, সামনেই সরোবর, আপনি স্নান সমাপন করে আসুন, আমি আপনার মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করি।

মন্দপালের ললাট থেকে চিন্তার রেখা অপসৃত হল। পরম নিশ্চিন্তে ঋষিকুমার চলল অদূরে পদ্ম সরোবরে স্নান সমাপন করতে।

শীতল জলের স্পর্শে মধ্যাহ্ন তাপে তপ্তদেহ শীতল হল। সরোবর তীর আমোদিত হচ্ছিল পদ্মগন্ধী বাতাসের প্রবাহে।

মন্দপালের মনে হল, এই কি নন্দন কানন? এই সরোবরে কি দেবকন্যারা সন্ধ্যালগ্নে নিত্য স্নান করে যান? জ্যোৎস্নার কিরণে কি তাঁদের চঞ্চল অঞ্চল উড়তে থাকে?

এ সকল কথা চিন্তা করতে করতে ঋষিকুমার সরোবর সোপানে উঠে বস্ত্র পরিবর্তন করল।

অদূরে লপিতার কাননকুটির, সেখানে অতিথির আহারের আয়োজন সম্পূর্ণ করে প্রতীক্ষা করছিল সে।

স্নান শুদ্ধ ঋষিকুমারকে অঙ্গনে এসে দাঁড়াতে দেখে লপিতা তার মুগ্ধ দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না।

পরক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ঋষিকুমারকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাল।

অভাবিত আতিথ্য গ্রহণ করে মন্দপাল আশ্বস্ত হয়েছিল, আহারান্তে তার মনে হল, স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাকে অন্নদান করে পরম অনুগৃহীত করেছেন।

আহারপর্বে সারাক্ষণ মন্দপালের অদূরে বসেছিল লপিতা। সে অতিথিকে বারবার প্রশ্ন করছিল ভোজ্যবস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে।

মন্দপাল বারবার উচ্চারণ করছিল, অতি উৎকৃষ্ট, স্বাদু-স্বাদু!

কখনও প্রশ্ন থেকে প্রশ্নান্তরে যাচ্ছিল লপিতা, আপনার জননী কত স্নেহে প্রতিদিন আপনাকে অন্নদান করেন, কিন্তু সেই স্নেহ সমাদর অন্য কোথাও কারও পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব!

আহারের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল মন্দপাল। পরে সজল দুটি চোখের দৃষ্টি ফেলল লপিতার দিকে।

অতি শৈশবে মাতৃস্নেহ সুধা থেকে আমি বঞ্চিত। পিতার সঙ্গেই ছিল আমার আহার-বিহার। তিনিই ছিলেন প্রায় আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। পিতাই আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন অধ্যয়নের স্পৃহা। তাঁরই চরণতলে বসে আমি আমার শিক্ষাকর্ম সমাপ্ত করেছি। বিভিন্ন শাস্ত্র এবং চতুর্বেদ এখন আমার আয়ত্তে। তাঁরই কৃপায়।

চোখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে লপিতা বলল, এখন আপনার পূজনীয় পিতৃদেব কি তপোবন আশ্রমেই রয়েছেন?

ম্লান ছায়া ঘনাল মন্দপালের মুখের ওপর। সে বলল, পিতৃদেব দুইমাস পূর্বে অমৃতলোকে প্রস্থান করেছেন।

লপিতা বলল, তিনি সাধনলোকে আপনার জননীর সঙ্গে এতকাল পরে মিলিত হবেন। আমার সান্ত্বনা সেখানেই।

আহারান্তে অতিথিকে বিশ্রাম-কক্ষের কাছে নিয়ে গিয়ে লপিতা বলল, আপনি কুটিরের অভ্যন্তরে বিশ্রাম করতে পারেন, অথবা সম্মুখে তরুশাখায় প্রলম্বিত প্রেঙ্ক্ষায় উপবেশন করে দ্বি-প্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন।

মন্দপাল দেখল প্রেঙ্ক্ষাটি কাষ্ঠনির্মিত এবং প্রশস্ত। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ এর ওপর অনায়াসে শয়ন করতে পারে। অতি সুশোভিত এই প্রেঙ্ক্ষা আশ্রম পুষ্পে গ্রথিত মালিকায় সুসজ্জিত।

মন্দপাল বলল, আপনার এই মনোরম প্রেঙ্ক্ষাটি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে।

লপিতা বলল, আপনি অবশ্যই দোলনায় উপবেশন করে বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি বিধান আছে।

কৌতূহলী মন্দপাল প্রশ্ন করল, কী সে বিধান জানতে পারি কি?

লপিতা বলল, একসময় এক কিন্নর মিথুন আমার এই নিকুঞ্জভবনে এসেছিলেন। তাঁরা দুজনে এই মনোরম প্রেঙ্ক্ষাটি রচনা করে দিয়ে গেছেন। বিদায় নেওয়ার সময় তাঁরা এই কথাটি উচ্চারণ করে গেছেন, যে এই প্রেঙ্ক্ষায় উপবেশন করবে তার অন্তরে গভীর প্রেম সঞ্চাবিত হবে। সে যেখানেই থাকুক এই প্রেঙ্ক্ষার কথা কোনওদিনও ভুলতে পারবে না।

মন্দপাল সামান্য সময় চিন্তা করে বলল, আমি আপনার অতিথি, আমার বিশ্রামের স্থান আপনিই নির্বাচন করে দেবেন।

লপিতা বলল, আহারান্তে আমি ফিরে আসছি, সেই সময়টুকু আপনি আমার বিশ্রামকক্ষে উপবেশন করুন। আপনি চিন্তা করুন, ওই প্রেঙ্ক্ষায় আপনি আদপে উপবেশন করবেন কিনা।

অতিথিকে ভাবনার অবকাশ দিয়ে স্থানত্যাগ করল লপিতা।

তরুছায়ায় সেই দোলনার ধারে দাঁড়িয়ে মন্দপাল চিন্তা করতে লাগল, সে অবিবাহিত এক ঋষিকুমার। খাণ্ডবকাননে চলেছে পিতার একটি আদেশ পালন করতে। তাকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে হবে, মৃত্যুর সময় এই ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন তাঁর মহাতপস্বী পিতা।

মৃত্যুর আগে পিতার কাছ থেকে সে শুনেছে, খাণ্ডববনে এক বিপত্নীক ঋষির নিবাস। তিনি নিষ্ঠাবান এবং শুদ্ধাচারী। বদরিকা আশ্রমে এক সন্ন্যাসী-সম্মেলনের পিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। জারিতা নামে বিবাহযোগ্যা এক কন্যা আছে তাঁর। ইচ্ছা ছিল তাঁর কন্যাটিকে বন্ধুপুত্রের হাতে সমর্পণ করা।

এই ইচ্ছাটুকু মাত্র প্রকাশ করেছিলেন তিনি কিন্তু ইচ্ছাপূরণের পূর্বেই তিনি লোকান্তরিত হন।

বন্ধুকে বাক্যদান করেছিলেন মন্দপালের পিতৃদেব। তাই মৃত্যুর সময় পুত্রকে তিনি সত্যরক্ষা করতে বলেন।

পিতার মৃত্যুর পর তাই চলেছে মন্দপাল খাণ্ডবকাননে জারিতার পাণিগ্রহণ করতে।

এই অবস্থায় সম্মুখের মায়া প্রেঙ্ক্ষায় সে উপবেশন করবে কিনা ভাবতে লাগল।

এই প্রেঙ্ক্ষায় বসলে অন্তরে প্রেমসঞ্জাত হবে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পরিণয়ের উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করছে, এ সময় অন্তর প্রেমে পূর্ণ হলে ক্ষতি কী।

সে প্রেঙ্ক্ষার একপ্রান্তে সসঙ্কোচে উপবেশন করল। মৃত্তিকায় পদতাড়না করে সে সঞ্চালিত করল দোলনাটি। অমনই প্রবাহিত হতে লাগল বনকুসুমগন্ধে সুবাসিত সমীরণ। শোনা গেল দূর কিংশুক শাখায় আত্মগোপনকারী কোনও কোকিলের কুহুধ্বনি।

আশ্চর্য এক সম্মোহনী শক্তি আছে এই প্রেঙ্ক্ষায়। মন্দপালের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হতে লাগল। কখনও তার মনে হল, বর্ষা ঋতুতে সজ্জিত মেঘমালার বুকে ক্রৌঞ্চ মিথুন উড়ে চলেছে, কখনও বা দেখা গেল দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত কদম্ববীথি। সবুজপত্রের বুকে ফুটে আছে শুভ্র রোমাঞ্চিত কদম্ব।

ওইতো চোখের সম্মুখে জেগে উঠেছে লপিতার সেই পদ্ম সরোবর। পদ্মপত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে ডাহুক ডাকছে ডাহুকিকে। সরোবরের অন্যপ্রান্ত থেকে বিরহিণী প্রেমিকা প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।

কখনও পুঞ্জিত মেঘের বর্ষাসিক্ত বেদনা, কখনও বা পুষ্পিত বসন্তের অভিরাম আনন্দলীলা।

প্রতিবার প্রেঙ্ক্ষা সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহমন আনন্দবেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠছে।

সহসা মন্দপাল তার সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে দেখতে পেল প্রসারিত এক রণবীথি। বৃক্ষশাখাগুলি পুষ্পভারে অবনত। মধুকর গুঞ্জনে রোমাঞ্চিত কুসুমস্তবক। পীতবর্ণের পুষ্পরেণুতে পথধূলি রঞ্জিত।

মন্দপালের মুগ্ধদৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল একটি অবয়ব। অমর্তলোকের অনিন্দ্যকান্তি কোনও কন্যা যেন ছন্দিত চরণক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

সহসা দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রেঙ্ক্ষার রজ্জুতে বাহুস্পর্শ করে মৃদু মৃদু হাসছে লপিতা।

মন্দপাল উঠে দাঁড়াল। তখনও তার দৃষ্টি থেকে বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

উঠে দাঁড়ালেন কেন কুমার? আপনি উপবেশন করুন। আমি প্রেঙ্ক্ষা সঞ্চালন করছি।

মন্দপালের অন্তর থেকে কে যেন উচ্চারণ করল, আমরা দুজনেই কি একই প্রেঙ্ক্ষায় উপবেশন করতে পারি না?

লপিতার মধুর হাসিতে পূর্ণ হল দোলন-মঞ্চ।

দুজনেই একই প্রেঙ্ক্ষায় উপবেশন করে পরমানন্দে দোল খেতে লাগল।

একঝাঁক পারাবত পাখার করতালিধ্বনি তুলে উড়ে গেল নিঃসীম শূন্যে।

কিছুক্ষণ পরে প্রেঙ্ক্ষা থামাল লপিতা।

বিশ্রামে আপনি কি তৃপ্ত ঋষিকুমার?

এ যদি বিশ্রাম হয় তাহলে অনন্তকাল এই বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে আমার হৃদয়।

লপিতা প্রসারিত করল তার বাহুলতা, মন্দপাল দক্ষিণ করে স্পর্শ করল চম্পককলির মতো লপিতার সুচারু অঙ্গুলি।

লপিতা মধুর হাসি হেসে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আমরা কি এইক্ষণ থেকে বন্ধু হলাম, না নিবিড় অন্তরঙ্গতায় বাঁধা পড়লাম?

মন্দপালের প্রসারিত হাতের মুঠি আরও দৃঢ় হল। তার হৃদয়ের উত্তাপ সেই মুহূর্তে সঞ্চারিত হল লপিতার দেহমনে। অননুভূতপূর্ব এক আনন্দের শিহরনে লপিতা পদতাড়নায় সঞ্চালিত করল পুষ্পশোভিত প্রেঙ্ক্ষা।

এই দোলায়মান প্রেঙ্ক্ষায় দুজনে সরে এল আরও কাছাকাছি। মন্দপালের দক্ষিণবাহু আর লপিতার বামবাহু পরস্পরের দেহ বেষ্টন করে রইল।

এ কী মুগ্ধবোধ! এ কী মায়ার বন্ধন যা পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে দুটি যুবক যুবতীকে!

মন্দপাল একসময় বলল, এমন আনন্দের অনুভূতি জীবনে কখনও আমাকে আলোড়িত করেনি।

লপিতা বলল, আমি একা যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই প্রেঙ্ক্ষায় বসে দোল খেতাম তখন একপ্রকার সুখানুভূতি হত সত্য কিন্তু আজকের এই অনুভূতির সঙ্গে তার কোনও তুলনাই চলে না। সে সময় একপ্রকার অপ্রাপ্তি আমাকে পীড়ন করত আর আজ সেই অপ্রাপ্তির ভেতরেই আমি একটা ইচ্ছাপূরণের ইশারা দেখতে পাচ্ছি।

মন্দপাল বলল, এই দোদুল্যমান প্রেঙ্ক্ষা আমাদের একসময় অমরাবতীর আনন্দলোকে পৌঁছে দেবে। আমি কখনও দেহমনে এতখানি রোমাঞ্চ অনুভব করিনি। পিতার আশ্রমে সমিধ্ আহরণ, ফল ও তণ্ডুল সংগ্রহ করে আনতে হত। আশ্রম কর্তব্যের সিংহভাগ সম্পন্ন করতে হত আমাকেই। তার ওপর ছিল নিত্যদিনের যজ্ঞকর্ম সম্পাদন ও বেদধ্যয়ন।

পিতা প্রায়শই ঋষি সম্মেলনে যোগদানের জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতেন। আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। সেই কঠোর কর্তব্য পালনের পর অন্য কোনও চিন্তার অবকাশই ছিল না।

আজ আমি পারিবারিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পিতামাতা প্রয়াত। প্রধান ব্রহ্মচারী এখন আশ্রম পরিচালক।

লপিতা বলল, সখা, এই অননুভূত আনন্দ আপনার হৃদয়কে যেমন আলোড়িত করছে আমার হৃদয়ও তেমনি এক আস্বাদে পূর্ণ। আজ মনে হচ্ছে এতকাল যে জন্য আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম সেই প্রতীক্ষার অবসান সন্নিকটে।

মন্দপাল লপিতার হাত ধরে বলল, কীসের প্রতীক্ষায় এতকাল তুমি কাতর ছিলে সখী?

সহাস্য দৃষ্টিতে মন্দপালের মুখের দিকে তাকাল লপিতা।

এই ইঙ্গিতবহ দৃষ্টিতে মন্দপালের কথার উত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এইভাবে সপ্ত দিবস-রজনী অতিবাহিত হল লপিতার নিকুঞ্জবিহারে প্রেমিক যুগলের।

মাঝে মাঝে মন্দপাল চিন্তার গভীরে ডুবে যেত। পিতৃসত্য পালনের ইচ্ছাটা তার ভাবনায় প্রবল হয়ে দেখা দিত।

মন্দপালকে অন্যমনস্ক দেখলেই লপিতা প্রশ্ন করত, ঋষিকুমার এই সখীর সেবায় কি কোনও বিঘ্ন ঘটেছে?

সম্বিত ফিরে পেয়ে মন্দপাল উত্তর দিত, আশাতিরিক্ত আনন্দের আয়োজন এখানে। এই আনন্দের ইন্দ্রলোক তোমারই হাতের রচনা লপিতা।

তবে তোমাকে চিন্তামগ্ন দেখি কেন সখা?

জরিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে মন্দপাল বলল, খাণ্ডবকাননে পিতৃবন্ধুর আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম পিতার আদেশ পালনের জন্য, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আজও রক্ষা করতে পারিনি। এই মায়াবিতানে তোমার বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমি পিতার আদেশ বিস্মৃত হতে বসেছি, তাই মাঝে মাঝে কর্তব্যের অবহেলা আমাকে পীড়িত করছে।

লপিতা বলল, অবশ্যই তুমি তোমার অভীষ্ট স্থানে যাত্রা করবে। তবে এই প্রেক্ষার আকর্ষণে তোমাকে অবশ্যই এখানে ফিরে আসতে হবে। এ আমার ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণ বলে মনে কোরোনা বন্ধু, কিন্নর মিথুনই এই সত্য উচ্চারণ করে গেছে।

মন্দপাল বলল, কিন্নর মিথুন সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু তাদের বাণীর যে এমন অমোঘ আকর্ষণ তা এই প্রেক্ষায় উপবেশন না করলে বুঝতে পারতাম না। যদি কোনও বাধা না থাকে তাহলে ওই কিন্নর মিথুন সম্বন্ধে আমি আরও কিছু জানতে চাই।

তুমি আমার সখা, তোমার কাছে আমার কোনও কিছুই গোপন থাকবে না।

মন্দপাল জানতে চাইল, ওই মিথুন যুগল কি সহসা এখানে উদিত হয়েছিলেন, নাকি তোমার আমন্ত্রণে এসেছিলেন? আমার প্রথম কৌতূহল ওরা কোন অঞ্চলের অধিবাসী?

কিন্নর ওদের বাসভূমি। সে এক গন্ধর্বলোক। কিন্নর-কৈলাস পর্বত ওই অঞ্চলকে দ্বিতীয় কৈলাসের মর্যাদা দিয়েছে।

নদ নদী নগরী সবই আছে কিন্নরে, তবু চতুর্দিকে শৈলঘেরা এই অঞ্চলটি দেখলে মনে হবে পৃথিবীবহির্ভূত কোনও স্থান। এখানে সুউচ্চ কিন্নর-কৈলাসে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের অপার

মহিমা। কিন্নর-কৈলাসের বিপরীতে তুষারাচ্ছাদিত ধবলাধার শৃঙ্গ অনন্ত মহিমায় বিরাজ করছে।

নিবিড় সবুজ অরণ্য ঋতুপুষ্পে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়।

তুষারসঞ্জাত নদীগুলি সূক্ষ্ম নীল বসনে দেহ আবৃত করে নৃত্যলীলায় বয়ে চলে যায়। পাখির কলকাকলিতে পূর্ণ বনস্থলী।

এই অপার্থিব লোকে কেউ কখনও যদি পথ ভুলে গিয়ে পড়ে তাহলে সে কিন্নরের দুর্বার আকর্ষণ থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না।

পাহাড়ি পথে চলতে চলতে হয়তো হঠাৎ তার কানে ভেসে এল অপূর্ব এক সংগীতের সুর। সেই সুরের টানে তাকে যেতেই হবে সংগীতের উৎস সন্ধানে।

সহসা কোনও উপল বিছানো নদীতীরে এসে তার যাত্রা থেমে যাবে। তার চোখের সামনে ফুটে উঠবে একটি দৃশ্য।

অরণ্যের সবুজ শ্যামল বনভূমির প্রান্ত ধরে যে নীলবসনা তটিনী ছুটে চলেছে তারই কূলে একটি শিলাস্তূপের ওপর বসে প্রেমিকা কণ্ঠের সুর ভাসিয়ে দিচ্ছে অনন্তগগনে। আর তার পাশে বসে প্রেমিক বাজাচ্ছে মুরলী। সংগীতের সে এক আশ্চর্য যুগলবন্দি। প্রেমের দুর্বার বন্ধন সংগীতের এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে।

এই গন্ধর্বলোকই কিন্নরভূমি। এ অঞ্চলের রমণীরা, বিশেষভাবে তরুণ-তরুণীরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

এখানে বহুভ্রাতা পাণিগ্রহণ করে একটি মাত্র রমণীর, সে কারণে এই অঞ্চলে অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা অধিক।

যে সব রমণী গার্হস্থ্য জীবনযাপন করতে পারে না তারা কোনও ধর্মসংঘে সন্ন্যাসিনীরূপে যোগদান করে। অন্যেরা অধিকাংশ সময় যাপন করে নিঃসঙ্গ জীবন। পশুপালন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে।

এদের ভেতর ঈশ্বরের করুণাপ্রাপ্ত কোনও পুরুষ রমণী গাঢ় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যুগল-মূর্তিতে চরাচরে ঘুরে বেড়ায়। তারা প্রেমবন্ধনে এমনই আবদ্ধ যে কখনও সে বন্ধন ছিন্ন হয় না। মৃত্যু তাদের কাছে মধুর মূর্তিতে উপস্থিত হয়। তারা যুগলে প্রণত হয় সেই মৃত্যুর দেবতার কাছে।

ইচ্ছাশক্তিতে তারা বলীয়ান। এ ধরার সর্বত্র তারা বিচরণ করতে পারে। সবকিছু তাদের কাছে দৃশ্যমান হলেও মনুষ্যলোকের সকলেই তাদের দেখতে পায় না। তারা ভালোবেসে কোনও কোনও মর্তধামবাসীর কাছে ধরা দেয়।

মন্দপাল বলল, কিন্নর-মিথুন দর্শনের সুযোগ তোমার হল কী করে লপিতা?

সেইক্ষণটা ছিল আমার জীবনে পরম আনন্দময় এক শুভলগ্ন। আমি সে রাতে তপোবন আশ্রমে না থেকে আমার এই নিকুঞ্জ-বিহারে চলে এসেছিলাম। সে বসন্তরাতে চন্দ্রালোকের দুর্বার আকর্ষণ আমাকে আশ্রমকুটির থেকে বনপথে টেনে এনেছিল। মন্দ মন্দ সমীরণে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল আমার দেহমন। কোনও কিছুর অভাব পীড়িত করছিল আমার যৌবন বাসনাকে।

আমি পায়ে পায়ে এসে পৌঁছলাম আমার নিকুঞ্জ ভবনে। আশ্রম-তরুলতার পত্রপুষ্প থেকে বর্ষাধারার মতো ঝরে পড়ছিল জ্যোৎস্নাধারা। দিনমানভ্রমে বেজে উঠেছিল কোকিলের কণ্ঠ। পুষ্পে পুষ্পে শুরু হয়ে গিয়েছিল মধুপের গুঞ্জন। আশ্রমকুটিরের সম্মুখে বাঁধানো বেদিতে আমি উপবেশন করলাম। পুষ্পিত চম্পকতরু ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার মদির সুবাস। সেই আঘ্রাণ নিতে নিতে আমার মনে হল একাকিত্বের যন্ত্রণা বড় তীব্র। সহসা কোথা থেকে একটা মধুর সংগীতের সুর ভেসে এল। এ সুর কোকিলের পঞ্চমকেও হার মানায়। পাপিয়ার প্রাণ-কাঁপানো ধ্বনি এ সুরের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

অদূরবর্তী রাজগৃহে রাজকন্যা বিম্ববতী একসময় পিতার সঙ্গে আমাদের আশ্রম-দর্শনে এসেছিল। সেই থেকে আমরা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। একবার মাত্র তার অনুরোধে শিবিকায় আমি যাত্রা করেছিলাম রাজগৃহে। সেখানে আমি নানাবিধ যন্ত্রের সুরধ্বনি শুনেছিলাম, যা সেদিন হরণ করেছিল আমার তরুণী-চিত্ত। প্রত্যাবর্তনের সারাপথ সেই সংগীতের ইন্দ্রজাল আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু এ কী অপার্থিব সুর, যা আমাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দিল।

আমি ওই সুরের উৎস সন্ধানে পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম। আমার সন্ধান সহসা এসে থেমে গেল পদ্ম সরোবরের অদূরে।

আমি দেখলাম, সরোবর তীরে সোপানে বসে আছে আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুটি মূর্তি। তাদের কণ্ঠ থেকেই নিঃসৃত হচ্ছে এই অপার্থিব সুর-সুধা।

আমি এক তরুর অন্তরাল থেকে দেখতে লাগলাম তাদের লীলা-বিলাস।

তারা বাতাসে সংগীতের সুর ভাসিয়ে দিয়ে সোপান বেয়ে পদ্ম সরোবরের জলে নামল। জ্যোৎস্নার মতো সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্রে মেয়েটির দেহ আবৃত, পুরুষের দেহ আকাশের মতো নীল আবরণে ঢাকা।

কতক্ষণ তারা পদ্ম-সরোবরে অবগাহন করল। সন্তরণের সময় তাদের দেহের অভিঘাতে চূর্ণ জলকণা হীরক কণিকার মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

স্নান শেষে তারা যখন করবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সোপান বেয়ে উঠে আসছিল তখন সহসা আমাকে দেখতে পেল।

তাদের চোখেমুখে বিস্ময়! সেই অলৌকিক স্বপ্নিল রজনীতে আমি কেমন যেন মোহমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তারা আমাকে সুচারু নয়নবিভঙ্গে তাদের কাছে আহ্বান জানাল। আমি সেই আন্তরিক আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। ধীর পদসঞ্চারে উপস্থিত হলাম সেই স্বর্গীয় নরনারীর সম্মুখে।

কিন্নরী প্রশ্ন করল, এই গভীর নিশীথকালে তুমি কোথা থেকে এই পদ্ম-সরোবরের কূলে এসে আবির্ভূত হলে কন্যা?

আমি মৃদু হেসে উত্তর দিলাম, নদীতীরের এই তপোবন আমার পিতার। তিনি ঋষিকুলের পূজ্য। বৎসরের স্বল্পকালমাত্র তিনি এই আশ্রমে অবস্থান করেন। হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে ঋষি-সম্মেলনে বহু সময় তাঁকে পৌরোহিত্য করতে হয়। মাতৃহারা আমি।

পিতার স্নেহে সংবর্ধিত। তাঁর অবর্তমানে আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর সমর্পিত। পদ্ম সরোবর সংলগ্ন এই নিকুঞ্জ ভবনটি আমার স্বপ্নের সৃষ্টি। এখানে দিনমানে আমি অবস্থান করি। স্নান করি সম্মুখের পদ্ম-সরোবরে।

অদূরে বৈশালী রাজ্যের রাজকন্যা আমার প্রিয় সখী। যে সরোবর সোপানে আপনারা উপবেশন করেছিলেন সেই শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সোপানটি রাজকন্যা আমার স্নানের জন্য তৈরি করিয়ে দিয়েছে। আপনাদের পরিচয় এখনও আমি জানি না, তবে আপনাদের মর্তলোকের কোনও অধিবাসী বলে আমার মনে হচ্ছে না। অনুভবে বুঝতে পারছি আপনাদের পুণ্যস্পর্শে আমার এই নিকুঞ্জভবন আজ ধন্য হল। সম্মুখের কুঞ্জকুটিরে আপনারা যতকাল ইচ্ছা হয় অবস্থান করুন। আপনাদের সেবার সুযোগ পেলে আমিও কৃতার্থ হব।

ওদের মুখ থেকেই আমি ওদের পরিচয় পেয়েছি।

মাসাধিককাল আমি ওঁদের সঙ্গ লাভ করে অলৌকিক এক জীবনের সন্ধান পাই।

এরপর কতক্ষণ লপিতা নীরব থেকে স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল।

উৎসুক মন্দপাল এবার প্রশ্ন করল, কী সে অলৌকিক জীবন, লপিতা?

স্থানান্তরে যাত্রার পূর্বে কিন্নরী বলল, এক জ্যোৎস্নানিশীথে আমরা এসেছিলাম তোমার এই মনোরম আশ্রমে। আজ সেই পৌর্ণমাসী রজনী ফিরে এসেছে। আজ নিশাবসানে আমরা ভিন্ন কোনও সুরম্যলোকে যাত্রা করব।

আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, আমার আতিথ্যে কি কোনও বিঘ্ন ঘটল, যে কারণে আপনারা আমার ওপর বিমুখ হয়েছেন?

কিন্নরী সস্নেহে আমার করযুগল ধরে বললেন, তোমার এই নিকুঞ্জভবনে আমরা যে আনন্দসম্ভোগ করেছি তা এককথায় তুলনারহিত। তবে তিনপক্ষকালের অতিরিক্ত সময় আমরা কোথাও থাকতে পারি না, তাই নিয়মের অনুশাসন মেনেই আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে। যাত্রার পূর্বে আমরা তোমাকে একটি উপহার দিয়ে যেতে চাই।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, কী এমন উপহার যা আপনাদের বিচ্ছেদের বেদনাকে ভুলিয়ে দেবে?

তোমার জন্য আমরা একটি প্রেঙ্ক্ষা নির্মাণ করে এই বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়ে দিয়ে যাব। ওই প্রেঙ্ক্ষায় উপবেশন করে দোল খেলেই তুমি তোমার প্রার্থিত পুরুষকে কল্পনায় দেখতে পাবে। একদিন না একদিন তোমার সেই স্বপ্নের মানুষ উপস্থিত হবে তোমার সম্মুখে। তুমি তাকে এই প্রেঙ্ক্ষায় উপবেশনের জন্য আহ্বান করলে সে তোমায় ভালো না বেসে পারবে না। কিন্তু... এইখানে আবার থামলেন কিন্নরী।

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কী?

কিন্নরী বললেন, তুমি সেই পুরুষকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে কিন্তু সংসার রচনা করতে পারবে না।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, এর অর্থ?

প্রেমের সাগরে যদি ভাসতে চাও তাহলে কূলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়কে ভুলে যেতে হবে। আরও স্বচ্ছ করে এ কথার অর্থ তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সংসার রচনা যারা করতে চায় তারা সন্তান সন্ততি নিয়ে থাকতে ভালোবাসে, তখন নারীপুরুষের ভালোবাসায় প্রেমের সেই মধুর রোমাঞ্চ থাকে না। তাই আমরা শুধু প্রেমের জোয়ারে ভেসে চলি, গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করি না। আমাদের জীবনে প্রেম তাই অনন্তকালে প্রসারিত।

সম্ভোগের আনন্দ পাওয়া যাবে কিন্তু সন্তান উৎপাদনের কোনও ক্ষমতা থাকবে না। এখন তুমি এই মায়া-প্রেঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা কর কিনা বলে দাও।

চিন্তায় ডুবে গেলাম আমি। প্রেমের পরিণতি কি শুধুই আনন্দ-সম্ভোগ! জগতে তাহলে তো সৃষ্টির লীলা স্তব্ধ হয়ে যাবে। পরক্ষণে মনে হল আমার এই নবযৌবনে একজনও কাঙ্ক্ষিত পুরুষের দর্শন পেলাম না। প্রেমের আনন্দ যে কী তা এখনও আমি অনুভব করতে পারিনি। আগে তো প্রেমকে উপভোগ করি তারপর সন্তান সংসারের কথা ভাবা যাবে।

এই অনুভূতি যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল তখনই আমি তাঁদের বললাম, আমি আপনাদের রচিত মায়াপ্রেঙ্ক্ষার অভিলাষী।

তাঁরাই এই প্রেঙ্ক্ষাটির রচনাকার্য শেষ করে আকাশের দিকে তাকালেন। তখন শুকতারাটি বিশাল হীরকখণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। সেই কিন্নর মিথুন সস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছু সময় নীরব থেকে লপিতা বলল, কিন্নর মিথুনের উপাখ্যান এবং তাদের মায়াপ্রেঙ্ক্ষা রচনার কাহিনি তোমাকে শোনালাম। এখন তুমি যেখানেই যাও এই প্রেঙ্ক্ষার আকর্ষণে তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। কিন্নরী অত্যন্ত মৃদুভাষে আমার কর্ণে শেষ একটি কথা বলেছিলেন, যদি তুমি মন থেকে মুক্তি দাও একমাত্র তাহলেই তোমার সঙ্গী মুক্ত হতে পারবে। তখন এই প্রেঙ্ক্ষার আকর্ষণী শক্তিই নষ্ট হয়ে যাবে।

মন্দপাল কিছুকাল লপিতার সঙ্গে আনন্দবিহারের পর বলল, তুমি আমাকে কিছুদিনের জন্য পিতৃসত্য পালনের অবকাশ দাও।

লপিতা বলল, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব সখা, যথা সত্বর সম্ভব ফিরে এসো।

লপিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মন্দপাল এক প্রভাতে যাত্রা করল খাণ্ডব কাননের উদ্দেশ্যে।

দ্বিপ্রহরে নদীতীরে এসে একটি শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করল সে।

লপিতা তাকে বিদায়কালে দ্বিপ্রাহরিক আহার্য সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। সে পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই খাদ্যবস্তু গ্রহণ করল। অঞ্জলিভরে পান করল প্রবাহিত নদীর সুমিষ্ট সলিল।

আহারান্তে নদী পার হয়ে মন্দপাল একটি তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে এসে পড়ল। অদূরে দৃষ্টিগোচর হল ধূমলবর্ণের একটি পর্বত। সানুদেশে চিরহরিৎ অরণ্য বহুদূর প্রসারিত।

দূর থেকে পর্বতকে দেখলে ভ্রম হয় অতি অল্প সময়ের ভেতর ওর পাদদেশে পৌঁছনো যাবে, কিন্তু বহু সময় পদব্রজে অগ্রসর হলেও দূরত্ব একই রকম প্রতীয়মান হয়।

দ্রুত পদচারণা করে সন্ধ্যা সমাগমের পূর্বে পর্বতের ওপারে খাণ্ডবকাননে পৌঁছল ঋষিকুমার মন্দপাল।

সন্ধ্যার ধূসর আলোয় ঋষিকুমার দেখল অদূরে ছায়াচ্ছন্ন একটি কুটির। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মি চোখে এসে পড়ল। সেই আলোকের উৎস লক্ষ করে দ্রুতবেগে পা চালাল মন্দপাল।

ছোট্ট একটি অঙ্গনে এসে দাঁড়াল একসময়। প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে পুষ্পের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। মন্দপাল বুঝতে পারল, আশ্রম তরুগুলি পুষ্পিত হয়ে সুবাস ছড়াচ্ছে।

যে আলোকরশ্মি দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল তা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বাতায়ন পথে। পর্ণকুটিরের দ্বার বন্ধ। বাইরে দাঁড়িয়ে মন্দপাল বলল, আমি অতিথি—ঋষিতনয়, আশ্রয়প্রার্থী।

সামান্য সময় বিরতির পর দ্বার খুলে গেল।

আঁচল আড়ালে সন্তর্পণে প্রদীপখানি নিয়ে দেহলিতে এসে দাঁড়াল একটি কন্যা।

প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হল মন্দপাল। যেন সন্ধ্যাতারাটি নেমে এসেছে দেহলিতে। এ নিশ্চয়ই ঋষিকন্যা জরিতা। সে জানত পিতার মৃত্যুর পর একাকিনী খাণ্ডবকাননে নির্জন-বাস করছে জরিতা।

নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলল, আপনার পিতৃবন্ধু ঋষি উদ্দালকের পুত্র আমি। মন্দপাল নামেই আমি পরিচিত।

প্রদীপখানি দেহলির একপ্রান্তে রেখে মন্দপালের উদ্দেশ্যে করজোড়ে নমস্কার নিবেদন করল জরিতা।

দেহলিতে উঠে আসুন ঋষিকুমার।

একটি চৌকির ওপর উপবেশনের আসন পেতে দিল সে। পরে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করল জরিতা।

রাত্রে অতিথি সেবার যথোপযুক্ত আয়োজন করল। আহারের সময় পাশে বসে ব্যজন করতে লাগল সে।

মন্দপাল বলল, আমার অপরাধ নেবেন না, বহুপূর্বে আমার এ বনভূমিতে আসার কথা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের উভয়ের পিতা বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কী আশ্চর্য দৈবনির্বন্ধ, দুই পরমবন্ধু প্রায় একই সময়ে পরিনির্বাণ লাভ করলেন। আমাদের দুজনের জননীও আজ ইহলোকে নেই। তবে আমি মনে করি এদের আশীর্বাদ আমাদের ওপর নিত্য বর্ষিত হচ্ছে।

জরিতা মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার পিতৃদেব আপনার আগমনের সংবাদ পূর্বেই আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁর পরলোকগমনের পর আমি প্রতীক্ষা করছিলাম আপনার আগমনের। আমাব সেই প্রতীক্ষার কাল পূর্ণ করে এই পর্ণকুটিরে আপনার আবির্ভাব ঘটল।

পিতৃআদেশ পালনের জন্যই আমি এসেছি জরিতা।

সলজ্জ হাসি হেসে জরিতা বলল, আর কোনও আকর্ষণ বোধ করেননি?

পিতৃসত্য পালনের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই আকর্ষণ।

প্রথম রাত্রে দুই যুবক-যুবতীর প্রায় নিশিজাগরণেই কেটে গেল। পরস্পরকে জানার আগ্রহ যত প্রবল হল ততই রচিত হতে লাগল কথার আবর্ত।

মন্দপাল জানতে চাইল, এই অরণ্যভূমিতে কেউ কি তোমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়?

জরিতা বলল, অরণ্যচারী মানুষগুলি বড় সরল আর পরোপকারী। তারাই আমার গৃহসংলগ্ন খেতে নিবার ফলায়। আশ্রমসঞ্জাত ফলফুল তারাই সংগ্রহ করে আমার গৃহে দিয়ে যায়। বিভিন্ন ঋতুতে বনবাসী নারী-পুরুষ আমাদের প্রাঙ্গণে এসে নৃত্যগীত পরিবেশন করে।

প্রভাতে সন্ধ্যায় পক্ষীর কূজনে আমি নিঃসঙ্গতা ভুলে যাই। কেবল বর্ষা ও বসন্ত আমাকে উতলা করে।

সারা বর্ষা ঋতু আমার নয়নে প্লাবন ডেকে আনে। হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা ঝিল্লির ধ্বনিতে গুমরে মরে।

ঋতু বসন্ত আমার কাছে আরও অসহনীয়। কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পস্তবকে আমি কাঙ্ক্ষিত পুরুষের উষ্ণীষশীর্ষ দেখতে পাই। কিংশুকের রক্তিমপুষ্পে আমি আমার কবরী বন্ধন করি। বৃক্ষান্তরালে কোকিলের সুরধ্বনিতে আমি আমার অন্তরের সুর মেলাই। জানি না আমার সেই বিরহগাথা কোনও প্রবাসী বন্ধুর উদ্দেশ্যে গীত হয় কিনা।

সহসা তার কর ধারণ করে বলে উঠল মন্দপাল, আমি কি তোমার সেই নববসন্তের কাঙ্ক্ষিত পুরুষ হতে পারি না জরিতা?

ব্রীড়ানম্র দৃষ্টিতে মন্দপালের দিকে তাকাল দীর্ঘ প্রতীক্ষাকাতর ঋষিকন্যা।

মন্দপাল জরিতাকে বক্ষে ধারণ করে বলল, আজ আমাদের পরলোকগত জনক-জননীদের আশীর্বাদ আমাদের ওপর বর্ষিত হোক,—এই প্রার্থনা।

জরিতার প্রেম যেন সুশীতল স্রোতস্বিনী, আর লপিতার প্রেম প্রবল বেগবতী প্রপাত।

প্রপাতের দিকে তাকালে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। শিলাখণ্ডে জলকণার অভিঘাতে সৃষ্টি হয় দুর্বার প্রেমের ইন্দ্রধনু আর স্রোতস্বিনীর প্রবাহে আছে স্নিগ্ধতা, তার সলিলে অবগাহন করে প্রশান্ত হয়ে যায় দেহমন। একজন দুর্বার শক্তির প্রতীক, অন্যজন সেবা মূর্তিমতী।

মন্দপালের চিন্তায় এই চিত্র ফিরে ফিরে আসে।

কয়েকদিন একই গৃহে পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকল তারা। মন্দপালের চোখে পড়ল জরিতার সুনিপুণ গৃহিণীপনা। সে যেন অন্নপূর্ণা, ভাণ্ডার তার সততই পূর্ণ। একটি মরাই-এ সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় নীবার ধান্য সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে। অত্যন্ত উর্বর পাহাড়ি মাটিতে তরিতরকারির প্রচুর ফলন দেখা যায়। তাছাড়া তপোবনে নানাধরনের ফলকর বৃক্ষ বিভিন্ন ঋতুতে প্রভূত ফল দান করে।

এইসব আহার্য বস্তুর সঞ্চয় বনবাসী নরনারীরাই করে দিয়ে যায়। ওই সহজ সরল অকৃত্রিম মানুষগুলির স্নেহ ভালোবাসায় জরিতা আপ্লুত।

সে যখন নিপুণহাতে গৃহকর্মগুলি সমাধা করে, কিংবা অদূরে প্রবাহিত ঝরনায় স্নান সমাপন করে কক্ষে পূর্ণ ঘট নিয়ে আশ্রম কুটিরে প্রত্যাবর্তন করে তখন দূর থেকে তাকে দেখে মন্দপালের মনে হয়, জরিতা এক সুকল্যাণী গৃহবধূ।

প্রতিদিন অবকাশ সময়ে ওরা দুজনে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করে যায়। অতীতের স্মৃতি রোমন্থনই চলে অধিক সময় ধরে।

মন্দপাল কর্মহীন জীবনযাপন করতে পারে না। সে তপোবনের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করে আনে। সবজি বাগানের পরিচর্যাও করে। কাজে মগ্ন হয়ে থাকার সময় যদি বেলা বেড়ে যায় তখন পাশে এসে দাঁড়ায় জরিতা।

মন্দপালের হাত থেকে খনিত্র বা জলের ঝারিটি টেনে নিয়ে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

সম্বিত ফিরে আসে মন্দপালের। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ত্বরিতে উঠে দাঁড়ায়। সলজ্জ হাসি হেসে তাকায় জরিতার দিকে। বেলা মধ্যগগনে।

জরিতা তার হাতে স্নানের বস্ত্রাদি তুলে দিয়ে বলে, সত্বর তুমি ঝরনার জলে স্নান সেরে চলে এসো, কুটিরে মধ্যাহ্ন আহার প্রস্তুত।

সে সবজি কিংবা ফলের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলে যায় কুটিরের দিকে।

দ্রুত পায়ে ঝরনা লক্ষ্য করে হেঁটে চলে যায় মন্দপাল।

একদিন আহারে বসেছিল মন্দপাল, পরিবেশন করছিল জরিতা, হঠাৎ মন্দপাল বলল, আমরা কি একসঙ্গে আহারে বসতে পারি না? মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

জরিতা বলল, পিতা যখন আহারে বসতেন তখন জননীই তাঁকে পরিবেশন করতেন। মাঝে মাঝে আতপতাপ অসহ্য বলে মনে হলে তালপাতা নির্মিত পাখা নিয়ে ব্যজন করতেন। আমি কোনওদিন তাঁকে পিতার সঙ্গে একত্রে বসে আহার গ্রহণ করতে দেখিনি। সেই রীতি আমি ভাঙতে পারব না ঋষিকুমার।

জরিতার শেষের উক্তিটি বড় অর্থবহ বলে মনে হল মন্দপালের। জরিতা কি তাকে তার স্বামীর মর্যাদা দান করে? তাহলে কি তার ভাবনায় উভয়ের দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিত আছে।

কোনও কোনও জ্যোৎস্নারাতে তারা দীর্ঘসময় আলাপচারিতার ভেতর কাটিয়ে দেয়। দুটি মিলন-সমুৎসুক হৃদয় একান্ত নিকটে আসতে চায়।

এক জ্যোৎস্নাধোয়া রাতে পাপিয়ার তান শুনে মন্দপাল স্থির রাখতে পারল না নিজেকে। সে তার শয্যার পাশে আমন্ত্রণ জানাল জরিতাকে।

মুখে বলল, আর কতদিন আমরা বিরহ সন্তাপে কাটাব জরিতা? আমরা কি একই শয্যাসঙ্গী হতে পারি না?

ব্রীড়াজড়িত কণ্ঠে জরিতা বলল, আমাদের উভয়ের পিতাই আমাদের মিলনের কথা বলে গিয়েছেন, সুতরাং শয্যাসঙ্গী হতে আমার কোনও বাধা নেই, তবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাদের প্রথমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে, তাহলেই একই শয্যায় শয়নের অধিকার জন্মাবে।

কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত ভূখণ্ডে বৈদিক বিধানে আমরা বিবাহকর্ম সম্পাদন করব কীভাবে?

আপনি এই বনভূমিতে কেবলমাত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীকেই দেখেছেন কিন্তু আমাদের তপোবন প্রান্তের দিকে প্রতিদিন আমি যে একবার করে যাই সেদিকে লক্ষ করেছেন কি?

মন্দপাল বলল, লক্ষ করেছি কিন্তু তোমার এই গমনাগমনের ব্যাপারে আমার কোনও কৌতূহল ছিল না। তাই কোনও দিন তোমাকে কোনও প্রশ্ন করিনি।

জরিতা বলল, আমাদের এই আশ্রমপ্রান্তে অতি বৃদ্ধ জরাক্রান্ত এক ঋষি রয়েছেন, যাঁর নাম অথর্বা। তিনি অক্ষম, তাই আমার সেবার ওপর নির্ভরশীল। তাঁর সহজপাচ্য পথ্যাদির ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। তাঁর সেব্য বনৌষধি আমিই তাঁর নির্দেশে সংগ্রহ করে আনি। তিনি বেদবিদ্ শুদ্ধাত্মা। তিনি বেদমন্ত্রে আমাদের বিবাহকর্ম সম্পাদন করবেন।

মন্দপাল বলল, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। তিনি তোমাকে সম্প্রদান করবেন, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আমাদের কী হতে পারে!

ঋষি অথর্বার নির্দেশে বনবাসীরা বিবাহমণ্ডপ নির্মাণ করে দিল। সেই মণ্ডপ সুসজ্জিত হল পুষ্পপল্লবে।

আদিবাসী নারীরা জরিতাকে ঝরনার জলে স্নান করিয়ে শুদ্ধবস্ত্রে সুসজ্জিত করে আনল। অন্যদিকে বনবাসী পুরুষরা মন্দপালকে বরের সাজে সজ্জিত করল। শুভ্র বসন, শুভ্র উত্তরীয় মাথায় হলুদ বর্ণের উষ্ণীষ।

জরিতার পরনে ছিল লাল পাড় সাদা একটি শাড়ি। রমণীরা তাকে পুষ্পাভরণে রমণীয় করে সাজিয়ে তুলেছিল।

আদিবাসীজনের লৌকিক অনুষ্ঠানের পর ওরা বসল এসে বিবাহমণ্ডপে। ঋষি অথর্বাকে তুলে আনা হল মণ্ডপের ওপর। তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন বৈদিক বিবাহমন্ত্র :—

"সম্ অঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ
সম্ আপো হৃদয়ানি বাম্।
সং মাতরিশ্যা সং ধাতা
সম্ উদেষ্ট্রী দধাতু বাম্"

'বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বদেবতা
মাতরিশ্বা, নিয়তি ও ধাতা
করে দিন একতান
তোমাদের দুটি প্রাণ'

এবার ঋষি অথর্বা মন্দপালকে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন,—

"যদ্ ইদং হৃদয়ং তব
তদ ইদং হৃদয়ং মম
মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু।
মম চিত্তম্ অনুচিত্তং তে-অস্তু
মম বাচম্ একমনা জুষস্ব।
বৃহস্পতিস্ ত্বা নি যুনক্তু মহ্যম্'

'তোমার হৃদয় আমারি হৃদয়
আমার হৃদয় তোমারি
মোর ব্রতে তব হৃদয় মিলুক এসে।
আমার চিত্ত তোমার চিত্ত
পাশাপাশি জেগে থাক,
একমনে শুনো মোর কথা ভালবেসে।
তোমাকে আমার সনে
দেবতা বৃহস্পতি বেঁধে দিন সুনিবিড় বন্ধনে'

শেষ মন্ত্রটি মন্দপালকে উচ্চারণ করতে বললেন ঋষি। এ সময় মন্দপালকে জরিতার হস্তধারণ করতে হল।

"ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সম্ ঋধ্যতাম্
অস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্ব
অধা জিব্রী বিদথম্ আ বদাথঃ"

'এ ঘর-দুয়ার সকল তোমার রানী হয়ে জেগে থাকো,
মনোমত সব পাও যা যা চাও, পাও সন্তানসুখও।
স্বামীর সঙ্গে মেশাও তোমার তনু—'দেহ মন প্রাণ—
বৃদ্ধ বয়স অবধি জীবন-যজ্ঞ-অনুষ্ঠান'
(গৌরী ধর্মপাল কৃত অনুবাদ)

হঠাৎ এক পৌর্ণমাসী রজনীতে ঘুম ভেঙে গেল মন্দপালের। সে উঠে বসল শয্যায়। বাতায়নপথে দেখল, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বনভূমি। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পত্রপুষ্পে আলো পড়ে বনপথে আলোছায়ার অপূর্ব এক আলিম্পন আঁকা হয়েছে।

এ কী দেখছে মন্দপাল! এ তো খাণ্ডবকানন নয়। এ যে লপিতার বনকুঞ্জ। ওই তো নিকুঞ্জভবন!

দুলছে, সেই পুষ্পিত মায়াপ্রেঙ্খা লপিতার পদতাড়নায় সঞ্চালিত হচ্ছে। লপিতার মায়াভরা কণ্ঠস্বর,—এসো, এসো প্রিয়তম, দূরে থেকো না।

মন্দপাল দেখল, এক নারী একই শয্যায় তন্দ্রানিমগ্ন। নিশি পাওয়ার মতো ঘর থেকে পথে বেরিয়ে এল মন্দপাল। যে পথ দিয়ে একদিন সে খাণ্ডবকাননে এসেছিল ঠিক সেই পথ ধরেই কোনও এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে টেনে নিয়ে চলল।

নিশি অবসানে শয্যাত্যাগ করে উঠে বসল জরিতা। এ কী পাশে নেই মন্দপাল! দ্বার উন্মুক্ত।

জরিতা বনপ্রদেশের অন্ধিসন্ধি সব তন্নতন্ন করে খুঁজে চলল। বনবাসীদের কাছে জানতে চাইল তারা ঋষিকুমার মন্দপালকে দেখেছে কিনা। সকলেই জানাল, মন্দপালকে তারা কেউ দেখেনি।

প্রবল বায়ুপ্রবাহে বনভূমিতে উঠল মর্মরধ্বনি। জরিতার মনে হল এ যেন তারই হৃদয়ের হাহাকার।

সূর্য প্রখর হচ্ছে, জরিতা কলস নিয়ে ঝরনার দিকে চলল অবগাহন করতে।

অন্যমনে একসময় স্নান সমাপন করে, পূর্ণ কলস কক্ষে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সহসা তার মনে হল, ঋষিকুমার হিমালয়ে সাধন ভজনের জন্য নিঃশব্দে প্রস্থান করেছেন।

বনপথে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। তার হৃদয়ের একটি গোপন কথা সে জানাতে পারেনি মন্দপালকে। যদি মন্দপাল জানত যে তার জরিতা জননীপদ লাভ করতে চলেছে তাহলে তাকে ছেড়ে কোনও মতেই সে যেতে পারত না।

নিজের ভাগ্যকেই বারবার দোষ দিতে লাগল জরিতা।

এদিকে মন্দপাল পর্বত অতিক্রম করে দীর্ঘপ্রান্তর আর নদী পার হয়ে যখন লপিতার নিকুঞ্জভবনে এসে দাঁড়াল তখন দিনান্তের আকাশে একটা ব্যথার রাগিণী বেজে উঠেছে।

পরক্ষণেই আশ্রমতরুশীর্ষে উদীয়মান চন্দ্রকে দেখা গেল।

কে আসছে নিকুঞ্জ ভবনের পথে পুষ্পিত প্রেঙ্ক্ষাকে লক্ষ্য করে।

মন্দপাল দেখল, বিষাদিনী এক রমণী মূর্তি ক্লান্ত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। ততোধিক ক্লান্ত মন্দপাল। সেও এগিয়ে গেল প্রেমিকা লপিতার দিকে।

লপিতার দীর্ঘ বিরহের যন্ত্রণা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে লাগল নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ মন্দপালের বুকে।

সে রাতে বিচ্ছেদ হল না প্রেমাসক্ত যুগল প্রেমিকের। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুটি মূর্তিকে দেখা গেল সারারাত্রি দুলে চলেছে সেই পুষ্পিত প্রেঙ্ক্ষায়।

সত্যই যাদু আছে ওই আশ্চর্য দোলনায়। তাকে একবার স্পর্শ করলে সে ভুলিয়ে দিতে পারে স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ।

একদিন দোলনায় দোল খেতে খেতে লপিতা জানতে চাইল, তুমি কেন খাণ্ডবকাননে গিয়েছিলে ঋষি?

মন্দপালের উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, পিতৃ আদেশ পালনের জন্য।

লপিতা এরপর আর কোনও প্রশ্ন করল না। অকারণ কৌতূহলী হয়ে ওঠা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে নীরব হয়ে রইল।

আরও তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল প্রেমিক যুগলের জীবনে। তাদের নিবিড় সুখানুভূতিতে কোনও ছেদ পড়ল না। বিবাহিত পতিপত্নীর মতোই আচরণ করতে লাগল তারা, কিন্তু কিন্নর দম্পতির অমোঘ নিয়মে সন্তানের জনক জননী হতে পারল না। এতে কোনও ক্ষোভ সঞ্চারিত হল না তাদের মনে।

প্রতিদিন প্রভাতে পুষ্পচয়ন করে আনত লপিতা। নানাবর্ণের সুগন্ধিপুষ্পে গাঁথা হত দীর্ঘ মালিকা। নিশীথে প্রেঙ্ক্ষায় বসে আলিঙ্গনে আবদ্ধ যুগলমূর্তির গলায় দুলত ওই একটিমাত্র মাল্যা।

একদিন সঞ্চালিত প্রেঙ্ক্ষায় দোল খেতে খেতে লপিতা বলল, যেদিন এই মালিকার সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে সেদিন আমাদের প্রেমের বন্ধন আর থাকবে না।

বেদনার্ত মন্দপাল বলল, এই আনন্দঘন মুহূর্তে বিচ্ছেদের কথা কেন উচ্চারণ করছ লপিতা?

এ আমার কথা নয় সখা, কিন্নরী আমাকে এই সত্য জানিয়ে দিয়ে গেছে।

অন্যদিন মন্দপাল বলল, এই অনন্তকালের বুকে কতদিন আমরা এমনই নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারব লপিতা?

তার উত্তর তো তুমি আগেই পেয়ে গেছ সখা। তবে জেনে রেখো সন্তানের আগমন ঘটলেই আমাদের এই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

নিদাঘের খরতাপে দগ্ধ দীর্ণ দিন। দূরের পথে মধ্যাহ্নে কোনও পথচারীকে প্রায়ই দেখা যায় না। পক্ষীরা ভুলে গেছে তাদের কূজন। বায়ুতে অগ্নিস্পর্শ। ঝরনার জলধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

সঞ্চালিত প্রেক্ষা সহসা থেমে গেল। দূরে—বহুদূরে একটি অগ্নিবলয় দেখা গেল। সচকিত হয়ে লপিতাকে জিজ্ঞেস করল মন্দপাল, দূরে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে, এ অগ্নির উৎস কোথায়?

লপিতা বলল, এ অরণ্য-বহ্নি। গ্রীষ্মের উত্তাপে প্রস্তরের ওপর প্রস্তর যখন গড়িয়ে পড়ে তখন সৃষ্টি হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের। অরণ্যের রাশিকৃত শুষ্কপত্রে আগুন ধরে যায়। তখন সারা বনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে সে আগুন। সবুজশ্যামল বৃক্ষগুলিও সেই ভয়ংকর বহ্নির হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। পশুপক্ষীও উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিগন্ত লক্ষ্য করে পালাতে থাকে প্রাণভয়ে।

আর বনবাসীজন?

যারা দ্রুত পলায়ন করতে পারে তারা রক্ষা পায়, নচেৎ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে অপঘাতে।

মৃত্যুর কথায় সহসা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল মন্দপাল। তার মনে হল, দূর থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে কে যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলছে, ঋষিপুত্র আমাদের বাঁচাও, ভয়ংকর হুতাশন আমাদের গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে।

মুহূর্তে প্রেক্ষা থেকে উঠে দাঁড়াল ঋষিকুমার মন্দপাল।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে দ্রুতপদে অগ্রসর হল খাণ্ডবকানন অভিমুখে। বিস্মিত লপিতা তাকিয়ে রইল মন্দপালের গমনপথের দিকে।

নদী আর প্রান্তর পার হয়ে মন্দপাল যখন শৈল সানুদেশে এসে পৌঁছল তখন পশ্চিম আকাশ প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণ ধারণ করেছে।

প্রজ্বলিত খাণ্ডবকাননের প্রতিবিম্ব পড়েছে যেন আকাশের দর্পণে।

কৃষ্ণপক্ষের নিশীথিনী। জরিতার আশ্রম-কুটিরে পৌঁছতে হলে খাণ্ডবকাননের পশ্চিমপ্রান্ত ধরে অগ্রসর হতে হয়। উজ্জ্বল চন্দ্রালোক ছাড়া সে পথে নিশাকালে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু কি আশ্চর্য, পূর্ব বনস্থলীর অগ্নিশিখায় পশ্চিমের ওই পথ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

দুরন্ত অশ্বের গতিতে জরিতার আশ্রম-কুটির লক্ষ্য করে ছুটে চলল মন্দপাল।

রজনীর দ্বিতীয় যামে সে এসে পৌঁছল কুটিরের সন্নিকটে।

দূর অরণ্য-বহ্নির কম্পিত আলোকশিখায় সে দেখল, জরিতার মতো কোনও নারী একটি শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কুটির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভয়ার্ত দৃষ্টি অগ্নির গতিপথের দিকে নিবদ্ধ।

মন্দপাল প্রাঙ্গণের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে কুটির-সীমায় প্রবেশ করল।

জরিতা খাণ্ডবকাননের দিকে তাকিয়ে হুতাশনের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা দেখছিল। শিশুটি জননীকে জড়িয়ে ধরে তার ভয়ার্ত দুটি চোখ মেলে মায়ের স্কন্ধদেশে চিবুক রেখে তাকিয়েছিল পেছনের দিকে।

ঝুঁটিবাঁধা দিব্যদর্শন শিশুটিকে দেখে মুহূর্তে উদ্বেলিত হয়ে উঠল মন্দপালের পিতৃহৃদয়। শিশুর আকৃতি দেখে মন্দপাল স্থির সিদ্ধান্তে এল, এ জরিতার গর্ভজাত সন্তান, তাদের উভয়ের আনন্দদুলাল।

মাভৈ ধ্বনি তুলে জরিতার দিকে এগিয়ে গেল ঋষিকুমার মন্দপাল। ত্রস্তে পেছনে ফিরে স্বামীকে উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় দেখে সব অভিমান ভুলে সপুত্র মন্দপালের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জরিতা।

মন্দপাল আপন কুটিরে ফিরে এসেছে জেনে উদ্‌ভ্রান্ত আদিবাসীরা জরিতার অঙ্গনে সমবেত হল। তাদের মনে হয়েছিল ঋষিকুমার মন্দপালই তাদের রক্ষাকর্তা।

মন্দপাল বলল, এই প্রজ্বলিত অগ্নিকে তোমরা বিনাশকারী বলে মনে কোরো না। যে অগ্নি গৃহদাহ করে, প্রতিক্ষণ সে অগ্নিকে ছাড়া কোনও কর্মই আমাদের সম্পন্ন হয় না। রন্ধন কর্ম, দীপ প্রজ্বলন, যজ্ঞকর্ম এমনকী দাহকর্ম পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্নির মহিমা অপার। তাই বলি, অগ্নি যা গ্রাস করেছে তার জন্য দুঃখ কোরো না, বরং অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা কর।

শুধু অগ্নিরক্ষা কার্যে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পর্বতের তলদেশে রয়েছে তৃণভূমি অথবা অরণ্যভূমি। কোনও কোনও ঋতুতে তৃণ-শুষ্ক হয়, অরণ্য শুষ্কপত্র মোচন করে। তোমরা অগ্নি প্রজ্বলনের জন্য দুটি প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার কর। ঠিক তেমনই পাহাড়ের তলদেশে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের ওপর যখন পাহাড়ের ওপর থেকে খসে পড়া প্রস্তরখণ্ড গড়িয়ে এসে পড়ে তখন ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। শুষ্ক তৃণভূমিতে অথবা শুষ্ক বৃক্ষপত্রে সেই অগ্নি তার দহন-লীলা শুরু করে দেয়। সেই সঞ্চরমাণ অগ্নি থেকে জ্বলতে থাকে বন বনান্তর। বনবাসী পশুপক্ষী এমনকী মানুষজন সেই অগ্নির গ্রাস থেকে সব সময় নিজেদের রক্ষা করতে পারে না।

এ বিষয়ে তোমাদের সচেতন হতে হবে। পরিকল্পনা করে তোমরাই একদিন বন্ধ করতে পারবে অগ্নির ধ্বংসলীলা।

সমবেত মানুষগুলি জানতে চাইল, কীভাবে তা সম্ভব ঋষিকুমার?

তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পর্বত সানুদেশের অরণ্যভূমিতে সঞ্চিত শুষ্কপত্র পরিষ্কার করে দূরে সরিয়ে দেবে। যাতে শিলাখণ্ডে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হলেও তা প্রবল দহন-লীলা সৃষ্টি করতে না পারে।

জনৈক আদিবাসীর প্রশ্ন, পর্বতসংলগ্ন প্রান্তর জুড়ে বিশাল তৃণভূমি, সেই তৃণভূমিতে অগ্নিসংযোগ হলে তা ছড়িয়ে পড়বে বহুদূর পর্যন্ত। সে অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কী?

মন্দপাল বলল, পর্বতগাত্র থেকে বিচ্যুত শিলাখণ্ড সাধারণত পর্বত সন্নিহিত স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। তোমরা তৃণভূমির ওপরে গড়িয়ে আসা প্রস্তরখণ্ড গুলিকে একত্র স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। বিভিন্ন স্থানে সেই স্তূপগুলির সৃষ্টি হবে। তোমরা সেই স্তূপের চতুর্দিকে একটি একটি বৃত্ত রচনা করে তার ভেতরের তৃণগুলি পরিষ্কার করে রাখবে। এতে অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনা কমবে। সংগৃহীত শুষ্ক পত্রগুলিও কাজে লাগবে তোমাদের। প্রত্যেক বনবাসী ওই বৃক্ষপত্রগুলি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করবে। উদ্বৃত্ত শুষ্কপত্রগুলি গৃহসংলগ্ন অঙ্গনে কয়েকটি গর্ত খুঁড়ে রেখে দেবে। জলে ভিজে রোদে পুড়ে সেগুলি একদিন সারে পরিণত হবে। সেখানে ফলকর বৃক্ষ লাগাবে।

অকিঞ্চিৎকর ভেবে কোনও জিনিসকেই অবহেলাভরে ফেলে দিতে নেই। সেগুলিকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তা ভেবে স্থির করতে হবে।

পরক্ষণে বনবাসীদের মন্দপাল প্রশ্ন করল, এই খাণ্ডববনে পশুদের সংবাদ কী?

বৃদ্ধ এক বনবাসী বলল, বন্য পশুদের কিছু কিছু অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, আমরা গৃহপালিত গবাদি পশুকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলাম, তাই তারা রক্ষা পেয়েছে।

মন্দপাল সোৎসাহে বলল, এ অতি উত্তম সংবাদ। ওদের দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য তোমাদের কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। সামনেই বর্ষাঋতু, শুরু করতে পারবে কৃষিকর্ম।

বনচারীরা প্রস্থান করলে মন্দপাল সহসা জরিতার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, ঋষি অথর্বার সংবাদ কী?

জরিতা বলল, বড় বিস্ময়কর সে ঘটনা। অগ্নির সংহার মূর্তি দেখেই আমরা দৌড়েছিলাম তাঁর কুটির লক্ষ্য করে। কুটির প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেখলাম, ঋষি দেহলির ওপর একখানি অজিন আসন বিছিয়ে তার ওপর পদ্মাসনে বসে বহ্নিলীলা প্রত্যক্ষ করছেন। আশ্চর্য হয়ে আরও দেখলাম, ঋষির মুখমণ্ডলে শঙ্কার কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে বাধা পেলাম।

ঋষি অথর্বা বললেন, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম। বর্ষা এবং ঝঞ্ঝায় অগ্নিরক্ষা করা ছিল আমাদের কর্ম। ওই অগ্নিতেই প্রত্যহ সম্পন্ন হত আমাদের হোমকর্ম। সেই অগ্নিকে ভয় পাব কেন? তাছাড়া এই কুটিরে থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের দিনযাপন করে গেছেন। আমি এখন অথর্ব বৃদ্ধ, এখন আমার অগ্নি-সংস্কারের প্রয়োজন।

সামান্য সময় নীরব থেকে বললেন, এখানে আর অপেক্ষা কোরো না, সম্মুখের তরুলতা প্রজ্বলিত হয়েছে, দগ্ধবৃক্ষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, তোমরা নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এখনই প্রস্থান কর।

প্রবল হয়ে উঠল অগ্নির উত্তাপ। আমরা কেউ সে উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ঋষির কুটির থেকে দূরে প্রস্থান করলাম।

পরদিন গিয়ে দেখি ঋষির কুটির কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গার-স্তূপে পরিণত হয়েছে।

আমি সেই মহান ঋষি অথর্বার দগ্ধ দেহের পূতাস্থি সংগ্রহ করলাম। শুদ্ধবস্ত্রে সেই অস্থি বহন করে নিয়ে এসে ঝরনার সলিলে ভাসিয়ে দিলাম।

একদিন ঋষি অথর্বার মুখেই শুনেছিলাম, এই খাণ্ডব অরণ্যের ঝরনাটি বহু দিক্‌দেশ পরিক্রমা করে নদী সরস্বতীতে গিয়ে মিশেছে।

বাণীর বরপুত্র ছিলেন ঋষি অথর্বা। জননী সরস্বতী পরমস্নেহে তাঁর সন্তানের অবশেষকে বক্ষে ধারণ করলেন।

বর্ষাঋতুর ধারাবর্ষণে আবার সজীব, শ্যামল হয়ে উঠল খাণ্ডব বনভূমি। প্রবাসী পক্ষীকুল ফিরে এসে নীড় রচনা করতে লাগল বৃক্ষশাখায়। প্রভাত, সন্ধ্যায় তাদের কূজনে মুখরিত হল বনভূমি। মৃগ, বরাহ, শশক ইত্যাদি বন্যপ্রাণীদের নির্ভয়ে বিচরণ করতে দেখা গেল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় বনবাসীরা জড়ো হয় জরিতার কুটিরপ্রাঙ্গণে।

ঋষি মন্দপাল এই সহজ সরল মানুষগুলির কাছে গল্পের ছলে বলে পূর্বাচার্য ঋষিদের কথা। সংসার ধর্মের কথা, শুদ্ধ জীবনচর্যার কথা শোনায় তাদের।

তৃপ্ত হৃদয়ে মানুষগুলি একে একে ফিরে যায় তাদের রাত্রির আশ্রয়ে।

পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করল মন্দপাল ও জরিতার পুত্র শৌনক। যথার্থই কান্তিমান এক দেবশিশু সে। সারাক্ষণ কুটিরটিকে ঘিরে তার আনন্দ-লীলা। পিতামাতার নয়নের মণি শৌনককে দেখে মন্দপালের মনে হয়, যে গৃহে শিশু নেই সে গৃহ মরুপ্রান্তরের মতো ঊষর, প্রাণহীন।

চৈত্র সন্ধ্যার চাঁদ উঠেছে দূর পাহাড় সংলগ্ন বৃক্ষের মাথায়। আলো এসে পড়েছে জরিতার পর্ণকুটিরের অঙ্গনে।

সেদিন চৈতি-পরবের আনন্দে মেতে উঠেছিল বনবাসীরা। তারা মাদল, ঢোলক আর বাঁশুরি বাজাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শালবন কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছিল চৈত্রের উদ্দাম হাওয়া।

মেয়েরা পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচছিল আর গাইছিল। পুরুষরা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এলে ওরা সরে সরে যাচ্ছিল দূরে। এমনই চলছিল উৎসবের আনন্দ-লীলা।

অঙ্গনে মন্দুরা বা মাদুর পেতে বসে উদিত চন্দ্রমার দিকে তাকিয়েছিল মন্দপাল। দূর থেকে কিন্নর কণ্ঠের একটা সুর তার কানে এসে বাজছিল। সেই সুরের ইন্দ্রজালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছিল মন্দপাল। হঠাৎ তার মনে হল চাঁদের জ্যোৎস্নামাখা পথ ধরে চন্দ্রলোক থেকে ধরিত্রীর বুকে কে যেন নেমে এল। সেই গৈরিকবসনা কেশবতী কন্যা এসে থমকে দাঁড়াল মন্দপালের কুটিরের অদূরে। হাতে দীর্ঘ শুভ্র এক যূথির মালা।

চমকে উঠল মন্দপাল! এ কার মূর্তি দেখছে সে।

সেই গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা রমণী কিন্তু দেখছিল ভিন্ন ছবি।

অঙ্গনের এক কোণে কৃষ্ণবর্ণের সুপুষ্ট একটি গাভী দাঁড়িয়ে আছে, তার ললাটে শ্বেতশুভ্র একটি চন্দ্র-চিহ্ন। শান্ত গাভীটির পাটল রঙের বৎস পরমানন্দে পান করছিল মাতৃদুগ্ধ।

দোহনপর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। হাঁটু মুড়ে তখনও বসেছিল জরিতা। তার কণ্ঠ বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিল ঝুঁটিবাঁধা এক দেবশিশু।

এই অপূর্ব দৃশ্য থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না আশ্রমকন্যা লপিতা। আজ সম্পূর্ণ রিক্ত আর শূন্য মনে হল নিজেকে। এ ছবি কখনও পূর্বে তার দৃষ্টিকে নন্দিত করেনি।

মন্দপাল মন্দুরার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। লপিতার দিকে তাকিয়ে তার সারা দেহ কম্পিত হচ্ছে কদলীপত্রের মতো। সে জানে লপিতার শক্তি অসীম, সে কাউকে অভিসম্পাত দিলে তার আর পরিত্রাণের উপায় থাকবে না।

মন্দপাল ভাবল, আমাকে অভিসম্পাত দিক লপিতা, কিন্তু তার কোপ থেকে যেন রক্ষা পায় আমার নিষ্পাপ শিশু আর তার জননী।

ততক্ষণে লপিতার হৃদয়ের সঞ্চিত জ্বালা একেবারে জুড়িয়ে গেছে। সে মায়া-মালিকার রজ্জুটি ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করল। হাঁটু ভেঙে বসল জরিতার মুখোমুখি। শিশু শৌনককে বুকে তুলে নিল। আদরে সোহাগে ভরে দিল তাকে। একসময় উঠে দাঁড়াল সে। চোখে অশ্রুধারা, নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার মুখ। বলল, মন্দপাল তোমার কাছে আমি হেরে গেলাম। এই স্বর্গীয় চিত্রটি দেখাবার জন্য আমি তোমার কাছে চিরঋণী থেকে গেলাম।

আর কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করে ফিরে দাঁড়াল লপিতা। সেই চন্দ্রালোকে পথ চিনে যেমন এসেছিল তেমনই নীরবে ফিরে চলল নিকুঞ্জ ভবনের দিকে।

ভবনপ্রান্তে পৌঁছে দেখতে পেল, পুষ্পিত মায়া-প্রেক্ষাটি ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে, তার চির সতেজ পুষ্পগুলি ম্লান, বিবর্ণ, বিশুষ্ক।

সব হারিয়েও কী যেন একটা আনন্দে বিভোর হয়ে রইল লপিতা। যে ছবি তার জীবনে সত্য হল না মন্দপালের জীবনে তা সত্য ও সাকার হয়ে উঠেছে। এই প্রাপ্তিটুকুই তার জীবনের সঞ্চয় বলে মনে করল সে।

একাল

পূজা উপলক্ষে বসেছিল গানের জলসা। সমবেত হয়েছিল ছাপ্পান্ন পল্লীর সভ্যবৃন্দ। পরিবার, পরিজন, নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায় পাঁচশত জনের সমাবেশ।

সংগীত পরিবেশন করলেন স্বনামধন্য গুণী গায়ক-গায়িকারা।

চৈতি বর্মণ নামকরা আবৃত্তিকার। তিনি প্রধানত তাঁর নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর কবিতা পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। তাঁর একটি সংগীত ও আবৃত্তি শেখানোর স্কুল আছে। 'কলধ্বনি' নামের স্কুলটি এখন বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নির্বাচিত কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে ওই প্রতিষ্ঠানে গান আর আবৃত্তি শেখানো হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংগীত পরিবেশন করল কলধ্বনির শিল্পীরা। মধ্যমণি হয়ে শিল্পীদের পরিচালনা করলেন চৈতি বর্মণ স্বয়ং।

সমাপ্তি-সংগীত হয়ে গেল। এবার সভাভঙ্গের পালা, কিন্তু কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে চৈতি বর্মণকে অনুরোধ জানালেন, তাঁর নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে।

চৈতির সৌন্দর্য তার চোখের চাহনি আর মুখের হাসিতে। কণ্ঠস্বরে এক ধরনের মাদকতা আছে।

বিদিশার নিশার মতো পিঠের ওপর ছড়ানো চুলগুলো ক্লিপ দিয়ে আটকানো। সালোয়ার কামিজে বয়স অনুমান করা শক্ত।

চৈতি বই হাতে নিয়ে আবৃত্তি করে না। যত দীর্ঘ কবিতাই হোক তা তার কণ্ঠস্থ। নিজের শুধু নয়, অন্যের সুদীর্ঘ কবিতা হলেও।

একজন নিমন্ত্রিত অতিথি মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল চৈতি বর্মণের দিকে। সে মেয়েটির দেহ ভঙ্গিমায় খুঁজছিল মডেলের নানা বৈশিষ্ট্য।

কোবিদ সেনশর্মা আর্ট কলেজের তরুণ প্রতিভাবান অধ্যাপক।

ছাপ্পান্ন পল্লির মঞ্চসজ্জা এবার পৌরসভার বিচারে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এই মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে এবার ছিলেন অধ্যাপক সেনশর্মা। তিনি এ অঞ্চলের বাসিন্দা না হলেও এক বন্ধুর অনুরোধে তিনি এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

দর্শকদের দিকে এবার তাকালেন চৈতি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তখন ছিল নিজের গভীরে। মেদহীন নিটোল যৌবন-মূর্তি।

'মেঘলাদিন। ধোপার কিশোরী কন্যা
কাপড় শুকোচ্ছে এলোমেলো হাওয়ায়,
মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে
গলে পড়ছে সূর্যের ওম্।

দুটো খুঁট ধরে বাহুতুলে
সে ছুটছে আলপথে,
হলুদ সরষে খেত ঢেউ তুলছে বাতাসে।
কোমরে টুক্‌টুকে ডুরে শাড়ি জড়িয়েছে সে।
এলো চুল এলোমেলো,—
সেও মেতে উঠেছে দম্‌কা হাওয়ার ছোঁয়ায়।

আজও দেখি সরষে ফুলের হলুদ খেত,
একটি মেয়ে ওড়াচ্ছে তার ওড়না,
জলছবি রঙ ডানা মেলে একটি প্রজাপতি
উড়ছে সেই উতল হাওয়ায়।
দর্শকদের দৃষ্টি ছুঁয়ে আছে
নর্তকীর সেই ভাসিয়ে দেওয়া ডানা
আর উড়িয়ে দেওয়া ওড়নায়।

শৈশবে দেখা সেই ধোপার মেয়েটি
আজও ওড়না ওড়ায়,
সূর্যের সোনাঝরা হলুদ সরষে খেতে।
তখন সে ছিল নীলাকাশ আর
মাটির সবুজ হলুদে,
এখন সে দূরদর্শন আর চলচ্চিত্রের
রুপোলি পর্দায়।

আবৃত্তি শেষে করতালিধ্বনি উঠল। নত হয়ে নমস্কার করল চৈতি বর্মণ।

উপহার পাওয়া গোলাপগুচ্ছ হাতে নিয়ে শিল্পী কোবিদ সেনশর্মা মঞ্চের উপর উঠে গেলেন। চৈতির দিকে সেই গোলাপগুচ্ছ এগিয়ে ধরে বললেন, উদ্যোক্তরা যা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন ভালোবেসে তা আপনার হাতে তুলে দিলাম পরমমুগ্ধ এক শ্রোতার নিবেদন হিসেবে।

সস্মিত হাসি হেসে মাথা নত করে সেই পুষ্পস্তবক গ্রহণ করলেন চৈতি বর্মণ। সুদর্শন শিল্পীর হাত থেকে গোলাপগুচ্ছ পেয়ে আবৃত্তিকারের চোখে মুখে ফুটে উঠল মুগ্ধতার ছবি।

সমবেত শ্রোতারা কবি আবৃত্তিকার চৈতি বর্মণ আর দক্ষ মঞ্চশিল্পী কোবিদ সেনশর্মার অপূর্ব যুগলবন্দিকে তারিয়ে উপভোগ করল। সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনি দিতে দিতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রস্থান করল তারা।

সম্পাদক মঞ্চে উঠে এসে চৈতি বর্মণকে বললেন, গাড়িতে সবাই উঠে বসেছে, আপনি এলেই গাড়ি ছেড়ে দেবে।

অধ্যাপক সেনশর্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার বাড়ির কাছ দিয়েই গাড়িটা যাচ্ছে, আপনি ইচ্ছে করলে এই গাড়িতে চলে যেতে পারেন। আর যদি কিছু সময় অপেক্ষা

করেন তাহলে প্রেসিডেন্ট নিয়োগী মশায়ের গাড়িটা এসে যাবে, তখন একা আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

চৈতি বললেন, আপনার অসুবিধে না হলে আসুন না আমাদের গাড়িতে।

মিষ্টি হেসে সম্পাদকের দিকে হাত নেড়ে চৈতির সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন শিল্পী সেনশর্মা।

প্রথম কথা শুরু করলেন চৈতি বর্মণ, তিনদিন আগে মঞ্চ পরিদর্শনের জন্য যে বিচারকরা এসেছিলেন আমি তাঁদের পাশেই ছিলাম। তাঁদের আলোচনা থেকে বুঝেছিলাম আপনার পরিকল্পনায় তৈরি মঞ্চটি তাঁদের দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। তখনই আমার মনে হয়েছিল আপনার পরিকল্পিত মঞ্চ যেকোনও একটি পুরস্কার পাবে। আজ উদ্যোক্তাদের ঘোষণা থেকে জানলাম, এই মঞ্চকে প্রথম পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। আপনার মঞ্চসজ্জা দেখে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম কিন্তু আপনার পুরস্কার প্রাপ্তিতে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে বোঝাতে পারব না।

অধ্যাপক সেনশর্মার হাউসিং-এর কাছে গাড়ি এসে গেল। চোদ্দতলা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং।

এবার নামতে হবে আমাকে। খুব আনন্দ পেয়েছি আপনার আবৃত্তি আর গান শুনে।

সেনশর্মা নামতে নামতে বললেন, একদিন আসুন না আমাদের 'নভোদীপ' বিল্ডিংয়ে, আমি একেবারে টপ ফ্লোরে চোদ্দতলার 'বি-ব্লকে' থাকি।

পথে নেমে দাঁড়ালেন শিল্পী। জানালা দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে চৈতি বলল, আসব, অবশ্যই আসব। আপনাকে পাওয়া যাবে কোন সময়?

রোববার সারাদিন গৃহবন্দি হয়ে থাকি। অন্যদিনগুলো অনিশ্চিত।

ফোন নাম্বারটা বলবেন?

শিল্পী ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে জানালা দিয়ে চৈতির হাতে ধরিয়ে দিলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল। চোখের আড়াল হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত দুদিকে দুটো হাত পতাকার মতো নড়ছিল।

শনিবার রাত নটা। চোদ্দতলার দক্ষিণমুখী এক চিলতে বারান্দায় বসে ঝড়ো হাওয়ায় গা জুড়োচ্ছিলেন কোবিদ। মাঝে মাঝে আঙুল চালিয়ে অবাধ্য চুলগুলোকে শায়েস্তা করছিলেন, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল।

হাত বাড়ালেই বন্ধুর মতো কোবিদের ফোনটা হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে। সে ফোনটা তুলে কানে ঠেকাল।

হ্যালো।

মেয়েলি মিষ্টি গলার আওয়াজ। আমি কি অধ্যাপক সেনশর্মার সঙ্গে কথা বলছি?

আমিই সেনশর্মা, আপনি?

সপ্তাহের শুরুতে ছাপ্পান্ন পল্লির পূজামণ্ডপে আমাদের দেখা হয়েছিল।

সোৎসাহে সেনশর্মা বললেন, আমি নিশ্চয়ই কবি চৈতি বর্মণের সঙ্গে কথা বলছি।

চৈতি বর্মণ সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলল, রবিবার কোনও একটা সময়ে কি কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে বিরক্ত করতে পারি?

আরে চলে আসুন, চলে আসুন। সকালের দিকে বন্ধু সমাগম, পাঁচটার পর পূর্ণ অবকাশ। ও সময়ে অসুবিধে না থাকলে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারেন।

ফোন নামিয়ে রাখার আগে চৈতি বললেন, সেদিন আপনার আঁকা কোনও ছবি কি আমি দেখতে পাব?

এমন একটা ছবি দেখাব যা আপনার খুবই চেনা।

ফোন ছেড়ে দিলেন দুজনেই। চৈতি ভাবতে লাগলেন, সেনশর্মা কী এমন ছবি এঁকেছেন যা আমি আগে দেখেছি!

শনিবার রাত থেকে রবিবার বিকেল পর্যন্ত এই কৌতূহলের কোনও সমাধান হল না।

চৈতি সুন্দরী, চড়া প্রসাধন কিংবা ডার্ক কালারের শাড়ি অথবা সালোয়ার কামিজে কখনও তিনি নিজেকে সাজিয়ে তোলেন না। সাদা বুটিদার সি-গ্রিন একটা ঢাকাই শাড়ি পরে সে ঢুকল লিফ্‌টে।

ক্যালিফোর্নিয়ান পপির হালকা মিষ্টি গন্ধ তার চুল থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে।

লিফটম্যানকে দেখতে না পেয়ে সে চোদ্দতলার বাটন পুশ করল।

স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে সুন্দর লিফ্‌টখানা। থামল এসে চোদ্দতলায়, একদম টপ ফ্লোরে।

লিফ্‌ট থেকে বেরিয়েই সামনে দেখল প্রফেসর সেনশর্মার নেমপ্লেট। শিল্পীসুলভ, বাহারি আঁকিবুঁকি।

বেলে আঙুল ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুলে গেল।

মিষ্টি হাসি হেসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন কোবিদ সেনশর্মা।

হাত জোড় করে প্রতি নমস্কার জানালেন চৈতি।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সেনশর্মা বললেন, কী সৌভাগ্য! একেবারে পাঁচটাতেই পদার্পণ হল।

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে নিঃশব্দ একমুঠো জুঁইফুলি হাসি ছড়িয়ে দিলেন সুন্দরী চৈতি বর্মণ।

শিল্পী সেনশর্মার মনে হল, পোশাক নির্বাচনে, রঙের ব্যবহারে চৈতি বিশেষ রুচির দাবি রাখেন।

পপির অতি মৃদু মিষ্টি গন্ধটুকু সেনশর্মা মনে মনে তারিফ করলেন।

বারান্দার গ্রিলভরে রাধাঝুম্‌কো লতা বেগুনিরঙের ফুল ফুটিয়েছে। মুখোমুখি বসার আসন দুটি বেতের তৈরি, একটা এগ্‌জিবিশন থেকে কেনা।

বেতের মোড়ায় বসার পর চৈতি বর্মণ বলল, সত্যি একেবারে শিল্পীর বাড়ি।

কোবিদ বললেন: সন্ধ্যায় যখন বারান্দার বাতিটা জ্বলে উঠবে তখন উলটোদিকের দেওয়ালে পুষ্পকন্যাদের অপূর্ব ছায়ানৃত্য দেখবেন। কিন্তু...

উৎসুক দৃষ্টিতে কোবিদের মুখের দিকে তাকিয়ে চৈতি বললেন, কিন্তু কী?

আপনার মিষ্টি গলার একখানা গান দিয়ে আজকের আসরের উদ্বোধন হোক।

অবশ্যই গাইব, তবে আপনি ছবি দেখাবেন না?

হাসলেন কোবিদ, ফোনের কথাটুকুও আপনি ভোলেননি দেখছি। বলতে পারেন গানের সঙ্গে যেমন সঙ্গত, কবিতার সঙ্গেও আমি শিল্পের একটা সঙ্গত ঘটানোর চেষ্টা করছি। ছবি এঁকেছেন, দেখি দেখি!

ওটা হবে আপনার উপহার। তার আগে দুটো ঘটনা ঘটবে।

বিস্ময়ভরা চোখে কোবিদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন চৈতি।

প্রথমে বারান্দায় হালকা মৃদু আলোটা জ্বালা হবে। দেওয়ালে আমরা রাধাঝুম্‌কোর ছায়ানৃত্য দেখব। এইভাবে আজ সন্ধ্যার সম্মানীয় অতিথিকে বরণ করা হবে। তারপর অতিথি একটি সংগীত পরিবেশন করবেন। এরপর সম্মানীয় অতিথির দ্বারা চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন।

কোবিদের কথামতো দশ মিনিট নীরবে বসে বারান্দার দেওয়ালে রাধাঝুম্‌কোর ছায়ানৃত্য দেখা হল। চৈতি বলল, একেবারে তাপস সেনের ম্যাজিক!

এবার নিভিয়ে দেওয়া হল বারান্দার বাতি। চাঁদের আলোয় চরাচর স্বপ্নময়।

কোবিদ বললেন, এবার একটি উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করবেন সুগায়িকা, কবি চৈতি বর্মণ।

সংগীত পরিবেশনে কখনও কোনও বাহানা থাকে না চৈতির।

সে শুরু করল রবীন্দ্রনাথের একটি সংগীত দিয়ে।

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর-সুন্দর হে সুন্দর॥
আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর সুন্দর হে সুন্দর॥
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর॥'

গানের সুর বাতাসে ভর করে জ্যোৎস্নালোকে ভেসে যাচ্ছিল। আর গানের বাণী বাজছিল শিল্পীর হৃদয়ে।

গান থামলে কোবিদ বললেন, সুর নেই আমার কণ্ঠে তাই আজ সন্ধ্যার শিল্পীকে আমি গুরুদেবের গানের কথা দিয়েই বরণ করতে চাই।

শুরু করলেন কোবিদ, কণ্ঠটি আবৃত্তির উপযোগী।

'মোর—সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।

এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ গহন-সন্ধ্যাকুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।'

আবৃতির শেষে উঠে দাঁড়ালেন শিল্পী সেনশর্মা। ঘরের ভেতরে ঢুকে সুন্দর চিত্রিত একটি পেয়ালা নিয়ে এসে চৈতির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই পেয়ালায় আপনার জন্য রেখেছি শরতের একমুঠো শিউলি। কবির সন্ধ্যাকুসুমমাল্য না হলেও এই ফুলের ভেতর শরতের সুগন্ধ মিশে আছে। মালাটা আপনি স্বয়ং গেঁথে নিতে পারেন।

প্রাণভরে ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে কোবিদের দিকে তাকিয়ে চৈতি বললেন, আজ সন্ধ্যায় এই উপহারটুকু পেয়ে আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে মনে করছি। ফুলের সঙ্গে এই পেয়ালাটা কি আমি নিয়ে যেতে পারি?

কোবিদ বললেন, ওটি এখন আপনার সম্পত্তি, ইচ্ছে করলে আপনি অবশ্যই নিয়ে যেতে পারেন।

ফুলগুলো সযত্নে একটা পলিব্যাগে ভরে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন। সঙ্গে সেই চিত্রিত জাপানি পেয়ালাটিও।

সেনশর্মার দিকে তাকিয়ে চৈতি বললেন, এবার আপনার ছবি দেব যে।

কোবিদের ফ্ল্যাটটা বেশ প্রশস্ত। পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটকে সে মনোমতো করে ভেঙেচুরে গড়ে নিয়েছে। ভেতরে একটা বড় হলঘরে তার আর্ট-গ্যালারি। সেখানে সমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত বহু ছবি শিল্পীর রং তুলি প্লেট ক্যানভাসের মধ্যে বিরাজ করছে।

সেখানেই চৈতিকে নিয়ে গেলেন কোবিদ।

এ যে চোখের উৎসব। ছবিগুলো যেন কথা বলে উঠেছে, কেউ বা কথা বলতে চাইছে। অঙ্গলীলায় নয়নবিভঙ্গে এক আশ্চর্য উচ্চারিত নীরবতা।

কোবিদ প্রায় দশখানা ছবি দেখালেন যেগুলি বিড়লা আর্ট গ্যালারির এগ্‌জিবিশনে যাবে।

তার শকুন্তলা সিরিজের ছবিগুলি এক বিত্তবান কিনে নিয়েছেন। প্রদর্শনীতে ছবিগুলির পাশে দাম বসানো ছিল, লোকটি প্রায় তিন লক্ষ টাকা দিয়ে সবকটা ছবি কিনে নিয়েছে।

পরে লোকটির সঙ্গে আলাপে বসে তাঁর মনে হল, একেবারে ঠকে গেছেন তিনি।

বিশাল ব্যবসাদার নতুন বাড়ি সাজাবেন বলে কিনেছেন দামি ছবিগুলো কিন্তু শকুন্তলার কাহিনি সম্বন্ধে ভদ্রলোক একেবারে অনভিজ্ঞ।

ভাব না জেনে যারা শুধু রং আর চেহারা দেখে ছবি কেনে তাদের ওপর কোনও শ্রদ্ধাই থাকে না আসল শিল্পীর।

সব শেষে অন্য একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন শিল্পী সেনশর্মা। সেখানে একটিমাত্র ছবি দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে, ছবিটি নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ।

দিগন্ত ছুঁয়ে প্রসারিত সরষে খেত যেন আনন্দে হিল্লোলিত হচ্ছে। একটি মেয়ে খেতের ভেতর দিয়ে ওড়না উড়িয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে ছুটে আসছে।

মুগ্ধ হয়ে ছবিটা দেখতে দেখতে একটু দূরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন চৈতি বর্মণ। এ কার ছবি!

কয়েকদিন আগে মঞ্চে বলা তার কবিতাটি অবিকল রূপ পেয়েছে এই ছবিতে। শুধু তাই নয়, নিবিষ্ট হয়ে চৈতি দেখলেন, তাঁর অবিকল আদলটি ফুটে উঠেছে এই ছবির মধ্যে।

শিল্পী সেনশর্মার দক্ষতার প্রথম পরিচয় সে পেয়েছিল মণ্ডপসজ্জায়। কিন্তু এই ছবিতে তাঁর মনের যে স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তার ভেতর অনেক অকথিত কথা ফুটে উঠেছে।

তার লেখা কবিতাকে গভীরভাবে ভালো না বাসলে ছবিতে তা এমন করে ফুটিয়ে তোলা যেত না। তিনি শুধু তার কবিতাকেই ভালোবাসেননি, সঙ্গে সঙ্গে কবিকেও ভালোবেসে ফেলেছেন। নইলে অবিকল তার ছবি কী করে ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠল।

চোখদুটি আধবোজা, মুখে মুগ্ধতার হাসি, শিল্পীর দিকে মুখ ফেরালেন কবি চৈতি বর্মণ।

চলে আসার সময় কোবিদ তাঁর নতুন পাওয়া বান্ধবী চৈতিকে উপহার দিলেন তার সদ্য আঁকা ছবিটি। বললেন, এ আপনারই ছবি, আপনাকে দিলাম।

কিন্তু আপনার কাছে এ ছবির কোনও কপি তো রইল না।

হেসে বললেন শিল্পী কোবিদ সেনশর্মা, এ ছবি মনের গভীরে আঁকা হয়ে আছে, কোনও দিনও হারাবে না।

গাড়িতে কবি আর তার ছবিকে তুলে দিয়ে শিল্পী বললেন, পুনরাগমনায় চ।

আরও দুটো ঋতুপর্ব পার হয়ে গেল, কোবিদ ও চৈতির সাক্ষাৎকারে কোনও ছেদ পড়ল না। দিনে দিনে হৃদয়ের বড় কাছাকাছি আসতে লাগল দুজন।

শনিবার ঠিক রাত এগারোটায় রং তুলির কাজ সেরে, খাওয়ার পাট চুকিয়ে বারান্দার আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে বসে কোবিদ।

দক্ষিণ শহরপ্রান্ত থেকে উত্তরমুখে ছুটে আসতে থাকে হাজার রকমের যানবাহন। অন্ধকারে দেখা যায় না তাদের অবয়বগুলো। শুধু ঝাঁক ঝাঁক চলমান নক্ষত্র ওভার ব্রিজ থেকে আলোর ফুল্‌কি ছড়াতে ছড়াতে স্রোতের মতো শহরের মুখে ঢুকে পড়ে। তারপর মূল প্রবাহ থেকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। সিন্ধুর পঞ্চসখীর মতো আলোর নদীগুলো প্রবাহিত হতে থাকে।

এ দৃশ্য বহুবার দেখা, তবু প্রতি রাতেই নতুন এক আকর্ষণ হয়ে দেখা দেয় শিল্পী কোবিদের চোখে।

শনিবার রাত সোয়া এগারোটায় ফোন বেজে ওঠে। যন্ত্রচালিতের মতো হাত চলে যায় ফোনে।

কানে ঠেকিয়েই কোবিদ বলে, তোমার রোববারের কবিতার জন্য অপেক্ষা করে আছি, যা তুমি পড়ে শোনাবে তোমার সুরেলা কণ্ঠে।

ওপার থেকে ভেসে এল উত্তর, যদি শুধু গান শোনাই?

সে তো প্রতি রোববারের পাওনা। পাওনার ওপর সুদটাই তো মিঠে। সে তোমার স্বরচিত কবিতায় কণ্ঠদান।

কত দিন চলবে এ পর্ব?

'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।'

চৈতি বলল, রাখছি।

কোবিদ : এখন কী রাজকার্য?

ফাংশান সেরে দশ মিনিটও হয়নি ফিরেছি। সোয়া এগারোটার ঘরে কাঁটা ছুটছে দেখে ফাংশানের পোশাক না ছেড়েই ফোন তুলেছি।

কোবিদ : সরি, তোমার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য।

চৈতিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই লাইনটা কেটে দিল কোবিদ।

পরদিন সন্ধ্যায় যথারীতি আবির্ভাব চৈতি বর্মণের।

দরজার ভেতরে কি-লক্‌টা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে কোবিদ বেল বাজার অপেক্ষায়!

বাইরে বেল বাজল, অমনি খুলে গেল দরজা। কোবিদের ভেতরের খুশি উপচে পড়ল তার চোখে।

যে কোনও ঋতুই হোক জুঁইফুল ঝরাবেই চৈতি। হাসিতে খুশির জুঁই।

এখন অতিথিকে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায় কোবিদ সেনশর্মা। চৈতি অসংকোচে খুশি হয়ে সে হাত ধরে ঢুকে আসে ঘরের ভেতর।

মুখোমুখি সেই দুটি বেতের মোড়ায় বসে, কোবিদ অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি পেতে রাখে।

চৈতি তার ব্যাগ থেকে সেদিনের একটি কবিতা টেনে বের করে এনে কোবিদের হাতে দিয়ে দেয়।

কোবিদ নিবিষ্ট হয়ে এক ঝলক কবিতাটিতে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর কবির হাতে সেটি তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে আবিষ্ট শ্রোতার ভূমিকায় বসে থাকে।

চৈতি জানে, এবার তাকে তার স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করতে হবে। তবু পাঠের আগে সামান্য একটি প্রস্তাবনা সে জুড়ে দেয়,—

এ কবিতাটিতে আছে দুজনের কথা কিন্তু এর ভেতর দিয়ে আমরা পাব বিশ্বজোড়া প্রেমিকের হৃদয়ের উচ্চারণ। আপনজনকে একান্ত করে পাওয়ার দুর্লভ একটি মুহূর্ত। এখানে সব প্রেমিকাই নীলাঞ্জনা, যার চোখের অঞ্জনে স্বপ্নময় নীলের ছোঁয়া। আর আকাশ বহু দূরে থেকেও নেমে আসতে চাইছে মর্তকে ছুঁতে। আকাশমাটির মিলনের আকাঙ্ক্ষাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি এই কবিতায়।

কৃপণের ধন

বাতাসে সুরের একটা ঢেউ তুলে
পাখিটা হাউইয়ের মতো
উঠে গেল আকাশের নীল ছুঁতে।
চলার পথে নীলাঞ্জনার কণ্ঠ
গুনগুনিয়ে ওঠে।
লিফ্‌টের বোতাম টিপে
সে উঠে যায় চোদ্দতলার আকাশ ছুঁতে।
কলিং বেলে আঙুল ছোঁয়াতেই
দরজা খুলে যায়।
সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ।
তার প্রসারিত হাতে হাত রাখে নীলাঞ্জনা।
এখন নীড়ের উত্তাপে দুটি পাখি,
প্রতীক্ষার অবসান।
এক চিলতে বারান্দায় বসে ওরা আকাশ দেখে।
হাতের আঙুলগুলো খেলা করে চলে,
শব্দহীন ভাষার প্রবাহ।

দুজনেই কর্মরত ছ'দিনের ছকে।
নীলাঞ্জনা গান শেখায় কলধ্বনিতে,
আকাশ আর্ট কলেজের তরুণ অধ্যাপক।
পাঁচ বছরের পরিচয়
তবু ঘর বাঁধেনি ওরা।
কৃপণের ধনের মতো
ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে ওদের ভালোলাগা,
সপ্তাহান্তে একটি রবিবারের কৌটোয়।

পড়া শেষ হলে কোবিদ হাত বাড়িয়ে বলল, আমাদের কৃপণের ধনটুকু আমার কাছেই গচ্ছিত থাক।

চৈতি কবিতাটা তার ভালোবাসার মানুষের হাতে তুলে দিয়ে বলল, তোমার রঙের জগৎ থেকে আমার কি কিছু প্রাপ্য নেই?

মোড়া ছেড়ে উঠল দুজনে। অদর্শনের ছ'দিন রং তুলি নিয়ে কী খেলা খেলেছে কোবিদ তাই দেখার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে চৈতি।

প্রতি সপ্তাহে মূল একটা রং বেছে নেয় কোবিদ। সেই রঙেরই প্রাধান্য থাকে তার সবকটা ছবিতে। মূলরঙের চারদিকে সে ছড়ায় সমধর্মী রংগুলো। সে এক নয়নাভিরাম খেলা।

সেগুলি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে করতে রং প্রয়োগের বিজ্ঞানটা আজকাল কিছু কিছু ধরতে পারে চৈতি বর্মণ।

ছবি সম্বন্ধে চৈতি আজকাল দু'একটা মন্তব্যও করে। কোবিদ বলে, আমার ছবি আঁকা সত্যিই সার্থক হয়েছে। আমার রং প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি ধরতে পারছ।

চৈতি কাব্য করে বলে, একবিন্দু শিশির যখন ধানের শিষের ওপর পড়ে তখন তাতে রং থাকে না, সূর্যের আলোটি তাকে ছুঁয়ে দিলেই সে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুর রং ছড়ায়। আমার চোখের শিশিরে তোমার পাঠানো রবির আলো এসে পড়েছে, তাই আমি চিনতে পেরেছি ইন্দ্রধনুর রং।

এখন দুজনে অনেক নিবিড়, অনেকটা ঘনিষ্ঠ।

যেদিন ওরা বারান্দা থেকে দেখতে পেল অদূরে একটা পার্কে বড় বড় কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছে লাল হলুদ ফুল ফুটে কোকিলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, আর ফুলের জলসায় কালো মুখখানা বাড়িয়ে আকুল হয়ে কোকিলটা ডেকে চলেছে তার সঙ্গীকে, ঠিক সেই মুহূর্তটিকে একান্ত কাছে পাওয়ার মুহূর্ত বলে ভেবে নিল কোবিদ। সে হঠাৎ চৈতির ডান হাতখানা নিজের দু হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে বলল, আমরা কি আরও একটু নিবিড় হতে পারি না। একই আশ্রয়ে কি দিনযাপন হতে পারে না আমাদের? ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের বিরহী কোকিলটার মতোই কি আমাদের বিচ্ছিন্ন থেকে পরস্পরকে আকুল আহ্বান জানিয়ে যেতে হবে?

চৈতি নিবিড় হয়ে তাকাল কোবিদের মুখের দিকে।

বলল, আমার দেহমন তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উন্মুখ নয় যদি বলি তাহলে মিথ্যে বলা হবে। তবু আমাদের প্রেমে যাতে স্বপ্নভঙ্গ না হয় সেজন্য আমাদের দূরে থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে মিলনে আমার কোনও বাধা নেই তবে প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র বোঝাপড়ার ভেতরে আমি চাই না আমাদের প্রেম মলিন হোক।

ছ'দিনের বিরহ যন্ত্রণা সপ্তম দিনের মিলনকে মধুর গভীর আর আবেগে পূর্ণ করুক—এই কামনা।

কোবিদ বলল, আমি তোমার সকল শর্তেই সম্মত।

চৈতি বলল, আমাদের এই সহবাস বা মিলনের একটা নির্দেশিকা থাকবে।

প্রথম : আমরা কেউ কারও অতীত সন্ধান করব না। বর্তমানের অনুরাগকেই সত্য বলে মেনে নেব। তোমার ছবি আর আমার গান হবে আমাদের মিলনের সূত্র।

দ্বিতীয় : যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন আমরা ছ'দিন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব, কেবল রবিবার সন্ধ্যা থেকেই রচিত হবে আমাদের মিলনবাসর। সোমবার প্রভাত থেকে সপ্তাহের চক্রে আবার আবর্তন।

তৃতীয় : আমার মতে এই শর্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূণ। আমরা কোনও ভাবেই আমাদের সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করব না। চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের এই ইচ্ছার ক্ষেত্রে নানারকম সাহায্য করতে পারবে।

চতুর্থ : কোথাও স্বামী-স্ত্রী বলে আমরা নিজেদের পরিচয় দেব না। সর্বত্র আমরা বন্ধু আর সহযোগী হিসেবে পরিচিত হব।

পঞ্চম : আমরা অসুস্থ হলে উপযুক্ত নার্স এবং ডাক্তারের ওপর নির্ভর করব।

ষষ্ঠ : রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার প্রভাত পর্যন্ত যে সময়টুকু তা শুধু আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে সেখানে অন্য কারও প্রবেশের অধিকার থাকবে না।

সপ্তম : বছরে তুমি দুবার ছুটি পাবে। সে দুবার আমরা দুজনে বাইরে গিয়ে পূর্ণ ছুটি উপভোগ করব। একবার সমুদ্র হলে অন্যবার যাব অরণ্য পাহাড়। সে দিন রাত্রিগুলো একসঙ্গে থেকে পূর্ণ উপভোগ।

এখানে এসে চৈতি বর্মণের শর্তে ছেদ পড়ল।

কোবিদ বলল, আর কোনও শর্ত নেই?

তোমার যদি কিছু থাকে বল?

কোবিদ : তোমার শর্তেই আমি রাজি। এইভাবেই আমরা সারাটা জীবন কাটিয়ে যেতে পারব।

চৈতি অমনই বলল, প্রসঙ্গটা যখন উঠল তখন বলি, আরও একটি শর্ত থাকবে আমাদের। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও দিক থেকে বন্ধন ছিন্ন করার শর্ত। কোনও কারণ না দেখিয়েই।

কোবিদ কিছু সময় ভাবল, তারপর বলল, সময় মানুষকে দেহে মনে পঙ্গু করে দিতে পারে, সেখানে বিকৃতদর্শন, অসুস্থ মনস্ক কোনও নরনারীকে আগলে রাখার কোনও অর্থই হয় না। যত বেদনাদায়কই হোক সে সময় যে কেউ সরে যেতে পারে। একে আমরা নিষ্ঠুরতা বলে ভাবব না, মনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে ভেবে নেব। আমরা অর্থ উপার্জন করব, ভালো নার্সিংহোমের দরজা সবসময় বিত্তবানের জন্য খোলা। সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার থেকে ভালো মেডিক্যাল হেল্‌প পাওয়া যাবে।

চৈতি বলল, নিষ্ঠুর মনে হলেও যথার্থ একটি শর্ত তুমি যোগ করলে। আমি রাজি।

কোবিদ জানতে চাইল, কবে থেকে শুরু হবে আমাদের মিলনবাসর?

চৈতি বলল, কোনও দিনক্ষণ বা পঞ্জিকা দেখে নয়, শুরু হোক না আজ সন্ধে থেকে। তোমার ফ্লাওয়ার ভাসে রাখা রজনীগন্ধা গন্ধ ছড়াচ্ছে। আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপস্থিতি। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া। এর চেয়ে মধুলগ্ন আর কী হতে পারে।

কোবিদ বলল, অবাক ব্যাপার, গতকালই আমি একটা ছবি শেষ করেছি, সেই ছবির উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেই আমরা আমাদের আজকের রাতটা স্মরণীয় করে রাখব।

ওরা দুজনে উঠে গেল কোবিদের দক্ষিণমুখী শোওয়ার ঘরে।

কোবিদ বলল, ওখানে খোলা স্যুটকেসের ভেতর মণিপুরি ডাবল বেড-কভার আছে, সেটা নিয়ে নেবে। বক্সখাটের ড্রয়ারে আর সবই পেয়ে যাবে। আঁকার ঘরে ফুলে ভরা

কৃষ্ণচূড়ার ডালে কোকিল আর কোকিলার মধু মিলনবাসর রচিত হয়েছে। সে ছবিটা শোওয়ার ঘরে এনে রেখ।

একথা বলেই কোবিদ বলল, আজ বাসরসজ্জার দায়িত্ব তোমার, আমি 'বেদুইনে' যাচ্ছি নৈশ ভোজ্যবস্তুর অন্বেষণে।

শনিবার নিউমার্কেট থেকে নির্বাচিত কিছু ফুল কিনে এনেছিল কোবিদ। সেই ফুলে সুন্দর করে সাজানো ছিল ঘরগুলো।

এমন প্রতিদিনই সাজানো থাকে কোবিদের ঘর।

শিল্পী বলে অগোছালো থাকে না ওর ফ্ল্যাট। ও শিল্পী মনেপ্রাণে, আচারে-অনুষ্ঠানে।

চৈতি একটা প্রস্তাব দিল, আজ যত সামান্যই হোক আমরা কি কিচেনে দুজনের খাওয়ার তৈরি করে নিতে পারি না? হোক না অস্থায়ী সংসার, শুরুর দিনটা হোক না সংসার ধর্মের নিয়ম মেনে।

কোবিদ ফ্রিজ খুলে দেখে বলল, সব কিছুই আছে। ডিম, আরামবাগের ড্রেস করা চিকেন, ফ্রাইয়ের জন্য মাছের ফিলে।

ওদিকে আলু, পটল সব সবজিই মজুদ। রোববারটা রান্নার মাসিকে ছুটি দেওয়া হয়। শনিবার সে সবই গুছিয়ে রেখে যায়।

সোৎসাহে চৈতি বলল, তুমি স্টাডিতে ঘণ্টাখানেক বই নিয়ে বসো, আমি তারই মধ্যে ডিনার তৈরি করে ফেলব।

ঘণ্টা দেড়েক স্টাডিতে বন্দি থাকতে হল কোবিদকে, এর ভেতর রান্না আর ঘর গোছানোর কাজ সাঙ্গ হল চৈতির।

ডিনারে বসল দুজনে, নিজেদের প্রয়োজনমতো খাবার তুলে নিয়ে খেল।

বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ওরা ঠিক রাত দশটায়। ঘর সাজানোয় নৈপুণ্য আছে চৈতির।

এগ্‌জিবিশন্ থেকে মণিপুরি বেডকভারটা কিনেছিল কোবিদ। গাঢ় হলুদ রঙের জমিনের দুপাশের বর্ডার সাদা সুতোয় কাজ করা হয়েছে। কতরকম যে বেডকভার রয়েছে বাজারে তার ইয়ত্তা নেই।

কোবিদ বলল, আমার স্টকে সাতরঙের নানা অঞ্চলের বেডকভার রয়েছে সাতদিনের জন্য। সাতদিনের জন্য সাতখানা নানা অঞ্চলের নানা আকৃতির ফ্লাওয়ার ভাসও রয়েছে। এগুলো ভ্রমণের সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।

মনে মনে কোবিদের রুচির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হল চৈতি।

দরজায় লম্বা ঝোলানো পর্দাগুলো পাটের সুতোয় তৈরি। অতি হাল্‌কা মেঘছায়া রঙের ওপর লম্বা লম্বা সাদা সুতোয় ডিজাইন করা বরফির কাজ। জানালার সব পর্দাই হালকা ক্রিম, বর্ডারে সম্বলপুরি ডিজাইন।

ঘরের মাঝখানে একটা পিলার ছাদটা ধরে রেখেছে। পিলারটার চারদিক ধবধবে শ্বেতপাথর দিয়ে মোড়া। ওপর দিকে রাজস্থানি কাজ।

এ ঘরে আগে কোনওদিন আসেনি চৈতি বর্মণ। সে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। ওই তো একটা অপূর্ব ওড়িশার ভাস্কর্য-মূর্তি দরজার ওপরের দেওয়ালে সাঁটা।

যে মূর্তিটা আর্ট বইতে দেখা যায়। প্রেমিক তুলে ধরেছে প্রেমিকার মুখ, মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রেমিকা চেয়ে আছে প্রেমিকের মুখের দিকে। এই ভাস্কর্য অনন্তকাল ধরে শোভা পাচ্ছে ওড়িশার মন্দিরগাত্রে। প্রেম যে মৃত্যুহীন, তারই প্রতীক ফুটে উঠেছে এই অপরূপ ভাস্কর্যের ভেতর দিয়ে।

চৈতির মনে হল কোবিদ আত্মভোলা শিল্পীর পর্যায়ে পড়ে না। ওর সমস্ত সত্তায় শিল্প। পরিশীলিত শিল্প ভাবনায় ওর সমস্ত চেতনা সমৃদ্ধ। ও সামান্য অকিঞ্চিৎকর বস্তুটিকেও শিল্প ভাবনায় রূপ দিয়ে আনন্দ পায়। কোবিদের প্রতিটি আচরণে, এমনকী অঙ্গ সঞ্চালনেও পরিশীলিত একটি চরিত্রের সন্ধান মেলে।

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথির ঝকঝকে চাঁদটা আটকে আছে শিমুলের ডালে। আলোর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভেসে যাচ্ছে কোবিদের বেডরুম। কাজ করা মিহি পর্দা আটকাতে পারছে না চাঁদের উজ্জ্বল আলো। তার ওপর ফাগুন হাওয়ায় উড়ছে পর্দার হাল্‌কা কাপড়।

দুজনে দাঁড়িয়েছিল। একজন দরজার পাল্লা ধরে অন্যজন জানালার গরাদ। আড়চোখে কোবিদ দেখছিল চৈতির অবাধ্য চূর্ণ চুলগুলো হাওয়ার ছোট ছোট ঝলকে উড়ছে। সে নির্নিমেষ চেয়ে আছে পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর দিকে।

এখন উৎকর্ণ হয়ে উঠল কোবিদ। সুর উঠেছে চৈতির কণ্ঠে।

'বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিনী উঠে বাজি বেদনাতে।।
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা অধীর অদর্শন তৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে।।
সুদূরের সুগন্ধধারা বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন সুরে তালে মর্মরে পল্লব জালে,
বাজে মম মঞ্জীর রাজি সাথে সাথে।।'

অপূর্ব, তোমার কণ্ঠটি আজ যেন নতুন সুরে বাজছে। আরও আরও ইচ্ছে করছে গান শুনতে কিন্তু তার থেকেও বড় বেশি ইচ্ছে করছে তোমাকে কাছে পেতে।

বন্ধুদের মতে কোবিদের স্ট্রাকচারটা অসাধারণ। কেউ কেউ বলে, মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড। সারাদেহে নির্মেদ বলিষ্ঠতা, মুখ চোখে কিশোরের সারল্য। মাথায় ঘন চুল, ফরসা মুখে সামান্য দাড়ি।

কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ও স্পর্শ করেছে চৈতির কটিদেশ। রোমাঞ্চিত চৈতি সম্মোহিত চোখে একবার ওর দিকে তাকাল।

দরজা জানালার পাল্লা বন্ধ হল। সর সর করে টানা হল পেলমেট থেকে ঝোলানো ভারী পর্দাগুলো। বাসর-জাগানি মেয়েদের মতো চাঁদের আলো খুশিতে বাইরে লুটোপুটি খেতে লাগল।

অতি ভোরে উঠে পড়া চৈতির চিরদিনের অভ্যেস। সে পরিধান আর প্রসাধনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। যাওয়ার আগে কোবিদের ডান হাতখানা অঞ্জলিতে তুলে ধরে চুম্বন করল। মুগ্ধ মেদুর দৃষ্টি।

সেই মুহূর্তে একটি কথা বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল কোবিদ সেনশর্মার। সে তার হাতের হীরে বসানো আংটিটা খুলে পরিয়ে দিল চৈতির অনামিকাতে।

বিস্মিত অভিভূত চৈতি বলল, এত দামি আংটিটা তুমি আমায় দিয়ে দিলে!

তুমি তার চেয়েও অনেক দামি জিনিস এই মুহূর্তে আমায় উপহার দিয়েছ।

দরজা খুলে লিফ্‌টের কাছে এগিয়ে গেল চৈতি বর্মণ। পেছন থেকে কোবিদ বলল, সেই রবিবারের কৌটোর দিকে তাকিয়ে আমার ছ'টা দিন কী করে কাটবে?

লিফ্‌টের ভেতর ঢুকে চৈতি মিষ্টি হেসে বলল, এই শর্তেই তো আমরা বাঁধা।

এখন আর আর্ট কলেজের আনা মডেল দেখে শরীরবিদ্যা শেখার আগ্রহ আসে না কোবিদ সেনশর্মার। রোববার রাতের অনেকটাই সে কেড়ে নেয় চৈতির বিশ্রামের সময়টুকু থেকে। মনে মনে এই ভেবে তৃপ্তি পায় কোবিদ, এমন একটি নিখুঁত মডেল পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। নগ্নতা যে এত সুন্দর, এত বাঙ্ময় তা অনুভব করতে করতে ইজেলের ওপর সাঁটা সাদা ক্যানভাসে ড্রইং ফুটে উঠতে থাকে। এমনই নানা ভঙ্গির কয়েকখানা ছবি নিয়ে কোবিদ রং তুলির জাদু সৃষ্টি করে।

ছ'দিন পরে রোববার ঘরে ঢুকেই চৈতি আগে ছোটে কোবিদের স্টুডিয়োতে। তার ন্যুড ছবিগুলোকে শিল্পী কী অসাধারণ দক্ষতায় ভেনাসের সৌন্দর্য দান করেছে তা দেখে সে অভিভূত হয়। তারপর মনে প্রশান্তি নিয়ে সে ফিরে এসে বসে বারান্দায় কোবিদের মুখোমুখি।

কোবিদ বলে, ছবিতে নিজেকে চেনা যাচ্ছে?

আমি কি এতটাই সুন্দর, না তুমি আমাকে তোমার তুলিতে এত সুন্দর করে গড়ে তুলেছ?

তোমার রূপকে যথার্থ ফুটিয়ে তুলতে পারলে আমি তো বিশ্বকর্মা হয়ে যেতাম।

পরে রবীন্দ্রনাথের গানের একটা কলি উচ্চারণ করে বলে,

"একটুকু ছোঁয়া লাগে
একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী।"

পরক্ষণে আবার বলে, শর্ত মেনে কাজ করতে হয়, এটাই আমার আপশোস। সাতদিন কাছে পেলে মডেলকে ভেঙেচুরে গড়তাম।

চৈতি বলে ওঠে, তাহলে সৃষ্টিতে ছন্দপতন ঘটত। মডেল হয়তো আরও পারফেক্ট হত কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা হত না।

একটু আগে যে কবিতাটা উচ্চারণ করেছিল কোবিদ, সেটা গেয়ে শোনাল চৈতি। বলল, ওই একটু দেখা, একটু ছোঁয়া, একটু পাওয়া না পাওয়াতেই সৃষ্টির কুসুম ফুটে ওঠে। মনে মনে ফাল্গুনী রচনা তখনই সম্ভব হয়।

আজকাল এগ্‌জিবিশনে ওর বন্ধুরা অবাক হয় নতুন মডেলের কাজ দেখে।

কেউ কেউ জানতে চায়, এ মডেল তুই পেলি কোথায়?

পরিহাস করে কোবিদ বলে, বিশ্বকর্মা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন।

কেউ কেউ জানতে চায়, প্রেমিকা না প্রেয়সী?

কোবিদ কিন্তু ভেঙে কিছু বলে না, কেবল রহস্যময় হাসি হেসে বন্ধুদের আরও অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

চৈতিকে নিয়ে ষড়ঋতুর ছবি আঁকল শিল্পী সেনশর্মা। আর্ট ক্রিটিকদের দারুণ তারিফ পেল সে। দু'একটা নামকরা কাগজ তাদের শিল্পলোকে ঋতুপর্বের দু'একটা ছবি ছেপে প্রকাশ করল।

একটা গাছের ডালে পাতার আড়ালে সূর্যের তাপ থেকে মাথা বাঁচিয়ে বসে আছে কাকটা। তার দুটো ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে তৃষ্ণায়। গাছের তলায় কুয়ো থেকে জল তুলে আদিবাসী মেয়েটি স্নান সেরেছে। ভেজা কাপড়ের ওপর ফুটে উঠেছে তার আশ্চর্য যৌবন। সে গাছতলায় ঘটটা বসিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে কখন কাকটা গাছ থেকে নেমে ঘড়াভর্তি জলে ঠোঁট ছোঁয়ায়। ছবির তলায় লেখা 'তৃষ্ণা'। দুজনেই চাইছে তৃষ্ণার শান্তি।

পাশের ছবি ঋতুবর্ষার। এখানে ভরা যৌবনে আদিবাসী মেয়েটি ঝড়ো হাওয়ায় চুল উড়িয়ে ছুটছে। কালো মেঘের সঙ্গে আশ্চর্য মিল তার একরাশ কালো চুলের। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার ঊর্ধ্বঅঙ্গের বাস। উড়ন্ত কাপড় সামলাতে হবে সে হুঁশ নেই তার। ঝড়ের সঙ্গে, মেঘের সঙ্গে খেলায় মেতেছে সে।

বর্ষাঋতুর মেয়েটির সঙ্গে আদলে আশ্চর্য মিল গ্রীষ্মঋতুর কন্যাটির।

কাশফুল, শিউলি আর সাদা মেঘ ছাড়া তৈরি হয় না শরতের আবহ। আঁকাবাঁকা সৈকতিনী নদীর জলে দু'টুকরো সাদামেঘ তাদের প্রতিবিম্ব দেখছে। দীর্ঘ তীর জুড়ে লম্বা সাদা কাশ দোলাচ্ছে চামর। মাথার একরাশ চুল চূড়ো করে বাঁধা, তাতে শিউলি ফুলের মালা জড়ানো। একখানা হলুদ ডুরে শাড়ি পরে মেয়েটি দুহাতে কাশফুল সরিয়ে ছুটে আসছে। মুখের হাসিতে লেগেছে শরতের রোদ। দুচোখে আনন্দের ঝিকিমিকি।

মডেল এক হলেও শরতের কন্যাটি গৌরাঙ্গী—লাবণ্যময়ী।

তার গাওয়া অনুচ্চারিত একটি গানের কলি আমরা যেন কান পেতে শুনতে পাচ্ছি,—

'শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গারে হৃদয়
আনন্দগান গারে।।'

প্রদর্শনীতে রাখা মন্তব্যের খাতায় কেউ যেন লিখে রেখে গেছে,—

'শরতের কন্যাটি কি শিল্পীর মানসলোক বিহারিণী?'

মন্তব্যের লেখক তার নাম রেখে যায়নি। লেখাটি কোনও মহিলার হস্তলিপি বলে মনে হয়।

পরের চিত্রদুটি হেমন্তঋতুকে কেন্দ্র করে।

প্রথম চিত্রটি ধূসর অস্পষ্ট এক নারীর কায়া। কুয়াশার বস্ত্রে জড়ানো তার সর্বাঙ্গ। সে সাদা ঘোমটায় মুখ ঢেকে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে দিগন্তের দিকে। এ ছবিতে শুধু কুয়াশার একটা অবয়ব। চোখমুখের স্পষ্ট কোনও আকার নেই।

হেমন্তের অন্য ছবিটি দীপান্বিতার।

কুটিরটি সুসজ্জিত দীপান্বিতার দীপে। আঁচল আড়ালে প্রদীপখানি নিয়ে যে মেয়েটি চলেছে, তার মুখ উজ্জ্বল আলোর ছটায়। সুকল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি।

একজন মন্তব্যের খাতায় লিখে গেছেন,—'কল্যাণী গৃহবধূ'।

এই মন্তব্য নিয়ে রবিবাসরে কোবিদ আর চৈতি খুব উপভোগ করেছিল।

চৈতি বলেছিল, তুমি আমাকে শেষপর্যন্ত দেখছি কল্যাণী বধূ করে ছাড়লে।

কোবিদ বলল, মন্তব্যটা কিন্তু আমার নয়।

ছবিটা তো তোমার। শিল্পীর ভাবনাই ছবিতে রূপ পেয়েছে।

আমি ভাববার কে, যাঁর রচিত গীতবিতান, সঞ্চয়িতা তিনি বিশ্বের সমস্ত ভাবনার সঞ্চয় রেখে গেছেন সেখানে। সেখান থেকেই ভাবের একটি কণা তুলে এনে অক্ষম হাতে রূপ দেবার চেষ্টা। এই মেয়েটিকে কবি নাম দিয়েছেন হেমন্তিকা। হিমের রাতে সারা গগনের দীপকে আঁচল ঘিরে গোপন করে রেখেছে সে। এখন ডাক দিয়ে বলছে, 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,... সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে'।

অবশ্য এই ছবি আমি পেয়েছি তোমার কণ্ঠে গাওয়া হেমন্তের গান থেকে।

পরের পর্ব শীতের।

একঝাঁক মেয়ে শীতের চাদরে গা ঢেকে সোনালি ধানের আঁটি মাথায় বয়ে আনছে।

সারা ফসলের মাঠ জুড়ে যেন ধ্বনিত হচ্ছে একটা আহ্বান বাণী,—

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয়রে চলে, আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়॥
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে—
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
মরি হায় হায় হায়॥'

এবার কোবিদ বলল, এ গানটিও আমার প্রিয়ার কণ্ঠ থেকে শোনা, আজ যে আমার সকল সৃষ্টির প্রেরণা।

উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে চৈতি বলে, জানি না আর কতদিন আমি আমার শিল্পীর কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকতে পারব।

ও কথা বলো না, তোমার সংগীতই আমাকে ঋতুপর্বের ছবিগুলি আঁকার প্রেরণা দিয়েছে।

যেদিন তুমি গিয়েছিলে বসন্তের কমলবনের গান সেদিনই আমি এঁকেছিলাম আমার ক্যানভাসে একটি সার্থক ছবি। তোমার সংগীতটি ছিল এরকম,—

'আজি কমলমুকুল দল খুলিল, দুলিল রে দুলিল—মানস সরসে রসপুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।।

গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—
নিখিল ভুবনমন ভুলিল।
মন ভুলিল রে মন ভুলিল।।'

হালকা নীল জলের তরঙ্গে ফুটে আছে সহস্রদল কমলগুলি। তাদের ঘিরে শোভা পাচ্ছে চক্রাকার পদ্মপত্র। মুক্তোবিন্দুর মতো ছোট বড় কয়েকটি জলবিন্দু টলমল করছে সেই পদ্মপত্রে। সেই সরোবরে নেমেছে ভরন্ত যৌবনা এক কন্যা। তার সমস্ত নগ্ন অঙ্গরেখায় প্রায় ফুটন্ত পদ্মের সুষমা। পদ্মের ভেতর থেকে তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাচ্ছে না। তার কুঞ্চিত কেশগুলো মুখখানাকে ঘিরে একটা বিভ্রম সৃষ্টি করছে। মনে হচ্ছে, পদ্মকে ঘিরে ভ্রমরের খেলা।

এরপর রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী কবিতা অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলি এককথায় অসাধারণ।

বোদ্ধা দর্শকদের অভিমত,—বিজয়িনী সিরিজের কন্যাটি শিল্পীর একান্ত অন্তরঙ্গ জন, তাছাড়া কখনও এ ধরনের চিত্র আঁকা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত কবিতাটি একদিন ভরন্ত কণ্ঠে কোবিদকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল চৈতি।

মুগ্ধ হয়ে কবিতাটি শুনছিল শিল্পী। বিস্ময়কর কয়েকটি ছবি ফুটে উঠছিল তার চোখের সামনে।

নগ্নতা যে এতখানি সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত হতে পারে সেদিন তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল শিল্পী কোবিদ সেনশর্মা।

কবিতাটি যতক্ষণ আবৃত্তি করে শোনানো হচ্ছিল ততক্ষণ শিল্পী চোখ বন্ধ করে প্রত্যক্ষ করছিল একটা চলমান বর্ণময় চিত্র।

আবৃত্তি শেষ হলে শিল্পী চোখের সামনে দেখল, বিজয়িনীর মূর্তিতে আবৃত্তিকার স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ চেয়ে রইল শিল্পী, দেখে যেন তার আর আশ মেটে না।

কী দেখছ এমন করে?

তোমাকে দেখছি আর কবিতার কথা ভাবছি। তুমি যেন কবিতার সেই মূর্তিমতী বিজয়িনী।

সত্যই চৈতির চোখের উদ্ভাসে প্রেমের দেবতা মদনকে পরাস্ত করার ছবিটি ফুটে উঠেছিল।

এবার চৈতির কাছে প্রস্তাব রাখল কোবিদ, কয়েকটা ছবিতে সে বিজয়িনীকে ফুটিয়ে তুলতে চায় যদি চৈতি তাকে সাহায্য করে।

সহাস্যে বলল চৈতি, কবে আমি তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি কোবিদ?

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কোবিদ বলল, এ এক বিরল অনুভূতি, একে যথার্থ রূপ দিতে পারলে দেখো আমার ছবি নিয়ে চারদিকে শোরগোল পড়ে যাবে।

চৈতি গভীর গলায় বলল, এই কবিতার ভাব আমার অনুতে পরমাণুতে সঞ্চারিত হয়ে আছে, বিজয়িনীর সত্তায় রূপান্তরিত হতে আমার বিশেষ কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন হবে না।

একটু থেমে আবার বলল চৈতি, তোমার চেতনায় যখন মূর্তিমতী হয়েছেন বিজয়িনী তখন কালবিলম্ব না করে কাজ শুরু করে দাও। আগামী সপ্তাহ দুয়েক বাইরে আমার কোনও প্রোগ্রাম নেই। তোমার দরকার হলে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তোমার স্টুডিয়োতে থাকতে পারি।

শুরু হল কাজ।

স্টুডিয়োতে কাজ শুরুর প্রথম সন্ধ্যায় কবিতাটি আবার সম্পূর্ণ আবৃত্তি করল চৈতি বর্মণ। ধীরে ধীরে সমস্ত স্টুডিয়ো রূপান্তরিত হয়ে গেল কবিতার ভাব-রূপে।

'অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লব শয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে, কপোত দম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

প্রথম ক্যানভাসে ফুটে উঠছিল নবীন বসন্তের বর্ণময় একটি ছবি। পুষ্পিত চম্পকের ডালে চঞ্চুচুম্বনরত কপোত কপোতীর একটি অবয়ব।

অরণ্যের কোলে একটি সরোবর। শ্বেতশিলা নির্মিত স্নানের ঘাট। সোপানগুলি স্বচ্ছ সরোবরের জলে নেমে গেছে।

এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পর্দা সরিয়ে স্টুডিয়োতে এসে দাঁড়াল সূক্ষ্ম নীলাভ ঢাকাই মসলিনে অঙ্গ ঢেকে লীলাবতী চৈতি বর্মণ।

শিল্পী নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল কতক্ষণ তার মডেলের দিকে।

নির্বিকার মুখচ্ছবি। লীলাভরে কেশদাম ছড়িয়ে দিল পৃষ্ঠদেশে।

ঈষৎ নত হল সে, সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ল তার সূক্ষ্ম বসন শ্বেত শিলাতলে।

'তীরে, শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত গৌরব
অনাদৃত—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে আয়ু পরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে। নূপুর রয়েছে পড়ি,
বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।

নগ্নদেহে অতি সম্ভ্রান্ত আচরণ করে চলেছে চৈতি বর্মণ। কামনার কোনও চিহ্নই নেই তার চোখেমুখে। অত্যন্ত সাবলীল স্বাভাবিক তার আচরণ।

স্নানের আগে সে খুলে ফেলল তার পায়ের নূপুর, খুলল বক্ষের নিচোলবাস, শেষে ত্যাগ করল মেখলা।

সামনে দেখা যাচ্ছে,—

'পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গন রাশি। সরসীর
প্রান্তদেশে বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেতশিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিত স্বচ্ছ নীরে—বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ 'পরে, কহিতেছে বারংবার
স্নেহের প্রলাপবাণী—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশবিভোল।

কী আশ্চর্য সাবলীল অভিনয় করে চলল চৈতি বর্মণ! সত্যই মনে হল আবক্ষ জলে বসে সে তার নগ্নবাহুপাশে ঘিরে ধরেছে সযত্নপালিত শ্বেত রাজহংসটিকে। আদরে সোহাগে ভরে দিচ্ছে তাকে। উচ্চারণ করছে স্নেহের অর্ধস্ফুট প্রলাপবাণী।

এরপর অন্য একটি ক্যানভাসে চলে গেছে কোবিদ। সেখানে বসন্তের বনভূমির মাঝে একটি বকুলতরুতে হেলান দিয়ে বসে আছে প্রেমের দেবতা পুষ্পধনু। মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে তরুণীর স্নানলীলা। তার পাশে পড়ে আছে পুষ্পশরেভরা তূণীর।

ওই পুষ্পশর যার বক্ষ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হবে তাকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে প্রেমের দেবতা মদনের কামনার পাশে।

'মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু 'পরে
প্রসারিত পদযুগ নব তৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতীমাল্য কুঞ্চিত কুন্তলে
গৌর কণ্ঠতটে—সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনীসুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে, ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ নয়ন মৃগ—বসন্ত পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

এর পরের ক্যানভাসটি আঁকতে পুরো তিনদিন লেগেছিল শিল্পী কোবিদের।

চৈতি বর্মণ শুদ্ধাচারে নিজেকে শান্ত স্থির রাখার জন্য তার ইষ্টদেবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল। তার অন্তরের তপস্যা ছিল, কামনাকে জয় করতে হবে প্রার্থনার দ্বারা। সে মনে মনে ভেবেছিল, সে অরণ্য বিহারিণী সভ্যতার সংস্কারমুক্ত এক আদিম মানবী। সভ্যতার নির্মোক সে খুলে ফেলেছে। নগ্ন দেহে স্নান করে উঠে এসেছে সে শীতল পার্বত্য প্রবাহিণীর ধারায়।

এবার আমরা যাব বিজয়িনীর আর এক রূপ বর্ণনায় যেখানে বিশ্বের সমস্ত কামনা তিলোত্তমার মূর্তি ধারণ করেছে।

সৌন্দর্য যখন সংযম নিয়ে আসে তখন সে রূপমাধুরীকে কোনও কামনাই স্পর্শ করতে পারে না।

এখন বিশ্বকবির ভাবনায় সেই রূপটিকে আমরা ফুটে উঠতে দেখব। আর আশ্চর্য দক্ষতায় সেই রূপটিকেই নিজের দেহে ফুটিয়ে তুলল মডেল চৈতি বর্মণ।

শিল্পী ধ্যানের দৃষ্টিতে তার মডেলের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ।

'জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া

সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী—
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দি হয়ে আছে, তারই শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার, সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া
অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া।'

এমন সপ্রাণ সৌন্দর্য-প্রতিমা সেদিন মুগ্ধ চোখে কেবল দেখেছিল শিল্পী কোবিদ সেনশর্মা।

পরিকল্পনাটি ছিল অতি নিখুঁত।

জানালার পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সূর্যের সোনালি রশ্মি ঢুকে পড়েছিল সেই বাতায়নপথে।

শিল্পীর নিখুঁত মডেলটি স্নান সেরে এসে দাঁড়িয়েছিল জানালার একটু তফাতে।

অবিকৃত নগ্ন সৌন্দর্য-প্রতিমা বিজয়িনী কবিতাটি যেন মূর্তিমতী হয়েছিল সেই মুহূর্তে। পিঠের ওপর চৈতি ছড়িয়ে দিল তার কুঞ্চিত কেশপাশ।

সে এমন বিভঙ্গে দাঁড়িয়েছিল যেখানে তার যৌবনের শিখরে শিখরে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল। ললাটে, অধরে, নগ্ন উরুর উপর, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়, যুগলবাহুতে জলসিক্ত দেহের বিন্দুতে বিন্দুতে। সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দেহের উন্নত রেখাগুলি।

বাতাসের ছোঁয়ায়, আলোর উত্তাপে শুষ্ক হয়ে গেল চৈতির সিক্ত দেহ। চ্যুত বসনের মতো পায়ের তলায় লুটিয়ে রইল তার ছায়াখানি।

এবার প্রতিমার থেকে চোখ ফিরিয়ে ক্যানভাসের ওপর তাকে রূপ দিতে লাগল শিল্পী।

এর পরের দিন শুরু হল বিজয়িনীর শেষপর্বের চিত্ররূপ।

সেই নগ্ন সৌন্দর্য দেখে মোহাবিষ্ট পুষ্পধনু তরুতল থেকে উঠে দাঁড়াল। এখন সমাগত সেই ঈপ্সিত লগ্ন। প্রেমের দেবতা তার সম্মোহনী পুষ্পধনুতে শরযোজনা করে পায়ে পায়ে অগ্রসর হতে লাগল সেই নিরাবরণা সৌন্দর্য প্রতিমার দিকে।

এ কী! এমন কামনাহীন নিরাসক্ত সংযত সৌন্দর্য এর আগে কখনও দেখেনি প্রেমের দেবতা মদন।

এ যে কামনার কলঙ্ক স্পর্শহীন দেবী প্রতিমা!

যাকে জয় করবার জন্য এসেছিল কামদেব, তার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

চরণে সমর্পণ করল পুষ্পশরগুলি পূজা উপচাররূপে।

এবার শান্ত প্রসন্ন মুখে বিজয়িনী তাকাল বিশ্বজয়ী পরাভূত প্রেমের দেবতা পুষ্পধনুর দিকে।

এই আশ্চর্য মুহূর্তের চিত্রগ্রহণ যেদিন শেষ হল সেদিন বিজয়িনী চৈতি বর্মণের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে চিত্রকর তার প্লেট, ব্রাশ, তুলি নিবেদন করল পূজা উপচাররূপে।

পূজার দিনগুলিতে যেমন শুদ্ধ দেহমনে পূজার্থিনীরা দেবীর চরণে শুদ্ধাচারে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে, ঠিক তেমনই আহারে বিহারে চিন্তায় পরিপূর্ণ শুদ্ধ সংযত জীবন অতিবাহিত করেছিল চৈতি। তাই ছবিগুলিও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। শিল্পীও তৃপ্ত হয়েছিল তার অনবদ্য শিল্পসৃষ্টিতে।

কয়েকদিন ধরে তারা দুজনে বসে ছবিগুলি দেখছিল আর আনন্দের অনুভূতিতে মগ্ন হয়েছিল।

একসময় চৈতি বলে উঠল, দেখো এই সিরিজের ছবিগুলো তোমাকে স্মরণীয় করে রাখবে।

আমি যদি সম্মানিত হই তাহলে ভাবব সে সম্মান তুমিই আমাকে এনে দিলে।

বন্ধুরা যদি বলে এই মডেলটি তুই কোথা থেকে সংগ্রহ করলি? বলব, এ আমার অন্তরবাসিনী। মানস- প্রতিমা।

কিন্তু প্রদর্শনীর সময়ে এক তরুণী মডেলটিকে প্রায় চিনে ফেলেছিল।

উদ্বোধনের দিন ক্যাসেটে একটা গান বাজছিল,—গানটি বহুশ্রুত হলেও ছবির প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত।

'তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি॥
নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই—আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

নাহি জানে, কেহ নাহি জানে—
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি॥

এগ্‌জিবিশন হলে ঢুকে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তরুণীটি উৎকর্ণ হয়ে গানটি শুনছিল। সপ্তাহ তিনেক আগে এই গানটি তাদের গেয়ে শুনিয়েছিল চৈতিদি। বলেছিল, শিগ্‌গির ক্যাসেটটা বেরোবে। তাহলে দেখছি বেরিয়ে গেছে। সংগ্রহ করতে হবে।

তার চেয়ে দু'এক বছরের বড়ই হবে চৈতিদি। সুবিনয় রায়ের প্রিয় ছাত্রী। এখন রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর স্কুল খুলেছে 'কলধ্বনি'।

সৌন্দর্য কথাটা যেন চৈতিদির জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সুন্দর দেহভঙ্গিমা, তেমনই অপূর্বসুন্দর কণ্ঠস্বর। সেই স্বর, মাধুর্য এনে দিয়েছে তার গানে এবং আবৃত্তিতে।

এবার সে ঢুকল ছবি দেখতে। একক প্রদর্শনী শিল্পী কোবিদ সেনশর্মার।

দুরন্ত রেখার টানে অসাধারণ কয়েকটা স্কেচ। উড়ন্তপাখির নানা ভঙ্গির স্কেচ। ছুটন্ত ঘোড়ারও নানা বিভঙ্গ। জলের ভেতরে পলাতক মাছের ঝাঁক।

তারপর বিভিন্ন ঋতুর আশ্চর্য রঙিন সব ছবি। দর্শকরা অধ্যাপক সেনশর্মার ছবিগুলি মগ্ন হয়ে দেখছিল আর মন্তব্য করছিল।

হলঘর সংলগ্ন আর একটি মাঝারি আকারের ঘর। ঘরটির দরজার ওপরে একটি দেওয়াল জোড়া প্যানেল। বসন্তের বনে পলাশ ফুটেছে। কালো ছাই আর সাদা রং মেশানো ডালগুলোতে কল্কার আকারে লাল কমলা রঙের থোকা থোকা পলাশ ফুল। সেই অপূর্ব কুসুমসজ্জার ফাঁকে একটি কালো কোকিল উঁকি দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, সে গান শুরু করেছে পঞ্চমতানে।

ঢুকলেই একটা সুন্দর পোস্টারে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'। তার তলায় নীল তুলির আঁচড়ে একটি নারীর ন্যুড ছবি।

এরপর দেওয়ালের বাঁ দিক থেকে ছবিগুলো শুরু হয়ে সমস্ত ঘরের দেওয়াল বেস্টন করে ডানদিকে শেষ হয়েছে।

বেশ কয়েকখানা ছবি বড় বড় ক্যানভাসের ওপর আঁকা।

প্রতিটি ছবির ওপরে বিজয়িনী কবিতার বিশেষ বিশেষ অংশ ছেপে বোর্ডের ওপর আটকানো রয়েছে। এতে ছবিটি বোঝার সুবিধে হবে দর্শকদের।

সত্যিই অপার বিস্ময়ে ভরা ছবিগুলি। ধ্যানমগ্ন না হলে কোনও শিল্পীর পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব নয়।

সব থেকে বিস্ময় বসন্ত-প্রকৃতির বর্ণময় চিত্ররূপে নয়, যে নিরাবরণা নারী সরোবরে স্নানলীলা করে চলেছে—তাকে ঘিরে।

প্রমাণ সাইজ ছবিগুলিতে মডেলের অ্যানাটমি একেবারে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

সর্বোপরি নারীর সৌন্দর্য ও সংযমের এমন মহিমান্বিত রূপ দর্শকদের একেবারে সম্মোহিত করে রাখে।

নারীর আনন্দময় অবগাহন, শুভ্র রাজহংসকে বাহুপাশে জড়িয়ে জলক্রীড়া, দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

স্নানের পূর্বে শিলাতটে পোশাক উন্মোচন, বিকারহীন দৃষ্টিতে নিরাবরণার স্নান সেরে উঠে আসা—এই ছবিগুলি যেমন তীব্রভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তেমনই মুহূর্তে হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলে শ্রদ্ধায়।

ক্রমে প্রচণ্ড ভিড় জমে যেতে লাগল। ছোট ছোট এক একটি গ্রুপ বহুক্ষণ ধরে ছবি দেখছে, এক ক্যানভাস থেকে অন্য ক্যানভাসে দৃষ্টি সরাতে সময় লাগছে তাদের।

নয়নমন ভরে ছবিগুলি দেখে বেরিয়ে আসতে প্রায় সোয়া ঘণ্টা সময় লেগে গেল চৈতির গানের স্কুলের ছাত্রী—বিহুর।

কেবল ছবি দেখার গভীর তৃপ্তি নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি বিস্ময়!

এ কার ছবি সে দেখল? অবিকল চৈতিদির অবয়ব। সেই সস্মিত মুখ, ইঙ্গিতবহ চাহনি। আর সেই অবাক করা দেহভঙ্গিমা।

ন্যুড ছবিতে রেখাগুলি আরও স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

বাইরে এসে বারান্দার এক নিভৃত কোণে সে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

এ কী করে সম্ভব! মডেলের কাজ করে চৈতিদি! তার চলনে বলনে আচরণে রোজ যে ভাবটি প্রকাশ পায় তার সঙ্গে এতখানি অমিল এই ন্যুড ছবিগুলোর!

শিল্প হিসেবে প্রতিটি ছবিই রসোত্তীর্ণ। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওই শিল্পলোকের ছবিগুলি সে মেলাতে পারল না।

না, তার অনুমান মিথ্যা নয়, তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবও নয়। চৈতিদির বাঁ নাকের তলার তিলটিও বসাতে ভোলেননি শিল্পী।

এমন কালো কুঞ্চিত কেশ, এমন ঘন টানা ভুরু যেন চৈতিদিরই একান্ত নিজস্ব।

কিন্তু চৈতিদির মুখে পরিচিত বহু মানুষের গল্প শুনলেও কখনও শোনেনি শিল্পী কোবিদ সেনশর্মার নাম।

হঠাৎ যেন অজানা নক্ষত্রলোক থেকে এক টুকরো আলোর রশ্মি এসে পড়ল। ছাপ্পান্ন পল্লির উৎসবের দিন শিল্পী কোবিদ সেনশর্মাই তো একগুচ্ছ ফুল স্টেজের ওপরে এসে চৈতিদির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তারা সবাই যখন গাড়িতে ফিরছিল তখন অধ্যাপক সেনশর্মাও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি নেমে গিয়েছিলেন 'নভোনীল' অ্যাপার্টমেন্টের সামনে।

চৈতিদি তো থাকেন দক্ষিণ কলকাতার একটা লেডিজ হস্টেলে।

এমন হাসিখুশি খোলামেলা স্বভাবের মানুষ কী করে এতখানি নিজেকে গোপন করে রাখতে পারে!

একবার ভাবল, একান্তে প্রশ্নটা তুলবে চৈতিদির কাছে। সংগোপনে বলবে, তোমার এগ্‌জিবিশন দেখে এলাম গো চৈতিদি।

কী রি-অ্যাকশন হয় দেখবে সে। কী উত্তরই বা পাওয়া যায়!

একদিন গানের ক্লাসের শেষে বিহু বলল, আমি আজ তোমার সঙ্গে ফিরব চৈতিদি।

চৈতি বর্মণ অবাক হয়ে বলল, তুই তো যাবি বেহালা, আমি যাব গড়িয়াহাট। আমার সঙ্গে ফিরবি কোথায়?

বিহু হেসে বলল, চৈত্র শেষের সেল টানছে। কয়েকটা জিনিস কেনার আছে গড়িয়াহাট থেকে।

ও তাই বল। বেশ চল্, আমারও সঙ্গী পাওয়া গেল।

চৈতিদি বাসে ট্রামে না গিয়ে চলো না, একটা রিকশা করে যাই।

তুই কি খেপেছিস? এতখানি দূর রিকশা করে যাব? পনেরো মিনিটের পথ পুরো একঘণ্টা লাগিয়ে দেবে। তাছাড়া এগলি-সেগলির ভেতর ঢুকে শর্টকাট করবে। ধকল সওয়া কি কম কথা!

এবার আব্দার ধরল বিহু, আমি তোমাকে আজ নিয়ে যাব, চলো না দিদি। কলকাতা থেকে আদ্যিকালের এই যানটাকে তুলে দিচ্ছে, শেষ স্বাদটুকু উপভোগ করি চলো।

তোর পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই।

দূরে একটা গলিতে রিকশার মালিককে রিকশার ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। ওরা এগিয়ে গেল সেইদিকে। দরদাম করে উঠে বসল।

রিকশাওয়ালাকে খুব একটা ক্ষীণজীবি বলে মনে হল না। সে বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে তাল রেখে গলি ধরে ছুটছিল।

বিহু বলল, ভাই পথঘাট ভালো নয়, আমাদের অত তাড়া নেই, তুমি একটু ধীরেসুস্থে চলো।

রিকশাওয়ালা বাধ্য, হিসেবিও। সে ভাবল, শ্রম একটু কম হবে। তাছাড়া অটোর দাপটে আজকাল সওয়ারি পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে এবার ধীরে ধীরে টেনে চলতে লাগল।

বিহু শুরু করল তার কথা, কাল একটা এগ্‌জিবিশন দেখে এলাম, এক কথায় অপূর্ব।

কোথায়?

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে।

চৈতি বলল, ওখানে তো প্রায়ই এগ্‌জিবিশন হয়। বেশ কয়েকদিন আগে ওখানে আমিও একটা এগ্‌জিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম।

কার?

একজনের নয়, অনেকজনের। সুব্রত চৌধুরী, অনুপ রায়দের গোষ্ঠীর পাঁচসাতজন শিল্পী দেবী শক্তির ওপর ছবি এঁকেছিলেন। দারুণ সব ছবি!

বিহু বলল, আমি যে এগ্‌জিবিশনটা দেখেছি সেটা একজন শিল্পীর আঁকা।

চৈতির চোখে বিস্ময়ের ঘোর, একজন শিল্পী, পুরো একটা হল ভরিয়ে ফেললে!

শুধু একটা 'হল' না, তার সঙ্গে একটা মাঝারি সাইজের ঘরও ছিল।

এরপর কিছু বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলেই ফেলল চৈতি, শিল্পীটি কে?

শুনেছি আর্ট কলেজের এক প্রফেসর, নাম—কোবিদ সেনশর্মা।

চৈতির গলার স্বরটা এবার যেন একটু কেঁপে গেল, কেমন দেখলি?

মুখে বলা যাবে না দিদি! মরি বিস্ময়ে! মরি বিস্ময়ে!!

চৈতি বলল, দয়া করে ভণিতা ছাড়। সহজ করে বলে ফেল, কী দেখলে? কেমন দেখলে?

বিহু আবার ভণিতা করল, আহা কি দেখিলাম, জন্মে জন্মান্তরেও ভুলিব না।

বিহুর পিঠে একটা চাপড় মেরে চৈতি বলল, সত্যি করে বল, কী দেখলি?

সত্যি করে বলব?

তবে কি মিথ্যে করে বলবি?

এবার পাশে বসা চৈতির পিঠটাকে জড়িয়ে ধরে বিহু বলল, তোমাকে দুচোখ ভরে দেখলাম গো চৈতিদি। এত সুন্দর তোমাকে আমি কখনও দেখিনি।

কী যা তা বলছিস?—স্বরে জোর ছিল না চৈতির।

প্রথমে শুনলাম, তোমার নতুন বেরিয়েছে যে ক্যাসেটখানা তার গান,— 'তুমি কি কেবলই ছবি'। তারপর মাঝারি ঘরখানাতে আমার বিজয়িনী দিদিটাকে দেখলাম।—বলেই আরও জোরে জড়িয়ে ধরল চৈতি বর্মণকে।

ধরা পড়ে গিয়ে মুখে ভাষা নেই চৈতির।

বিহু বলল, তোমার ওই সুন্দর তিলটি পর্যন্ত আঁকতে ভোলেনি শিল্পী।

আবছা অন্ধকারে একটা গর্তে টাল খেল রিকশাটা।

হুমড়ি খেয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পেল দুজনে। কিছুক্ষণ কথায় বিরতি।

দেশপ্রিয় পার্কের উত্তরে রিকশাটাকে থামিয়ে ওরা নেমে পড়ল।

বিহু বলল, এবার পায়ে হেঁটে যেতে তোমার কি খুব কষ্ট হবে চৈতিদি?

চৈতি বলল, কিছু যদি কিনিস তাহলে এখানে নামাই ভালো। এখান থেকে দোকানপাট দেখতে দেখতে একেবারে গড়িয়াহাটে পৌঁছে যাব।

আব্দারের গলায় বিহু বলল, তোমার আরও একটু সময় নেব চৈতিদি।

তোর পাল্লায় যখন পড়েছি তখন সহজে যে ছাড়া পাব না তা বোঝা হয়ে গেছে।

চল একটু পার্কে বসি।

ওরা পার্কের এককোণে গিয়ে বসল, সবুজ গাল্‌চের মতো ঘাসের জমিনে।

'প্রিয়াতে নতুন কী একটা বই এসেছে মাইকে তারস্বরে একটা গান বাজছে। আলো ঝলমল সন্ধ্যালগ্ন।

নির্বাক চৈতিবর্মণ। সে প্রতীক্ষা করছে কোন দিক থেকে আসে বিহুর বাণ। এ যেন ফাঁকা প্রান্তরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যাধ ও হরিণী। অব্যর্থ লক্ষ্য ব্যাধ ধনুতে আগেই তির যোজনা করে বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে সম্মোহিত হরিণী যেন পালাতেই ভুলে গেছে।

আধো আলোর আবছায়ায় চৈতির একটা হাত তুলে নিল বিহু। বলল, তোমার সঙ্গে আমার বয়সের বড় একটা তফাত নেই চৈতিদি। তুমি আমাদের গান আর আবৃত্তি

শেখানোর গুরু। তাহলেও তুমি আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পার। তোমার অতীত বর্তমান, ঘর-সংসারের কথা আমরা কিছুই জানি না। তোমার ব্যক্তিত্বের জন্য তোমাকে সে সব প্রশ্নও করিনি কোনওদিন। শুধু তোমার প্লিজিং পারসোনালিটির জন্য আমরা তোমাকে ভালোবেসেছি।

একটু থেমে আবার বলল, আজ তোমার হৃদয়দুয়ার একটু খুলবে কি? আমাকে এই সন্ধ্যায় তোমার আপনজন বলে ভেবেই নাও না।

কোনও ভণিতা না করে বেশ পরিষ্কার গলায় চৈতি বলল, তুই শিল্পী কোবিদ সেনশর্মা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাস তো?

বিহুর আধবোজা চোখ দুটোতে পাশের একটা ল্যাম্পপোস্টের আলোর ছোঁয়া এসে লেগেছিল। সেখানে একটা কৌতূহল জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে স্থির হয়েছিল।

চৈতি বেশ স্পষ্ট গলায় বলল, তোকে আমি বিশ্বাস করি বিহু, আশা করি তুই আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবি।

বিহু চৈতির ধরে থাকা হাতটাতে চাপ দিয়ে জানিয়ে দিল, সে কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

চৈতির গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ, আমি আর কোবিদ পরমবন্ধু বিহু।

বিহু বলল, ছবিগুলো দেখেই তোমাদের গভীর বন্ধুত্বের আঁচ পেয়েছি আমি। তোমার নগ্ননারীদেহের ছবিগুলো কিন্তু আমাকে টলাতে পারেনি, আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সেই ঘরে ঢুকে তোমার আর শিল্পীর আশ্চর্য খেলা দেখছিলাম। তোমার ওই ন্যুড মডেলগুলো না দেখলে তুমি যে এতটা সুন্দর তা জানতেই পারতাম না। আর শিল্পী কোবিদের তুলির টান, রঙের খেলা তোমাকে যেন স্বপ্নের নারী করে তুলেছিল। কেউ কেউ মন্তব্য করছিল, অসাধারণ সৃষ্টি, নিজের একান্তজন ছাড়া কোনও মডেলই নিজেকে এমনভাবে উন্মুক্ত করতে পারে না।

একটু থেমে আবার শুরু করল, তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার গর্বের সীমা ছিল না চৈতিদি। আমি ভাবছিলাম, যে কোনও শক্তিমান সুন্দর পুরুষই তোমার জন্য পাগল হয়ে যেতে পারে।

চৈতি বলল, আমরা কেউ কারও জন্য পাগল নই, কিন্তু আশ্চর্য এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আমরা দুজনে বাঁধা পড়ে আছি। সে বাঁধন অটুট বিশ্বাসের বাঁধন।

কী রকম? তোমরা পরস্পরকে যে ভালোবাস তা জেনেছি, কিন্তু সংসার রচনা করতে চাও না?

না, পরস্পর জড়িয়ে থাকার ভেতরে একটা শর্ত আমরা করে নিয়েছি।

শর্ত, কী রকম?

চৈতি বলল, সপ্তাহের শেষ দিন রবিবার সন্ধ্যাটুকু আমরা দুজনে একসঙ্গে কাটাই। ও আমার গান আর কবিতা শোনে। আমি ওর স্টুডিয়োতে ঢুকে ওর আঁকা সারা সপ্তাহের ছবি দেখি। আর ওর দরকার হলে আমি মডেলের কাজ করি। বিশ্বাস কর তখন কোনও

কামনাই আমাকে স্পর্শ করে না, বিশ্বখ্যাত বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ন্যুড ছবিগুলোর দৃশ্যই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার।

এবার ভীষণ আনন্দে চৈতির হাতটা টেনে নিয়ে চুম খেল বিহু। সত্যি, এখানেই তোমার সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের তফাত।

তোরা সাধারণ হতে যাবি কেন, প্রতিটি মেয়ের ভেতরেই অসাধারণ শক্তি লুকিয়ে থাকে, কেবল যথাসময়ে তাকে জাগিয়ে তোলা চাই।

বিহু কতক্ষণ চৈতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কোনওদিন কি তোমরা সংসার গড়ার কথা ভাবনি?

চৈতি বলল, চিরাচরিত পথে চলার কথায় আমরা বিশ্বাসী নই। অনাবিষ্কৃত নতুন পথে চলার রোমাঞ্চই আলাদা।

ভবিষ্যতের কথা কিছু ভাবনি?

চৈতি বলল, বিশ্বখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের একটুকরো রোবায়েৎ শোনাচ্ছি তোমাকে :

'দাও সিরাজি পাত্র ভরে
সাকি আমার এই অধরে,
যাক্ অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা মরে।'

দারুণ বলেছ চৈতিদি। আমরা সেই সাকির দেওয়া অনন্তসুধা পান করে অতীত আর ভবিষ্যৎকে বেমালুম ভুলে যেতে চাই।

এবার প্রশ্ন বিহুর, তুমি কি জেনেছ শিল্পী সেনশর্মা বিবাহিত কিনা?

রহস্যময় একটা হাসি হেসে চৈতি বলল, দুজনই অতীতের দ্বারে তালা দিয়ে কেবল বর্তমানকে নিয়ে মশগুল হয়ে আছি। আমরা কেউ কারও অতীতকে জানতেও চাই না। সুখী সংসার, সুখী গৃহকোণ রচনা করার স্বপ্নও আমরা দেখি না।

দারুণ।

বলতে পারো এটা আমাদের কঠিন একটা লিভ-টুগেদারের পরীক্ষা।

হঠাৎ চৈতির পায়ে হাত ঠেকিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো বিহু।

এটা কী হচ্ছে?

বিহু বলল, তোমাদের এই কঠিনতম এক্সপেরিমেন্ট সফল হোক। লিভ টুগেদারেও মানুষ একসঙ্গে থাকে। তোমরা সেখানেও ছদিনব্যাপী সংযমের একটা রেখা টেনে দিয়েছ।

আকর্ষণটাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য। বিহু বলল, তোমাদের বিজয়িনী সিরিজের ছবিগুলো দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবি নগ্নসৌন্দর্যকেও কী অপার মহিমা দান করেছেন। এতখানি নগ্নতা কিন্তু তার কী অপরূপ প্রকাশ!

চৈতি বলল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব। অবিশ্বাসীরা একে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবে। তুই জানিস্, যে কদিন বিজয়িনীর ছবি আঁকা হয়েছে সে কদিনই আমি প্রার্থনা করে

শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছি। তাই আমার কামনার দুরন্ত ঘোড়াটাকে বল্গার বাঁধনে বেঁধে রাশ টেনে ধরতে পেরেছি। কাব্য করে বললাম কিন্তু সব সত্যি।

বিহু বলল, আর তোমার শিল্পী?

সে যখন ছবি আঁকে তখন ছবিতেই সে তদ্‌গত। তার ভাবনা-চিন্তা দৃষ্টি, তার ড্রইং বর্ণ প্রক্ষেপ সবই তখন অর্জুনের পাখির চোখ দেখার মতো শুধু ছবিতেই কেন্দ্রীভূত। সে আমার দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু আমাকে নিয়ে তার সম্পূর্ণ ভাবনার ছবিটা তার মনের আয়নায় স্পষ্ট প্রতিফলিত হচ্ছে। সে তখন আমাকে দেখেও দেখছে না, সম্পূর্ণ ভুলে গেছে জগৎ সংসার।

আশ্চর্য! তোমার কথা শুনে কেউ বিশ্বাসই করবে না চৈতিদি। এ যুগে এমন সংযম কেউ দেখাতে পারে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য।

চৈতি বলল, এবার উঠবি তো, কেনাকাটায় অনেক সময় লাগবে কিন্তু।

দুজনে এবার উঠে দাঁড়াল।

বিহু চৈতির স্কুলে শুধু গান শেখে না গোবিন্দ নারায়ণ কুট্টির স্কুলে নাচও শেখে।

কলামন্দিরের অনুষ্ঠানে তার নাচেব প্রশংসা করেছেন বহু গুণীজন।

একদিন চৈতি তাকে বলেছিল, আমি গানের শিক্ষিকা হয়ে শিলং-এ যখন থাকতাম তখন এক অসমিয়া পরিবারের কাছে বিহু নাচ শিখেছিলাম।

বিহু বলেছিল, তুমি আমাকে ওই নাচটা শিখিয়ে দেবে দিদি?

যতটুকু জানি ততটুকুই দেখিয়ে দিতে পারব। বিহু সমবেত নৃত্য। বাদ্য সংগীত সহযোগে এর স্ফূর্তি। তবে এমনি করতালি সহযোগে তোকে ভঙ্গি আর চলনগুলো শিখিয়ে দিতে পারি।

চৈতি তাকে 'বহাগর বিহু'—

বৈশাখের বিহু শিখিয়েছে।

কয়েকদিন আগে চৈতিদের স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল শিল্পী কোবিদ সেনশর্মা।

বিহু নাচে চৈতিকে অংশ নিতে দেখে কোবিদ একেবারে বিস্মিত, বিমুগ্ধ।

পরের রবিবারে দেখা হল দুজনের।

একসময় কোবিদ বলল, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

বিস্মিত চৈতি বলল, অপরাধ?

গুরুতর।

বিষণ্ণ চোখে কোবিদের দিকে তাকিয়ে চৈতি বলল, শুনি।

তুমি যে এত সুন্দর নাচতে পার সেকথা তো কখনও জানাওনি!

মুখে একঝলক হাসি ফুটিয়ে চৈতি বলল, ও সেদিনের নাচের কথা বলছ?

নইলে তোমার এই গোপন গুণের কথা আমি জানব কী করে।

হাসতে হাসতে হাতে নাচের মুদ্রা করে চৈতি বলল, আমার সঙ্গে যে নেচেছিল সে আমার গানের স্কুলের ছাত্রী বিহু। সে কিন্তু আসলে নৃত্যশিল্পী। একটা নামকরা প্রতিষ্ঠানে সে কথক, কুচিপুডি, ভারতনাট্যম শেখে। একক অনুষ্ঠানও করেছে কলামন্দিরে। শিলং-এ থাকতে এক অসমিয়া পরিবারের কাছে আমি বিহু নাচ শিখেছিলাম। ওটুকু আমিই শিখিয়েছি ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে ধরে বসল কোবিদ, তুমি নাচো, আমি ওই ভঙ্গিতে তোমার ছবি ক্যানভাসে ধরে রাখব।

চৈতি বলল, তুমি একদম পাগল, ও নাচ নাচতে গেলে পোশাক, চুলবাঁধা, ফুলের সাজ—সবই চাই।

বেশ তাহলে সপ্তাহের মাঝখানে কোনও একদিন এসো, আগামী রোববারের জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে পারব না।

কোবিদের একরাশ চুলে ভরা মাথাটা নেড়ে দিয়ে চৈতি বলল, এত অধৈর্য হলে চলে?

সব ব্যাপারে আমি ধৈর্য ধরতে পারি, কিন্তু ছবির ব্যাপারটা ছাড়া। যতক্ষণ না নতুন একটা আইডিয়াকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারছি, ততক্ষণ স্বস্তি পাই না আমি।

বেশ, কালই তোমাকে নাচ দেখাব, তৈরি থাকবে তুমি।

একটু থেমে কিছু ভেবে নিয়ে চৈতি আবার বলল, সেদিনের নাচের পার্টনারটিকে সঙ্গে আনব কি?

কথাটা শুনে কেমন যেন থমকে গেল কোবিদ। পরক্ষণেই বলল, আমাদের গোপন বাসরে অন্য কেউ ঢুকে পড়ুক এটা আমি চাই না। এই নিভৃত বাসর কেবল তোমার আমার।

কোবিদের কথা শুনে মনে মনে খুশি হল চৈতি। সে বুঝল, কোবিদ তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

পরের দিন সন্ধ্যায় বিহু নাচের সাজে তাকে সাজিয়ে দিল বিহু। ফুলের মালাটিও পরিয়ে দিল। স্কুলবাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি ডেকে আনল। চৈতি উঠে বসলে বিহু বলল, গুড লাক্। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন করে কৌতূহল প্রকাশ করল না।

চৈতি ভীষণ খুশি হল বিহুর এ ধরনের সংযত আচরণে।

সন্ধ্যায় আলো ঝলমল স্টুডিয়োতে বিহু নাচের আসর বসল। নর্তকী সংখ্যায় যেমন এক, দর্শকও শিল্পী কোবিদ ছাড়া অন্য কেউ নেই।

উপভোগ, উপভোগ, শুধু উপভোগ। মনপ্রাণ দিয়ে চৈতিকে দেখল সে একক নর্তকীর ভূমিকায়। আঁটোসাটো পোশাকে, লাল সাদা ফুলের মালায় চৈতি যখন ঘুরে ঘুরে নাচছিল তখন তার পেছনের ক্যানভাসে, দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো এক বিহু নর্তকীকে দেখছিল শিল্পী সেনশর্মা।

একসময় নাচ থামল, কিন্তু নর্তকীকে তারিফ করতে ভুলে গেল কোবিদ। সে তখন ছুটেছে ক্যানভাসের দিকে। কিছুক্ষণ আগে যে প্রতিবিম্বকে ক্যানভাসের বুকে সে ফুটে

উঠতে দেখেছিল তার ওপর পেন্সিলের টানে সে ফুটিয়ে তুলল একটা চমৎকার অবয়ব। এবার মগ্ন হয়ে শুধু ছবি নিয়ে মশগুল হয়ে রইল কোবিদ।

মৃদু হেসে মগ্ন শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ না করে চৈতি ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে। লিফ্‌টে উঠে নেমে গেল নীচে।

সারারাত ধরে নাচের ছবিতে রঙের কাজ শেষ করল শিল্পী। একাই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়ে পিছিয়ে দেখতে লাগল ছবিটাকে।

বড় তৃপ্তি পেল সে মনে মনে।

একবার কোবিদ টিভি চ্যানেলে বিভিন্ন নাচের কয়েকটা অনুষ্ঠান দেখেছিল। সেখানে বিহু নাচও দেখেছিল সে। মেয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচছিল।

দ্বিতীয় একটা ক্যানভাসে মণ্ডলীর ভেতর নৃত্যরতা মেয়েদের নিয়ে সে আর একটা ছবি শুরু করল। সেখানে ক্যানভাসে দেখা দিল অনেকগুলি নতুন মুখ। তার ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দুটি পরিচিত নর্তকী—চৈতি আর বিহু।

রোববার সে ছবি দেখে মুগ্ধ হল চৈতি। তার ভালো লাগল এই ভেবে যে শিল্পী তার সঙ্গীনিটিকেও ভোলেনি।

চৈতি বলল, সামনের এগ্‌জিবিশনে এই নাচের ছবি নিশ্চয়ই দেখানো হবে।

অবশ্যই। ইনভিটেশন কার্ড তোমার বন্ধুর নামেও একটা পাঠিয়ে দিও।

কভারের ছবিতে তোমাদের দুজনের নাচের অংশটুকু হাইলাইট করা হবে।

চৈতি কৌতুক করে বলল, আমি না হয় ঘর ছাড়া বাউন্ডুলে কিন্তু বিহুর তো বাবা মা ভাইবোন আত্মীয়স্বজন আছে, তারা তোমার প্রদর্শনী দেখলে বিহুকে এ নিয়ে প্রশ্ন করবে না?

ঠিক, এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি।

চৈতি ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে কী যেন ভাবল। হঠাৎ বলে উঠল, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার স্কুলের ফাংশানে তো বিহুর আত্মীয়রা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, সেখানে তুমিও তো ছিলে। তাই শিল্পীর ক্যানভাসে ও ধরা পড়ে গেছে। এ নিয়ে কেউ কিছু ভাববে না।

পরে রসিকতা করে বলল, এত বড় শিল্পীর ক্যানভাসে স্থান পেলে বিয়ের বাজারে ওর দরও বেড়ে যাবে। তাছাড়া তুমিই বল, ওর মুখখানা ভারী মিষ্টি না?

মিষ্টি ঠিক, কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভেবে বোসো না যেন। চৈতি বর্মণ পঞ্চাশ হাজারেও একটা মেলে না।

চৈতি বলল, হোস্টেলে ফিরে আজ খেতে পারব তো?

কেন?

এই যে এতবড় একখানা কমপ্লিমেন্ট দিয়ে পেট ভরিয়ে দিলে।

তাহলে মাসি যা রান্না করে রেখে ছেছে, এসো দুজনে ভাগ করে খাই।

মাথা নাড়তে নাড়তে চৈতি বলল, আজ হোস্টেলে ভালোমন্দ অনেক আয়োজন হয়েছে। বিরিয়ানি, মালাইকারি, দই মিষ্টি আরও কত কিছু।

কোবিদ বলল, আমারও জিভে জল এসে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমাকে ফেলে তুমি একা খেতে পারবে?

লোভী, লোভী কোথাকার, বলে কোবিদের থুত্‌নি ধরে নেড়ে দিল চৈতি।

কিন্তু কীজন্য এত আয়োজন বললে না তো?

রূপাদি ছুটিতে দেশে গিয়েছিল, সেখানেই দুদিনের কথায় তার বিয়ে হয়ে যায়। বরের সঙ্গে আগামী মাসে আমেরিকা পালাবে। তার আগে আমাদের বিয়ের ভোজটা খাইয়ে যাচ্ছে।

কতদিন আগে স্বপ্ন দেখেছিল ভুলেই গেছে চৈতি। কিন্তু কাল ভোর রাতের স্বপ্ন তার মনটাকে আশ্চর্যরকম মেদুর করে দিয়ে গেছে।

খুব ভোরবেলা সতুজেঠার ছেলে চন্দন এসে তাকে চুপি চুপি ডেকে তুলত। তারপর দুজনে ছুটে পালাত হাত ধরাধরি করে।

বৈশাখী ঝড়ের ভোরে আমতলায় কচি আম কুড়াবার ধুম, বর্ষার ভোরে কদমতলায় প্রথম ফোটা কদমের ভুর ভুরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কাদায় জলে গড়াগড়ি। শরতে শিউলিতলায় ঝরে পড়া শিউলি কুড়িয়ে মালাগাঁথা।

এমনি কত ঋতুপর্ব, কত মুগ্ধ মধুর শৈশব, কৈশোর কাটিয়েছে তারা।

সেই জীবনের পথে হারিয়ে যাওয়া চন্দন এতদিন পরে ফিরে এল স্বপ্নে।

চৈতি তার ছেলেবেলাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলল।

নিজেকে আড়ালে রেখে কবিতা লিখতে ভালোবাসে চৈতি। সে কোন এক রঞ্জন মোহান্তির নামে কবিতা ছাপায় পত্র-পত্রিকায়। কালেভদ্রে নিজের নামে।

আজকের লেখা কবিতাটা তার বাঁধানো খাতায় কপি করে সে নিয়ে চলল তার রবিবারের সান্ধ্য-বাসরে।

ওরা চোদ্দতলার সেই ছোট্ট বারান্দায় বসল মুখোমুখি।

চৈতি বলল, আজ ভোরে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, এক শৈশব, কৈশোরের খেলার সাথী সেই স্বপ্নে এসে ধরা দিয়েছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া পাখিটা ফিরে এসেছিল তার পুরানো খাঁচায়। তাকে নিয়েই এই কবিতা।

কবিতাটা শোনার আগেই কোবিদ বলে উঠল, দারুণ সাবজেক্ট, জমবে ভালো।

আগে তো শোনো, তারপর মন্তব্য।

●

বাদল বেলা

'কচুর পাতা মাথায় দিয়ে ভিজেছিলাম,
বয়স তখন নিতান্তই কচি,
পাশের বাড়ির মেয়ে তিন্‌নি, প্রচণ্ড ডানপিটে
আমি ছিলাম ভ্যাবা গঙ্গারাম।

টিনের চালে চড়বড়িয়ে তব্‌লা কে বাজায়?
ঝিঁঝির গানে ব্যাঙের তানে আসর জমজমাট।
কদমফুলের বাসে তখন আটচালা ম-ম,
তিন্‌নি আমি পিছল কাদায় দিচ্ছি গড়াগড়ি,
সে এক খেলা ছোট্টবেলা আষাঢ় মাসের ভোরে।

কিশোর বেলা সোনার রোদে ঝিক্‌মিক্‌ঝিক্‌ খেলা,
নয়নজুলি ফোটায় যত রঙিন শালুকফুল,
কোমরজলে ভিজিয়ে শাড়ি নাল ধরে টান মারে,
বুকে চেপে ফুলের রাশি কন্যা ওঠে পথে।
সেই বালিকা সেই কিশোরী আমার বুকের ধন,
তার ভাবনায় সকাল দুপুর সন্ধ্যা কেটে যায়।

যৌবনে হায় কাজের খোঁজে ঘুরছি শহরময়,
গাঁয়ের পথে পা পড়েনি কতকাল কে জানে!
চিঠি এলো ছোট কাকির,
পুনশ্চতে লেখা : —
তিন্‌নি গেছে শ্বশুরবাড়ি, খোঁজ করেছে তোর
যাবার আগে কেঁদেকেটে পা ভেজালো আমার।

সেই বালিকা সেই কিশোরী আমার ছিল যে
অঘ্রানেরই সোনার ক্ষেতে হারিয়ে গেছে সে।

দিনান্তে আজ আকাশ ছেয়ে বর্ষা নেমেছে,
গাঁয়ের পথে চলেছে কি সেই বালিকাটি?
বাঁহাতে যে ধরে আছে একটি ছেলের হাত।
কেয়াবনে আজও কি সেই ফুলের রেণু ঝরে?

উথাল পাথাল মাতাল বাতাস মাতায় বনস্থলি?
সেখানে কি আজও চলে বৃষ্টিভেজা খেলা?
দুটি মনের মিলনমেলা বাদলগন্ধে ভরা!

কবিতা পড়া শেষ হলে চৈতির মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইল কোবিদ। পরে বলল, তোমার শৈশবের স্মৃতি এই কবিতায় তোমাকে একটুকরো সোনার কণা উপহার দিয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে চৈতি বলে উঠল, সেই সোনার কণা আমি আমার প্রিয় শিল্পীর রত্নভাণ্ডারে জমা করে দিলাম।

কোবিদের হাতে কবিতাটা তুলে দিয়ে এক ঝলক মিষ্টি হাসি ছড়াল চৈতি।

কোবিদ বলল, তোমার কবিতা আমার চোখের ওপর টুকরো টুকরো ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। আমি ওই দুষ্টু মিষ্টি ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে আমার দু'তিনখানা ক্যানভাস ভরিয়ে তুলব। একটু থেমে আবার বলল, আমি অবাক হয়ে যাই কী করে তুমি কবিতার কথায় এমন সুন্দর সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তোলো।

চৈতি হেসে বলল, আমার শিল্পীর তুলির ছোঁয়াতেই আমি টুকরো টুকরো ছবি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে উঠে ওই ছবিগুলোকেই কথার ফ্রেমে বেঁধে নিই। এখন বল, আমার এই কবিতার বর্ণময় রূপ আমি কবে দেখতে পাব?

পরের রোববার চেষ্টা করব তোমার স্বপ্নকে সাকার করে তুলতে।

চৈতি বলল, আমি স্বপ্ন-টপ্ন বড় একটা দেখি না তবে অনেকদিন পরে এরকম একটা মধুর স্বপ্ন দেখলাম।

কোবিদ যেন কী ভেবে নিয়ে বলল, সেদিন ম্যাটিনি শোতে বহুবার দেখা একটা ছবি দুজনে দেখতে গিয়েছিলাম, মনে আছে?

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'?

হ্যাঁ।

চৈতি বলল, এক স্বপ্নের সওদাগর তার বহুমূল্য পণ্যের সম্ভার নিয়ে ময়ূরপঙ্খিতে বসেছিলেন। সেই ময়ূরপঙ্খিকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে নাবিক তাঁরা দুজনেই আজ বিশ্বের সমঝদার সভার ভারতের সম্মান বাড়িয়েছেন।

হয়তো তোমার ছেলেবেলার এই কবিতাটি ধুলোমাটি ঝেড়ে বেরিয়ে এসেছে পথের পাঁচালী ছবিটি দেখে। অসাধারণ কয়েকটি দৃশ্যে পরিচালক সত্যজিৎ রায় অপু দুর্গাকে নিয়ে যেন ক্যানভাসের ওপর ছবি এঁকে গেছেন। পরিচালক আর লেখকের এমন যুগলবন্দি বিশ্বে কদাচিৎ ঘটে থাকে।

পরের রোববার ভোর থেকেই কোবিদের কাছে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল চৈতির মন। আজ সে তার টুকরো কবিতাটির চিত্ররূপ দেখবে।

বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে সে সংগ্রহ করল কয়েকটি কদমফুল। তার ভেতর থেকে দুই পাতাওয়ালা দুটো ফুল পেল।

সন্ধ্যায় কোবিদের ঘরে গিয়ে ওই দুটো ফুল উপহার দিল তাকে।

কোবিদ বলল, এ ফুল দুটো কীসের প্রতীক? তুমি আর তোমার সেই বালক-প্রেমিকের মূর্তি ধরে কি এসেছে এই যুগল-পুষ্প?

আমি দিয়েছি আমার শিল্পীকে, এখন ব্যাখ্যার ভার যাকে দিলাম তার।

কোবিদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে চৈতির হাত ধরে বলল, চল স্টুডিয়োতে যাই। আমার ক্যানভাসের ওপর যে ফ্লাওয়ারভাস আছে সেখানে ফুলদুটি মানাবে ভালো।

স্টুডিয়োতে ঢুকে তার কবিতার চিত্ররূপ দেখে চৈতি অবাক হয়ে গেল।

অপু দুর্গার থেকেও ছোট দুটি ছেলেমেয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে গ্রাম্য পথের ওপর দিয়ে ছুটছে। পেছনে তাল তাল মেঘের থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ভিজে লেপটে গেছে কপালে গালে চিবুকে। কালো মেঘের কোলে দুটিমাত্র ধবধবে সাদা বলাকা উড়ে চলেছে দূর দিগন্ত লক্ষ্য করে।

পরের পটে আঁকা পুষ্পিত কদম্ববন। সেখানে বৃষ্টিধারা সবুজপাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা ওই কিশোর-কিশোরীর শরীরে। কিশোরটির অনাবৃত বক্ষ। কিশোরী শরীর আবৃত করেছে গ্রামকন্যার মতো কাপড় জড়িয়ে। সিক্ত বসনে ফুটে উঠেছে বিদ্যাপতি-বর্ণিত কিশোরী রাধার রূপ।

লক্ষ করার মতো, ছবিতে ওই দুটি চরিত্রে চোখ আর মুখের এক্সপ্রেশান। এমন নির্মল অথচ মায়াময় দৃষ্টি কোবিদের মতো শিল্পীর তুলিতেই সম্ভব।

ছবি তোমার পছন্দ হয়েছে?

চোখ দুটো আধবোজা অবস্থায় ঘাড় কাত করল চৈতি। বলল, এ আমার, একান্তই আমার।

কোবিদ বলল, তোমার ছাড়া আর কার? আসলে তুমিই তো এই ছবির স্রষ্টা।

চৈতি বলল, আমি শুধু কাঠামোটাই বানিয়ে দিয়েছি, মূর্তি গড়েছ তুমি।

কোবিদ মজা করে বলল, প্রাণপ্রতিষ্ঠা আমরা দুজনেই করেছি, কী বল।

কোবিদের বুকে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে দিয়ে মিষ্টি হাসল চৈতি।

এবার কোবিদের প্রশ্ন, সত্যি করে বলবে, তোমার সেই কিশোর বেলার বন্ধু এখন কোথায়?

চৈতি কোবিদের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বলল, তুমি কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছ। আমরা শপথ নিয়েছিলাম, কেউ কারও অতীত নিয়ে প্রশ্ন করব না। তাতে বর্তমানের আনন্দের ওপর একটা সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে পারে।

কোবিদ নিজের দুটো হাতের ভেতর চৈতির দুখানা হাত চেপে ধরে বলল,—

'চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিও ক্ষমা,
হে নিরুপমা।'

চৈতি বলল, চমৎকার, দিব্যি মনে থাকে তোমার গানের কলি। যা যথাস্থানে যথাসময়ে প্রয়োগ করতে পার।

হাত পেতে কোবিদ বলল, তবে দাও পুরস্কার।

চৈতি বলল, কী পুরস্কার তোমায় দেব শিল্পী?

হে নিরুপমা গানটি গেয়ে শোনাও।

সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল চৈতি বর্মণ,—

'হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বলতান করিয়ো ক্ষমা॥
ঝরো ঝরো ধারা আজি উতরোল, নদী কূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।
সজল পবন দিশে দিশে তোলে বাদলগাথা।।
হে নিরুপমা,
চলপতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
এল বরষার সঘন দিবস, বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুল বীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে।।
হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি 'পরে বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।
তোমার চরণে নববরষার বরণডালা।।
হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে।
অধীর পবন কীসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে।।'

আজ মেঘের পালকে নিয়ে বড় অস্থির হয়ে উঠেছে আকাশ, তাদের উধাও গতিকে সামাল দেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

হাওয়ার ধাক্কায় বারান্দার কাচের পাল্লাদুটো গায়ে এসে ঠেকল ওদের, তার সঙ্গে সঙ্গে এককঝলক বৃষ্টিভেজা হাওয়া।

কোবিদ বলল, একেবারে ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি।

চৈতি বলল, আমার মনে হয় ওকে শ্বেত-সর্ষেগুঁড়ি বৃষ্টি বলাই ভালো।

কোবিদ হেসে বলল, বহুদিনের চলতি বাক্যটা আমি বলেছিলাম, তোমার উপমাটা একেবারে নতুন সৃষ্টি।

পরের রোববার একেবারে ভিন্ন আলোচনায় মেতে উঠল দুজন।

কোবিদ বলল, তোমার জীবনের দু'একটা অভিজ্ঞতার গল্প আজ তুমি শোনাবে।

সঙ্গে সঙ্গে চৈতি বলল, তাহলে তোমাকেও শোনাতে হবে।

বেশ, শুরু তোমার শেষ আমার।

চৈতি শুরু করল, বছর পনেরো বয়স তখন আমার। পিসিমাদের সঙ্গে বেড়াতে গেছি কিন্নরে। একটা পাহাড়ি মেলা দেখার জন্য আমরা সকলে বেরিয়েছিলাম। হাঁটাপথ, গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না। সংকীর্ণ পাহাড়িপথে চলতে চলতে আমি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পাহাড়ের ওপর থেকে আলগা পাথরের টুকরোগুলো ভীমবেগে নীচে গড়িয়ে আসতে লাগল। জায়গাটা ধুলোর মেঘে ভরে গেছে তখন।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। একে দলছুট হয়ে গেছি, তার ওপর এই শিলাবৃষ্টি! আমি পাহাড়ের সঙ্গে লেপটে বসে রইলাম।

পাথরগুলো লাফাতে লাফাতে গিয়ে পড়ছিল নীচে শতদ্রুর জলে।

প্রায় চোখ বুজে বসে রইলাম। বেশ কিছু সময় পরে মনে হল, পাথরের টুকবোগুলোর হুড়দাঙ্গা বন্ধ হয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সরু চলার পথটার ওপরে বিপুল পরিমাণ পাথরের চাঁই ডাঁই হয়ে আছে। ওদের ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া দুঃসাধ্য।

হঠাৎ জলতরঙ্গের মতো কানে একটা শব্দ এল। ভারী মিষ্টি সে আওয়াজ। আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি আমার ডানদিকে একটা গুহা। সেই গুহার ভেতর থেকে জলের ওই মিষ্টি আওয়াজটা ভেসে আসছিল। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, গুহার বাইরে তো জলের কোনও স্রোত দেখা যাচ্ছে না, তবে শব্দ আসছে কোথা থেকে?

আমি গুহার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। সামনে অন্ধকার, কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখি, কিছুদূরে গুহার ভেতরে পাহাড়ের একটা ফুটো দিয়ে আলো এসে পড়েছে। সেই ছিদ্রপথে সম্ভবত জলধারাও নেমে আসছিল। ওই জলধারা একটা ঝরনার আকার নিয়ে বয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণ উলটোদিকে।

আমি ঢুকে পড়লাম গুহার ভেতর। হেঁটে হেঁটে ওই আলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম। কাছে পৌঁছতেই আমার পায়ে জল লাগল।

ওপর থেকে জল পড়তে পড়তে সেখানে একটা ছোটকুণ্ড তৈরি হয়েছে। সেই কুণ্ড থেকে জল ঝরনার আকার নিয়ে নেমে চলেছে পাহাড়ের উলটোদিকে।

কী মিষ্টি সেই জলের আওয়াজ! আমার সংগীতপিপাসু মন সেই শব্দে আকৃষ্ট হল। আমি জলে পা ডুবিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম।

বহু সময় ধরে হাঁটলাম জলে। ক্রমে আলোর রশ্মি অস্পষ্ট হয়ে এল। আমি গুহার দুদিকে হাত ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে এগোতে লাগলাম।

আমার ভয়ডর একটু কম, কৌতূহল প্রবল। আমি আরও অনেকখানি এগিয়ে গেলাম। মনে হল কোনও এক জলপরি নুড়ির নূপুর বাজাতে বাজাতে সামনে এগিয়ে চলেছে। জলের স্রোতে বুঝতে পারছিলাম গতি বেড়ে চলেছে তার।

এতক্ষণে আর একটা আলোর রশ্মি আমার চোখে এসে পড়ল। এ আলো পাহাড়ের ওপর থেকে আসছিল না, গুহার শেষপ্রান্ত থেকে আসছিল।

ক্রমে আলোর বৃত্ত বড় হতে লাগল। হঠাৎ কোনও একটা আকৃতি দেখে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল, খোলা গায়ে একটা মানুষ পাথরের ওপর বসে আছে।

আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। অস্পষ্ট আলোয় যতটা দেখা যাচ্ছিল তাতে বুঝলাম মানুষটি চোখ বুজে ধ্যান করছেন। আমি যে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি সে হুঁশই তাঁর নেই। বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর ধ্যানমগ্ন মানুষটি চোখ খুললেন।

সবিস্ময়ে তাকালেন আমার দিকে। উঠে দাঁড়ালেন। স্বল্পবাস এক যুবা পুরুষ।

তিনি বললেন, কে তুমি? এখানে কী জন্য এসেছ?

আমি নবরাত্র মেলা দেখার জন্য আমার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু পাহাড় থেকে শিলাবৃষ্টি হওয়ায় ওরা একদিকে আর আমি অন্য দিকে রয়ে গেছি। পাশেই গুহাটা দেখে ঢুকে পড়েছিলাম। এখন এতদূর জলে হেঁটে হেঁটে এসেছি। এর ভেতরে যে কোনও মানুষ থাকতে পারেন তা আমার ভাবনায় আসেনি।

লোকটি বললেন, এসো আমার পেছন পেছন।

আমি ওঁকে অনুসরণ করে গুহামুখের দিকে এগোতে লাগলাম।

বেশ বড় গুহামুখ, আলোয় ভরে গেছে। গুহামুখ থেকে বেরিয়ে যুবাসাধুটি একখানা পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অপেক্ষাকৃত নিচু বেশ কয়েকটা পাহাড় প্রায় অর্ধবৃত্ত রচনা করে সবুজশ্যামল দেহে দাঁড়িয়ে আছে।

দূরে একটা পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে সাধু বললেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

আমি কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে দেখলাম। মনে হল, বহু মানুষ এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। বললাম, ওখানে অনেক মানুষের জটলা দেখতে পাচ্ছি।

ওটাই নবরাত্রের মেলা। কামরু-মোনে ওই মেলা হয়। আমার মনে হয় তোমার সঙ্গীরা ওই মেলাতেই গিয়েছেন।

এতদূর পথ আমি যাব কী করে?

সাধু বললেন, বেলা গড়িয়ে যাবে। মনে হয় তুমি একা যেতে পারবে না। চলো, আমি তোমাকে এগিয়ে দিই।

চড়াই উতরাই পথে আমি নীচের দিকে নামতে লাগলাম। সাধু সামনে, আমি পেছনে।

চলতে চলতে সাধু বলছিলেন, ওপরের সরু পথটা ধরে চললে ওখানে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যেত। কষ্ট করে একটু চড়াই উতরাই করতে পারলে, দু-তিনটে গিরিসংকট পেরিয়ে আমরা পাঁচ ঘণ্টার পথ দু ঘণ্টায় চলে যেতে পারব।

সেদিন বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে সাধুর সঙ্গে আমি মেলায় পৌঁছেছিলাম। সেখানে মেলার একধারে সাধু আমাকে একটা গাছতলায় বসিয়ে রেখে আমার আত্মীয়স্বজন কী রঙের পোশাক পরেছেন এবং কজনই বা রয়েছেন এটা জেনে নিয়ে কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ আমি সামনে দেখলাম, আমার আত্মীয়স্বজন সাধুর পেছন পেছন গাছতলার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের চোখেমুখে তখনও উদ্বেগের চিহ্ন।

আমার পিসিমা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আমি সবিস্তারে সাধু মহারাজের কথা তাদের বললাম।

সাধু মহারাজ হাত নেড়ে সবাইকে জানালেন, গুহাপথে ও এসেছে বলে এত তাড়াতাড়ি পাহাড়ের এ পারে আসতে পেরেছে। পিসিমা সাধুর ফলারের বিপুল আয়োজন করলেন।

সাধু বললেন, আপনারা যদি চড়াই ভেঙে একটু ওপরে উঠে আসতে পারেন, তাহলে অনেক আগেই গুহাপথে আপনাদের আস্তানায় পৌঁছে যেতে পারবেন।

সেদিন আমরা সবাই সাধুর পেছন পেছন গুহা পেরিয়ে পাহাড়ের ওপারে হাজির হলাম।

সন্ধ্যার আগেই সাধুর কৃপায় সেদিন আমরা আস্তানায় পৌঁছে গিয়েছিলাম।

চৈতির কথা শেষ হলে কোবিদ বলল, সত্যি দারুণ অভিজ্ঞতা তো।

চৈতি মজা করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, এখনও ক্লাইম্যাক্সে আসিনি। এ নাটকের পর্দা পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে উঠেছিল পাঁচ বছর পরে।

বিস্মিত কোবিদ বলল, কী রকম?

আমার অনার্স পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা দিয়ে ফিরছি, মনে হল আমার উলটো ফুটপাথ দিয়ে গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছেন। সাধুর পাঞ্জাবি আর কাপড় গেরুয়া রঙে ছোপানো হলেও কাছাকোঁচা করে পরেছেন। বেশ ঝোলা পাঞ্জাবি। মাথার চুলগুলো স্বাভাবিকভাবে ছাঁটা।

আমি আর কিছু লক্ষ করিনি। বাড়ি এসে শুনলাম, কিন্নর প্রদেশ থেকে এক সাধু এসেছিলেন। ওই সাধুর গল্প আমার পিসিমার মুখ থেকে মায়েরা শুনেছিলেন। দুপুরে উত্তম সাধুসেবা করেছেন আমার মা। আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধে হয়ে যাবে শুনে মুষড়ে পড়লেন। আমার মায়ের সঙ্গে সাধুর যেসব কথা হয়েছিল তার থেকে বোঝা গেল, সাধু এক সাধন-সঙ্গিনী খুঁজছেন। কিন্নর-কৈলাসের তলায় বসে হর-পার্বতীর মতো সাধনা করে পরম সিদ্ধিলাভ করবেন।

আমার বুদ্ধিমতী মা সাধুর মতলবটা আন্দাজ করে তাঁর হাতে কিন্নরে ফেরার সবরকম খরচাপাতি দিয়ে বিদেয় করেছেন।

কোবিদ হাসতে হাসতে বলল, সাধু তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন, নইলে এতবছর পরে এতদূরের পথ ছুটে আসতেন না।

এখন দুজনেই চুপচাপ। কফি বানিয়ে খাওয়া হল।

কফি খেতে খেতে চৈতি বলল, এবার তোমার জীবনের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতার কথা শুনব।

অপরাহ্ণের শেষ আলোটুকু এসে পড়েছিল চৈতির মুখের ওপর।

কোবিদ বলল, পশ্চিমে চেয়ে দেখ কী অপূর্ব সূর্যাস্তের মহিমা! এর ওপর রবীন্দ্রনাথের যদি কোনও গান থেকে থাকে তাহলে দু'ছত্র শুনতে বড় ইচ্ছে করছে।

এক-একজনকে গান গাইবার জন্য বড় সাধতে হয় কিন্তু এ ব্যাপারে চৈতির দরাজ দিল্। একবার বললেই হল।

'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ—
ভুবনজুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।।
দিনান্তের এই এককোনাতে সন্ধ্যা মেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।।
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ।।'

তন্ময় হয়ে গান শুনতে শুনতে কোবিদের মন যেন ওই দিগন্তের শেষ সোনার সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। তোমার গানের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনিই আজ তোমাকে শোনাব।

আমি তখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনের মতো সাবজেক্ট চোখে পড়লেই স্কেচ করে নিচ্ছি খাতার পাতায়। বিশেষ করে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য মেয়েদের।

তখন গোয়ার বিচগুলোতে বেড়াচ্ছিলাম। গাড়ি নিয়েছিলাম পানাজি থেকে। অনেকগুলো বিচ দেখার পর শেষে এলাম আঞ্জুনা বিচে। ভাঙা ভাঙা পাথর ছড়ানো অঞ্চল।

সমুদ্রতীর বরাবর নারকেল গাছের সারি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কুটির, পাতায় ছাওয়া। তার একধাপ নীচে বালুবিছানো সি-বিচ। নারকেল গাছের জটলার ভেতরে যেসব কুটির আছে, এক ঝাঁক হিপি-হিপিনী সেখানে মনের সুখে নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটায়। হোম থেকে সামান্য যেটুকু অর্থ আসে তাতে ওদের দিন চলে যায়। সবাই জানে গোয়ার আঞ্জুনা বিচ হিপিদের স্বর্গরাজ্য। ওরা বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, সমুদ্রে রাত নেই দিন নেই মেয়ে-পুরুষ স্নান করে পরমানন্দে। গান শোনে, আরবসাগর থেকে ভেসে আসা হাওয়ার সঙ্গে নারকেল পাতার ঘর্ষণে যে মর্মরধ্বনি ওঠে, সেই গান। নিজেরা গিটার বাজায়। জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলো যখন নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে বালুর জমিনে রহস্যময় আঁকিবুঁকি তৈরি করে তখন ওরা তারই ওপর বসে গিটারে তোলে সাগর তরঙ্গের সুর।

ওদের পুরুষ আর নারী নিরাবরণ থাকতেই ভালোবাসে।

ঠিক আজকের মতো শেষ সূর্যের সোনা নারকেল পাতার ঝালরে ঝিলমিল করছিল। একটি সুঠাম সুন্দর নগ্নপুরুষ সমুদ্রস্নান সেরে উঠে এল তীরে। কাঁধের ওপরে এক দেবশিশু তার চুলগুলো ধরে বসে আছে।

পুরুষটি কয়েক পা এগিয়ে এসে মাঝখানের একটা কুটিরে ঢুকে গেল।

আমি শিশুসহ ওই সুঠাম পুরুষটির স্কেচ আঁকব বলে খাতা নিয়ে পেন্সিলের রেখা টানতে গিয়ে থমকে থেমে গেলাম। আমার হাত থেকে খাতার ওপর দিয়ে পেন্সিলটা গড়িয়ে বালিতে পড়ে গেল।

অল্প দূরে দেখলাম সমুদ্রস্নান করে উঠলেন এক রমণী। তাঁর সর্বাঙ্গে শেষ সূর্যের সোনা

মাখানো। কুঞ্চিত লালচুলের রাশি তাঁর বুকে পিঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এমন সুঠাম সুন্দর অবয়ব আমি কখনও দেখিনি।

নারী এগিয়ে আসছেন বালুবেলায় চরণচিহ্ন আঁকতে আঁকতে আমাদেরই অভিমুখে। প্রসন্নদৃষ্টি, সে দৃষ্টি বিশেষ কারও দিকে নিবদ্ধ নয়। সে যেন আপনাকেই দেখছে। নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন।

ক্ল্যাসিকাল আর্টিস্টদের বহু নারীদেহের ছবি আমি দেখেছি, সেগুলি বিশ্বখ্যাত। কিন্তু চোখের সামনে সেই জীবন্ত মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে বসে রইলাম।

নিরাবরণা নারী একটা বাঁক নিয়ে নারকেল বীথির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন বালির ওপর থেকে সূর্য তার সোনালি আঁচলটি সরিয়ে নিয়েছে।

কোবিদ থামলে চৈতি বলল, ওর কোনও স্কেচ তুমি করনি?

রাতে হোটেলে ফিরেই অনেকগুলো স্কেচ করেছিলাম। পরে সেগুলো ক্যানভাসেও তুলে রেখেছিলাম, কিন্তু রং দেওয়া হয়নি।

চৈতি বলে উঠল, সেগুলো কোথায়? আমি দেখব।

চলো, পুরানো গাদা ছবির ভেতরে কোথাও রাখা আছে, খুঁজে দেখতে হবে।

চৈতি উঠে দাঁড়িয়ে কোবিদকে ঝাঁকি দিতে দিতে বলল, একদিন আমার অবস্থাও এমনই হবে। তখন ওই গাদার ভেতরে আমিও হারিয়ে যাব।

কোবিদ বলল, তোমার সঙ্গে আমার দেহমনের যোগ, আমরা তো পার্বতী পরমেশ্বরৌ।

বেশি খুঁজতে হল না, আঞ্জুনা বিচের সেই সমুদ্রকন্যার স্কেচগুলো বেরিয়ে এল।

স্কেচগুলো দেখতে দেখতে বারবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল চৈতি বর্মণ। শেষে বলল, তুমি খুব অন্যায় করেছ।

কী রকম?

রং তুলি দিয়ে একে সম্পূর্ণ করনি কেন? এ তো তিলোত্তমা-নারী।

কোবিদ স্মিতমুখে বলল, শুধু তোমার কথা ভেবে ওকে আর অনন্যা করে তুলিনি।

মিথ্যুক কোথাকার, তখন কোথায় ছিলাম আমি আর কোথায় ছিলে তুমি।

তাহলে ভেবে নাও বিধাতাই আমার জন্য তোমাকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, আর তাই অন্য কোনও নারীকেই তিলোত্তমার মর্যাদা দিতে চাননি।

আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বলো কী?

এই স্কেচগুলোতে তোমাকে রং দিতে হবে। আগামী এগ্‌জিবিশনে এই সাগরিকা সিরিজটাও থাকবে।

কোবিদ বলল, নামটা তো বেশ রাখলে, 'সাগরিকা'।

আমার কোথায়! সবই তো সেই সত্যদ্রষ্টা কবির। বলেই রবীন্দ্রনাথের সাগরিকা কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগল চৈতি,—

'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে,

শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা লিখন ঊষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।'

আজ এটুকুই বলা হল।

কোবিদ বলল, এ যে একেবারে আমার দেখা ছবি।

কবি বিশ্বদ্রষ্টা, তাই সব শিল্পীর মনের কথাই তাঁর কলমে ফুটে উঠেছে।

কোবিদ আর চৈতি তাদের ভালোবাসাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য শুধুমাত্র রোববারের রাতটিকে দুজনের মিলন-লগ্ন হিসেবে নির্বাচন করেছিল। প্রাত্যহিকের ম্লান স্পর্শ থেকে এভাবে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল তারা।

সন্তানের আবির্ভাব, শিশুকণ্ঠের কলকাকলি কাঙ্ক্ষিত ছিল না তাদের।

এমনি কয়েকটা বর্ষা বসন্ত পার হয়ে গেল চৈতি আর কোবিদের জীবনে।

সহসা একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল।

এক শনিবার সন্ধ্যায় অধ্যাপক সেনশর্মা আর্ট কলেজের ক্লাস শেষ করে নিউমার্কেট থেকে কিছু ফল ফুল কিনে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল। দুটো আনারস আর কয়েকটা কাশীর পেয়ারা ছিল ব্যাগে। এই দুটো ফলই চৈতির বড় প্রিয়। রোববার সন্ধ্যায় ফলাহার হবে দুজনের।

নির্বাচিত ফুল সাধারণত কেনা হয় নিউমার্কেট থেকে। রোববারের বাসরশয্যা সেই পুষ্প মহোৎসবে সম্পন্ন হয়।

লিফ্‌ট চোদ্দতলায় শিল্পী সেনশর্মার ফ্ল্যাটের মুখোমুখি থামে।

দরজার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত হল কোবিদ।

একজন গ্রাম্য মানুষ একটি বছর পাঁচেকের ছেলের হাত ধরে তারই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

এগিয়ে গিয়ে কোবিদ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কাকে চান?

লোকটি গ্রাম্য মানুষ, নমস্কারের ভঙ্গিতে আধখানা হাত তুলে বলল, কোবিদ সেনশর্মা মশায় কি এখানে থাকেন?

বলুন, আমিই সেনশর্মা।

লোকটি কোবিদের হাতে একখানা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমরা অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। বহুকষ্টে ঠিকানা সন্ধান করে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি এখন ফিরে যাচ্ছি স্টেশনে। লাস্ট ট্রেন সন্ধে সাতটায়।

লোকটি আর দাঁড়াতে চাইল না। পায়ে পায়ে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে লাগল।

সেই রহস্যময় লোকটিকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কোবিদ, ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন না?

লোকটি দ্রুত নেমে যেতে যেতে বলল, ওই চিঠিতে সবই জানতে পারবেন।

দরজা খুলল কোবিদ। এতক্ষণে তাকাল ছেলেটির দিকে। একটা শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। বড় বড় টানা চোখ, একমাথা কোঁকড়া চুল, শ্যামলা রং।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কাকে দেখেছে সে! তারই মতো টিকোলো নাক, ঈষৎ চাপা চিবুক।

পরিচিত লোকটি যে চলে গেল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপই নেই। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল কোবিদ সেনশর্মাকে।

কোবিদ তার হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। বারান্দা দেখে সেদিকে দৌড়ে গেল ছেলেটি। সে রেলিং ধরে অবাক হয়ে দেখতে লাগল মহানগরীর আলোকসজ্জা।

সবকিছু রেখে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে চিঠিটা এবার খুলল কোবিদ।

মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা অক্ষরগুলো কাঁপা কাঁপা।

শতকোটি প্রণাম।

নামে কি আপনি আমাকে চিনতে পারবেন? আমি বিন্দু—বিন্দুবাসিনী।

অবশ্য তিনদিন মাত্র আপনার সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তারপর চির নির্বাসনে চলে এসেছি।

বিশ্বপতিবাবুর বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর প্রতাপ চৌধুরী মশায়ের বাড়িতেও আমার ঠাঁই হয়নি। শেষে গরিব মায়ের কুঁড়েতে আমার আশ্রয় হয়।

ফুলশয্যার দিন আপনার সঙ্গটুকু লাভ করে আমি ধন্য হয়েছিলাম। তারপর সবই অন্ধকার।

আনন্দ আপনারই সন্তান। আমি সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যেটুকু রোজগার করতে পেরেছি তাতেই বড় করে তুলেছি ওকে।

নিজে পড়াব বলে আমি গ্রামের পণ্ডিতমশায়ের কাছে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছি। নইলে আমি ছিলাম আকাট মুখ্যু।

আজ আমার সেই দয়ালু পণ্ডিতমশায় আমার ছেলেকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে গেছে। যদি মনে করেন আনন্দ আপনার ছেলে নয় তাহলে দয়া করে আপনি ওকে কোনও অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবেন।

আমি আনন্দকে হয়তো এখনই আপনার কাছে পাঠাতাম না কিন্তু আমি ক্যান্সারে ভুগছি অনেকদিন। আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের ডাক্তারবাবু বহু চেষ্টায় আমাকে মহকুমা সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানকার বড় ডাক্তার আমার সবকিছু পরীক্ষা করে দেখেছেন। শেষে তিনি জবাব দিয়ে দিয়েছেন। আমার পরমায়ু হয়তো আর কয়েকদিনের। তাই প্রাণ থাকতে থাকতে ছেলেটাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

আপনি বড় বংশের ছেলে, অনেক নামী মানুষ, আপনাকে যদি কোনওভাবে বিব্রত করে থাকি তবে মৃত্যুপথযাত্রীকে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।

হতভাগিনী বিন্দুবাসিনী।

বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে মাথায় দুটো হাত ঠেকিয়ে কতক্ষণ বসে রইল কোবিদ সেনশর্মা।

ছায়াছবির মতো স্মৃতির পটে ভেসে চলে গেল দুঃস্বপ্নের দিনগুলি।

মাসিমার বাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে। মেসোমশাই অত্যন্ত প্রতাপশালী জমিদার। গ্রামের ইস্কুলে পাশ করার পর উচ্চশিক্ষা পেয়েছে কলকাতায়। তারপর আর্টকলেজে পড়া। শেষে অধ্যাপনার চাকরি।

মাসিমা মারা যেতেই ভয়ংকর ভেঙে পড়েছিলেন মেসোমশায়। তাঁর কাজে কলকাতা থেকে গিয়েছিল কোবিদ।

সেখানেই তার বিয়ের প্রস্তাব আসে।

বিয়ের প্রস্তাবটা উঠেছিল একটা আবর্তের ভেতর দিয়ে।

পাশাপাশি দুই জমিদার। স্বাভাবিকভাবেই মিল ছিল না তাদের ভেতর। একজন বিশ্বনাথ সেন, কোবিদের মেসো, অন্যজন প্রতাপ চৌধুরী।

মেসোমশায় বিশ্বনাথ সেনের বাবা জমিদার প্রতাপ চৌধুরীর বাবার কাছ থেকে একটা জায়গা একসময় লেঠেল পাঠিয়ে দখল করে নিয়েছিলেন।

প্রতাপ চৌধুরী তাঁর পিতার সেই জায়গাটি পুনরায় ফিরে পাবার জন্য বিশ্বনাথ সেনের কাছে দরবার করেছিলেন। কিন্তু কোবিদের জাঁদরেল মেসোমশাই জমিদার চৌধুরীর আবেদনে সাড়া দেননি।

এবার শুরু হল এক চাতুর্যের খেলা। প্রতাপ চৌধুরী তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোবিদের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন।

এককথায় রাজি হয়ে গেলেন কোবিদের মেসো কারণ প্রতাপ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

সেই সঙ্গে প্রতাপ চৌধুরী একটি শর্ত দিলেন, বিবাহবাসরে তাঁর জমিদারির ছিনিয়ে নেওয়া অংশটি দলিলের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে। যদিও সবকিছুই যাবে কোবিদ সেনশর্মার অধিকারে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন কোবিদের মেসো বিশ্বনাথ সেন।

প্রতাপ চৌধুরীর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ি গিয়ে মেয়ে দেখে আশীর্বাদ করে এলেন বিশ্বনাথবাবু। সুন্দরী, সর্বসুলক্ষণযুক্তা মেয়ে।

বিশ্বনাথবাবু ফিরে আসার সময় প্রতাপবাবু তাঁর হাত ধরে বললেন, আমার বংশে একটা নিয়ম আছে।

বলুন।

বিবাহ বাসরে আমার মেয়ে থাকবে অবগুণ্ঠনবতী। একেবারে ফুলশয্যার রাত্রি প্রভাত হলে বধূর অবগুণ্ঠন খোলা হবে।

মেয়ের মুখ দেখে ভীষণ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল বিশ্বনাথবাবুর। তিনি বললেন, বেশ তাই হবে।

বিবাহবাসরে অবগুণ্ঠনবতী বধূ এল, প্রচুর অলংকারে সুসজ্জিতা। কথামতো বিয়ের আসরেই বিতর্কিত ভূমিখণ্ড ফেরত পেলেন প্রতাপ চৌধুরী।

সেই ফুলশয্যার রাতেই বরবধূর দৈহিক মিলন ঘটেছিল। তাতেই সন্তানসম্ভবা হয়েছিল কোবিদের স্ত্রী।

ভোরবেলা উৎসুক আত্মীয়েরা নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করল।

এ কী! কৃষ্ণকায়া কদাকার একটি মেয়ের মুখ, চোখ দিয়ে নিরন্তর বয়ে চলেছে অশ্রুধারা।

বিশ্বনাথ সেন বুঝলেন ধূর্ত প্রতাপ চৌধুরীর কাছে হেরে গিয়েছেন তিনি।

একজন দাসী মেয়েটিকে ধরে টানতে টানতে বিশ্বনাথ সেনের এলাকা পার করে দিয়ে এল।

বিস্মিত বিহ্বল সেনশর্মা ফিরে এল তার কর্মস্থল কলকাতায়।

এর পরের ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা।

রোববার সন্ধ্যায় নিয়মমতো লিফ্‌ট থেকে নামল চৈতি। আগেভাগেই সেখানে দাঁড়িয়েছিল কোবিদ।

মুখে আঙুল দিয়ে চৈতিকে কথা বলতে বারণ করল কোবিদ।

ধীরে ধীরে ভেজানো দরজা ঠেলে ওরা ঘরে ঢুকল। ডানদিকে স্টুডিয়ো। ওরা দুজনে স্টুডিয়োতে ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে।

চৈতি অবাক। ফিসফিস করে বলল, কী ব্যাপার বল তো!

দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসল দুজনে। খামে ভরা বিন্দুবাসিনীর চিঠিটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে কোবিদ বলল, আজ আমাকে একটা নিয়ম ভাঙতে হবে।

বিস্মিত চৈতি হাঁ করে তাকিয়ে রইল কোবিদের মুখের দিকে।

এরপর দুই জমিদারের রেষারেষি, তার ভেতর বিয়ের ঘটনা, শেষে নির্মমভাবে কন্যার বিতাড়ন পর্ব পর্যন্ত বলে গেল কোবিদ।

এবার তুমি চিঠিখানা পড়।

নিবিষ্ট হয়ে চিঠির প্রতিটা অক্ষর পড়ল চৈতি বর্মণ। মনে মনে কিছু ভেবে নিল।

মুখ তুলে সোজা কোবিদের চোখের ওপর চোখ রেখে চৈতি বলল, ছেলে কোথায়?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার আলোকসজ্জা দেখছে।

চৈতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি এখানে বোসো, আমি আসছি।

চৈতি বারান্দার দিকে চলে গেল।

আনন্দের কাছে গিয়ে তাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল চৈতি। তাকিয়ে দেখল অবিকল কোবিদের মুখটি বসানো। সেই বড় বড় টানা চোখ, চাপা থুতনি, খাড়া নাক, এমনকী মুখের আদলটি পর্যন্ত।

চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে আদর করল সে আনন্দকে।

অবাক চোখে চৈতির দিকে তাকিয়েছিল আনন্দ।

একসময় বলল, কে তুমি?

আমি তোর মা রে, বাবা, চিনতে পারছিস না।

চোখেমুখে অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়তে লাগল আনন্দ।

মাদারির খেলা দেখেছিস? বাঁশ হাতে নিয়ে দড়ির ওপর দিয়ে যে মেয়ে যায়।

এবার খুশি হয়ে মাথা নাড়ল আনন্দ। বলল, আমি দেখেছি। একটা খালি সিন্দুকের ভিতর একটা সাদাজামা ভরে দিয়ে মুখ বন্ধ করল। পরে যখন ডালা খুলল তখন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সাদা দুটো পায়রা।

বলতে বলতে বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল আনন্দের দুটো চোখ।

চৈতি বলল, ওই মাদারি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে আমার সব অসুখ সেরে গেছে। এই দেখ, কালো রংটা পর্যন্ত ফরসা হয়ে গেছে। আমি মাদারিকে কেঁদে বললাম, আমার আনন্দ যদি আমাকে চিনতে না পারে?

মাদারি বলল, আনন্দকে তুমি এত বোকা ভাবছ কেন? ও তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকে ঠিক চিনে নেবে। ছেলে তার মাকে চিনবে না।

বলতে বলতে আনন্দকে বুকে তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে স্টুডিয়োতে গিয়ে দাঁড়াল চৈতি।

কোবিদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতেই তার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল আনন্দ।

বিস্মিত স্তম্ভিত কোবিদ চোখের সামনে দেখতে লাগল আশ্চর্য এক ভানুমতীর খেলা। সে ভেবেই পেল না কী করে কয়েক মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতিটাকে এমন করে মানিয়ে নিতে পারে চৈতি।

হঠাৎ চৈতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আনন্দকে নিয়ে আমি একটু বেরোচ্ছি।

মুখে কিছু না বলে চোখে প্রশ্ন চিহ্ন আঁকল কোবিদ।

বাঃ, কয়েকখানা জামা প্যান্ট কিনতে হবে না।

কোবিদ বলল, আমার যাওয়ার কি দরকার আছে?

ইচ্ছে হলে যেতে পারো, তবে কেনাকাটার ব্যাপারে দেখেছি ছেলেদের ধৈর্য বড় কম। আমি কিন্তু পাঁচটা দোকান ঘুরে দেখব। মোজা জুতোও কিনতে হবে।

তুমিই যাও, আমি বরং রাতের খাওয়ারটা রেডি করি।

আনন্দকে নিয়ে বেরিয়ে গেল চৈতি।

রোববার কয়েকটা এলাকায় দোকান বন্ধ থাকে, আবার কয়েকটা খোলা। চৈতির এ বিষয়ে কোবিদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান।

আনন্দকে নিয়ে চৈতি যখন ফিরল তখন বাজার উজাড় করে সমস্ত কেনাকাটা হয়ে গেছে। এমনকী রঙিন ছাতা থেকে পড়ার বই রাখার ব্যাগ পর্যন্ত।

তিনজন খেতে বসল টেবিলে। স্বাভাবিকভাবে আনন্দ এতে অভ্যস্ত নয়। তাই আনন্দকে কোলে নিয়ে বসে প্রথমে তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিল চৈতি।

আনন্দ বলল, সত্যি তুমি আমার মা। মাও আমাকে এমনই করে খাইয়ে দেয়।

খাওয়ার পর ধবধবে একটা বিছানায় আনন্দকে শুইয়ে দিল চৈতি।

তুমি শোবে না?

শোব বইকি বাবা। আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি তুমি ঘুমোও সোনা।

শুয়োরানি দুয়োরানির গল্প বলবে না?

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে গল্পও বলে যেতে হল চৈতিকে। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল আনন্দ।

শোবার ঘরের বারান্দায় দুখানা চেয়ার পাতা। একটাতে বসে উদাস হয়ে কিছু ভাবছিল কোবিদ। তার পাশে এসে বসল চৈতি। বলল, ওর মা ওকে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াত তাই আমাকেও গল্প বলে ঘুম পাড়াতে হল।

এরপর মাদারির গল্প বলল চৈতি কোবিদকে।

এখন কি তোমার কথা আনন্দ বিশ্বাস করেছে?

করেছে বলেই তো মনে হচ্ছে, না হলে এমন করে আমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকতে পারত না।

খুবই চিন্তান্বিত কোবিদ, এখন একে নিয়ে কী করা যায়?

চৈতি বলল, আমি যা ভেবেছি শোনো। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা চলে যাব আনন্দের গ্রামে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনন্দের মাকে কলকাতায় নিয়ে চলে আসতে হবে। শেষের দিনগুলো যাতে কষ্ট না পায় তার যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। কোবিদ হঠাৎ বলে উঠল, চিঠিতে তো বিন্দুবাসিনী গ্রামের কোনও ঠিকানা দেয়নি!

তুমি লোকটির কাছ থেকে জেনে নাওনি?

মানুষটি অদ্ভুত, চিঠি আর ছেলেকে আমার কাছে রেখে দিয়ে লাস্ট ট্রেন ধরতে হবে বলে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি কোনও কথা বলারই সুযোগ পেলাম না।

চৈতি বলল, আনন্দের মায়ের জন্য আমরা কিছু করতে পারলাম না এ দুঃখ চিরদিন থেকে যাবে।

স্থির হল, চৈতি আর কোবিদের কোয়ার্টার ছেড়ে কোথাও যাবে না। তারা স্বামী স্ত্রীর মতোই থেকে যাবে এখন থেকে। লিভ টুগেদার নয়, ভারতীয় সংসার যাত্রার নিয়মে।

কলেজ থেকে ফিরে এল কোবিদ। মুখখানা থম থম করছে।

তার দিকে তাকিয়ে চৈতি বলল, কী হয়েছে তোমার? দুদিন কলেজে যেতে পারনি বলে কেউ কিছু বলেছে?

কে আবার কী বলবে। সেদিনের সেই লোকটি কলেজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

উদ্বিগ্ন চৈতি জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন আনন্দের মা?

আমাকে ক্ষমা চাইবার কোনও সুযোগই আর সে দিল না। ঈশ্বর তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

মাসখানেক পরে বিয়ে উপলক্ষে একটা রিসেপশানের আয়োজন করল কোবিদ আর চৈতি।

বিরাট হল ভাড়া নেওয়া হল। হলটিকে সাজানো হল সুনির্বাচিত আলোর মালায়। শুধু তাই নয়, হলের অর্ধেকটা জুড়ে তৈরি হল একটি মঞ্চ। পুষ্পসজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠল সেই মঞ্চটি।

নির্বাচিত নিমন্ত্রিত অতিথিরা বসলেন হল পূর্ণ করে।

সেদিন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হল মূল মঞ্চে। এর আয়োজন করেছিল চৈতির স্কুলের ছাত্রীরা।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানকে নৃত্যরূপ দিয়েছিল ওরা। মঞ্চে বসে আছে সুসজ্জিতা এক কন্যা। তার অঙ্গে কোনও স্বর্ণালংকার নেই, পুষ্প দিয়েই তৈরি হয়েছে তার সকল অলংকার। এমনকী কবরীটিও পুষ্প দিয়ে গাঁথা।

চন্দনচর্চিতা কন্যাটি বসে রয়েছে নববধূ-বেশে। তাকে ঘিরে মণ্ডলীর একদিকে রয়েছে গানের দল, আর একদিকে নৃত্যশিল্পীরা।

সমস্ত পরিকল্পনাটি বিহুর। গানের সঙ্গে নাচ সে-ই কম্পোজ করেছে।

এই গানটির একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে! রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জুদেবীর বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই সংগীতটি রচনা করেছিলেন।

গান শুরু হল :—

'ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধু মঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুন রাত্রে মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনির চন্দন—
পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুলবল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ
উল্লাস-উতরোল বেণুবন কল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।
তব আঁখি পল্লবে দিয়ো আঁকি বল্লভে
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন॥

নৃত্যে গীতে মাতিয়ে তুলল কলাকুশলীরা সুসজ্জিত রিসেপশান হল।

শেষে সারি দিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারিণী কন্যারা অভ্যাগতদের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আতর আর ফুলের পাপড়ি ছড়াতে লাগল।

নিমন্ত্রিতরা উঠে দাঁড়িয়ে বরবধূসহ কলাকুশলীদের ঘিরে তুমুল করতালি ধ্বনিতে প্রকাশ করতে লাগল প্রাণের উচ্ছ্বাস।

●

ভালবাসার রসায়ন

[ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের কাহিনি]

আষাঢ়ে মেঘের তাল
ঘনকৃষ্ণ কবরী লীলায়
প্রেমিক জনের চিত্তে ঢেউ তোলে,
কেতকি কেশরে আহা
সুরভিত সে কন্যার চুল।
বর্ষার ঝালরে তার উড়ছে আঁচল।
সেই আঁচলের ছোঁয়া
চোখে মুখে বক্ষ নাভিদেশে
স্পর্শ রেখে যায়,
তরুণ তাপস ভেজে
আষাঢ়ের জল ভরা মেঘের লীলায়।

স্নান করে ঋষিকন্যা
নবধারা জলে,
বক্ষের বন্ধনী আর মেখলা উথলে।
শিহরণ সর্ব অঙ্গে
সারামন কারে যেন চায়,
চারিদিকে সুনিবিড় মেঘের প্রচ্ছায়।

তপোবন দুই তীরে
মাঝে নদী উৎফুল্ল নটিনী,
ঘুঙুরের শব্দ ওঠে
জলতলে নুড়ির নূপুর।
স্নান পান নিত্য শুদ্ধ প্রবাহিণী জলে।

এক তীরে তপোবন ঋষি কোহড়ের
অন্য তীরে সিদ্ধাশ্রম বদান্য ঋষির।
অষ্টাবক্র পুত্র কোহড়ের।
সুপ্রভা বদান্য কন্যা অতি সুদর্শনা।
ঋতুপর্বে তপোবনে পুষ্প মহোৎসব
মধুকর বিহঙ্গের গুঞ্জনে কূজনে
বনস্থলি সঙ্গীত বাসর।
কুসুমচয়নে ব্রতী তরুণী সুপ্রভা।
বৃন্ত থেকে ফুল ঝরে পড়ে
তরুণীর চিবুকে অধরে
কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়।
সাজি ভরা ফুল নিয়ে
চলে বালা লীলাভরে
যজ্ঞভূমে, আশ্রম অঙ্গনে।
সুগম্ভীর বেদধ্বনি ঋষিকণ্ঠে,
আশ্রম বালক দল সুসজ্জিত পীতবস্ত্রে
সুধাকণ্ঠে করে সামগান।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র
সুদর্শন সুঠাম যুবক।
তরুশাখা থেকে পাড়ে
রক্তিম অশোক, সোনালী চম্পক
আর দুধশুভ্র মালতি কুসুম
শালের ডোঙায় ভরে
সে কুসুম ভাসায় সে নির্ঝারিণী নীরে,
পরপারে অনুরাগ ভরে
সেই পুষ্পপাত্র নিয়ে
কৃতস্নান কুমারী সুপ্রভা
চলে যায় অরণ্য আড়ালে।
নব আবরণে আবৃত শ্রীঅঙ্গ
সেজে ওঠে ঋতুপুষ্প সাজে।

কণ্ঠ কবরী আর বাহুদুটি তার
ফুলে ফুলে শোভার আধার
প্রিয়ের পাঠানো ফুলে প্রতিদিন
তনুসাজে মায়াময়, বাসক-সজ্জায়।

অষ্টাবক্র থাকে প্রতীক্ষায়
উৎসুক নয়ন তার নির্ঝরিণী পারে
চেয়ে থাকে নির্নিমেষ।
ধীর পায়ে বনদেবী আসে নদীকূলে
প্রেমিকের দেওয়া ফুলে সর্বাঙ্গ সাজিয়ে।
এপারে ওপারে চলে দৃষ্টি বিনিময়
আভাসে ইঙ্গিতে চলে মন দেয়া নেয়া।
পত্র এলো একদিন
ভূর্জপত্রে লেখা—
দিবস রজনী যায় প্রিয়ার চিন্তায়।
আশ্রম সরসী নীরে যে পদ্ম ফুটেছে,
হৃদয় সরসী নীরে কবে পাব তাকে?
প্রতীক্ষায় দিন চলে যায়।

উত্তর এসেছে তার,
সারা দিন ভোর
অপঠিত সেই পত্র বুকে চেপে ধরে
প্রেমিক বিভোর।
সন্ধ্যালগ্নে হোল চন্দ্রোদয়,
পৌর্ণমাসী রজনীর আনন্দ মুকুর।
তৃণ পুষ্পলতায় পল্লবে
স্বচ্ছ তোয়া নদীনীরে
সে মায়ামুকুর, খেলা করে,
দিনের চেয়েও স্পষ্ট
মায়াময় স্বপ্নময় ছবি।

সে আলোকে পত্র মেলে ধরে
অসীম আগ্রহ ভরে
অষ্টাবক্র পাঠ করে প্রতিটি অক্ষর।

সুপ্রভার সুস্পষ্ট উত্তর হৃদয় মথিত করা।
—মিলনপিয়াসী মন
বল্কলের বাঁধন মানে না,
মনে হয় কবে
এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে।
অমিত তেজস্বী ঋষি জনক আমার
তাঁর কাছে অকপটে জানাও বাসনা।

সমাপ্ত হয়েছে সবে
আশ্রমের হোম কার্য,
নীরব বেদধ্বনি, ব্রহ্মচারি বিদ্যার্থীর দল
চলে গেছে পাঠ নিকেতনে।
গুরু বদান্য ঋষি প্রভাতি কর্মের অন্তে
উঠেছেন যজ্ঞাসন ছেড়ে।
তরুণ তাপস এক
নবোদিত সূর্যের বিভায়
যজ্ঞস্থল আলোকিত করে
বদান্যের সম্মুখে দাঁড়াল।
বিস্মিত মহর্ষিবর
প্রশ্নচিহ্ন আঁকেন নয়নে,
পদতলে ভূলুণ্ঠিত তাপসকুমার।
আশীর্বাদসহ প্রশ্ন,
কি নাম তোমার?
কোন্ ঋষিপুত্র তুমি, কোথায় নিবাস?

কোহড় ঋষির পুত্র অষ্টাবক্র নাম।

বস বৎস সম্মুখ আসনে,
পরিতৃপ্ত আমি আজ তোমার দর্শনে।
(উভয়ের কুশাসনে উপবেশন)
বেদনা আহতকণ্ঠে মহর্ষি বলেন,
পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে ঋষি কোহড়ের
তর্কযুদ্ধে পরাজয় জনকসভায়
শেষে শর্ত অনুসারে
সলিল সমাধি লাভ,
সে সময় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল
সারা জনপদে।
বন্দিনামে বাচস্পতি তর্ক বিশারদ
রাজসভা আলো করে ছিল বহুদিন
জনক রাজার।
বন্দিসনে তর্কযুদ্ধে পরাজিত যারা
সবাই ডুবেছে তারা জলের অতলে।
বন্দি নিয়ে গেছে টেনে কুম্ভীরের প্রায়।

আমি সেই তার্কিক বন্দির
মুখোমুখি দর্শন আশায়
গেছিলাম জনকরাজার মিথিলায়।

সেকি! তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ
হয়েছিলে নাকি?

অবশ্যই মহাত্মন,
সেই মহা তার্কিকের মুখোমুখি।
রাজর্ষি জনক বহু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে
চেয়েছেন ফিরাতে আমাকে।

অর্বাচীন তরুণের পরিণতি ভেবে
শঙ্কিত ছিলেন মহারাজ।

খুবই স্বাভাবিক।
জলতলে কেবা চায় বিসর্জন দিতে।

ছিল শুধু একটি প্রার্থনা
রাজর্ষির কাছে,—
আপনার সভা আলো করে
বহুকাল রয়েছেন তর্ক চূড়ামণি,
তাঁর দুর্ভেদ্য যুক্তির জালে
পরাভূত পণ্ডিত সমাজ।
বিজয়ীর শর্ত ছিল বড়ই নিষ্ঠুর,
গভীর জলের তলে চির নিমজ্জন।
অসম তার্কিক তবু
দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে
এসেছি এ মহতী সভায়,
আমার অধীত বিদ্যা পরীক্ষার
তীব্র বাসনায়।
যদি হই যুদ্ধে জয়ী
শোধ হবে গুরু ঋণ,
বাঁচাতে পারব আমি
আরও কত প্রাণ,
পাব পতিহারাদের পূত আশীর্বাদ।
সম্মতি দিলেন রাজা অবশেষে।
শুরু হল তর্কযুদ্ধ।

শিহরিত চৈতন্য আমার,
মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে

কে পারে তোমার মত ঝাঁপ দিতে
মরণের মহাসিন্ধু বুকে!
এখনও জীবিত আছ তাই
বিজয়ী হয়েছ তুমি,
সে বিষয়ে সন্দেহ কিছু নাই।
অসীম আগ্রহ নিয়ে তোমাকে শুধাই
সেদিনের কর্মকাণ্ড,
বল বৎস বিস্তারিতভাবে।

স্থির হল,—
পরস্পর চলবে প্রশ্নোত্তর ততক্ষণ
যতক্ষণ একপক্ষ নীরব না হয়।

বিচারক?
তর্কের বিষয় কিবা
বল বল, হে বৎস নির্ভীক?

বৈদিক শ্লোকের ছন্দ বিজ্ঞান ভিত্তিক,
তাই নিয়ে গূঢ় প্রশ্ন, সূক্ষ্ম আলোচনা।
গায়ত্রী প্রথম ছন্দ,
রয়েছে তা ব্যাপ্ত চরাচর
দ্যুলোক ভূলোক আর
সবিতাকে করে অতিক্রম
অক্ষয় অব্যয় তার পুণ্য অবস্থিতি।
ছয়টি অক্ষরে পদ, চারি পদে শ্লোকের উদ্ভব।
কখনো বা পঞ্চাপদা শ্লোক দেখা যায়
গায়ত্রী ছন্দটি জানি তিরিশ অক্ষরে।
উদাহরণ আছে তার মন্ত্রটিতে গাঁথা।
'ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎ। সবিতুর্বরেণ্যং।

ভর্গো দেবস্য ধী/মহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ/ওঁ/'
বেদোক্ত দ্বিতীয় ছন্দ 'উষ্ণিক' আর
তৃতীয় ছন্দের জানি নাম 'অনুষ্টুপ'
'বৃহতি' চতুর্থ ছন্দ, পঞ্চম 'বিরাট'
ষষ্ঠ ছন্দ 'ত্রিষ্টুপ' আর 'জগতি' সপ্তম।
এর পর ছন্দ নেই আর,
বন্দি জানে, 'সপ্তচ্ছন্দাংসি'—ছন্দের সমাহার।
সে জানে না, বৈদিক নন্দনতত্ত্বে
'অতিচ্ছন্দ' আছে।
আমি উদাহরণসহ বোঝালাম
অক্ষর বিন্যাসে।
উচ্চ সাধুবাদে সভাস্থল হল মুখরিত।
সঞ্চালক শতানন্দ রাজপুরোহিত
সভামধ্যে উঠে দাঁড়ালেন,—
তর্কযুদ্ধে আজ
পরাজয় হয়েছে বন্দির
আর তাই,—
সলিলসমাধি ছাড়া
অন্য কোনও গতি তার নাই।

সহসা দাঁড়াল উঠে বন্দি বাচস্পতি।
মহারাজ, আমি পুত্র বরুণদেবের,
তিনিই জলাধিপতি,
জলে মৃত্যু হবে না আমার।
তাই বিচারের শাস্তি
সুপ্রযুক্ত হবে না আমার ক্ষেত্রে।
তবে অকুণ্ঠে স্বীকার করি,
পরাজয় হয়েছে আমার
মহাজ্ঞানী ছান্দসিক তরুণের কাছে।
(ক্ষণকাল স্থিরভাবে থেকে)
কোহড় আছেন সুস্থ
আমার পিতার সলিলমহলে।

পরাজিত সকল পণ্ডিত
রয়েছেন সেথা সমাদরে
এখুনি আনছি আমি কোহড় ঋষিকে
সভার সম্মুখে। কৃতি পুত্র তাঁর
মুক্ত করে জনকেরে গৃহে নিয়ে যান।
(সাধু সাধু ওঠে ধ্বনি সভার মাঝারে)
নতজানু হয়ে প্রতিপক্ষ বন্দির সম্মুখে
করজোড়ে সুধালাম আমি,
মহানন্দে নিয়ে যাব পিতাকে আমার
জননী সকাশে। কিন্তু মহাপ্রাণ
পরাজিত অন্য যাঁরা রয়েছেন
বরুণদেবের ওই সলিলমহলে,
তাঁরা মুক্ত হলে, দুঃখদীর্ণ আত্মজন
স্নান করবে আনন্দসাগরে।
ভূমি থেকে আমাকে উঠিয়ে
বুকে বেঁধে নিয়ে বন্দি করেন ঘোষণা,
তাই হবে। মহৎ প্রাণের কাছে
এ আমার আত্মসমর্পণ।
রাজর্ষি জনক থেকে সভাস্থ সকলে
ধন্য ধন্য রব তুলে ভরান গগন।
(মহর্ষি বদান্য আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে
আলিঙ্গন করলেন অষ্টাবক্রকে)
এ প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা আছে মহাত্মন।

বল বল, উৎকর্ণ রয়েছি আমি
তোমার অমৃত বাক্য শোনার আশায়।

মাতৃগর্ভে ছিলাম যখন,
তখনি পিতার মুখ থেকে
শুনি বেদপাঠ।
শিষ্যদের শাস্ত্রজ্ঞান দিতেন যখন,
আমি শিখে নিতাম সকলই।
ঈশ্বরের কৃপাধন্য ছিল এ অধম।

মাতৃগর্ভে বাস করে তাই
শাস্ত্রীয় বিচারে আমি
হয়ে উঠি একান্ত নিপুণ।
শেষে একদিন শাস্ত্র নিয়ে বিচারের কালে
ভুল ধরে দিই আমি পিতার ব্যাখ্যায়।
মহাঅভিমানী পিতা
অপমানে জর্জরিত হয়ে,
অভিশাপ দেন এ অধমে
পঙ্গু হয়ে ধরাধামে জন্মাবি দুর্মুখ।
পিতৃ অভিশাপে, অষ্ট অঙ্গ বক্র শিশু
জন্মালো ভূতলে।

অতীব সুঠাম অঙ্গ, সুদর্শন তুমি,
প্রতিবন্ধী কে বলে তোমায়?

বরুণমহল থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে জনক
গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন আমাকে।
বলেন, কুমার, প্রিয়দর্শী হও তুমি
সর্বাঙ্গসুন্দর।
জনকের আশির্বাদে আমি লোকমান্য আজ,
কান্তিমান সুন্দরদর্শন।

অপূর্ব এসব কথা, বিস্ময় অপার!
মনে হয় যুগযুগান্তের লোককথা যেন।
(পূজার প্রসাদ পরিবেশন করা হল অতিথিকে।
আহারান্তে বিদায়লগ্নে ঋষি বদান্য বললেন,)
এখনও হয়নি শোনা
কি উদ্দেশ্যে তব আগমন।

পিতা মাতা তপস্যার হেতু
দূর হিমালয়ে অরণ্য গভীরে,
আমি একা আশ্রমের নিত্য কর্ম করি।
পিতা দূরে তাই আমি এসেছি স্বয়ং
একটি প্রস্তাব নিয়ে মহর্ষি সমীপে।

বল বৎস প্রস্তাব কি আছে?

সুপ্রভাকে বধূ রূপে নিয়ে যেতে চাই
আমার আশ্রমে। আপনার অনুমতি পেলে
উদ্বাহ সম্পন্ন হবে এই তপোবনে।
(ঋষি বদান্য গম্ভীর হলেন)
তুমি কি দেখেছ সুপ্রভাকে?

সুশীলা সুন্দরীকন্যা
রত্ন আপনার,
তার সঙ্গে পরিচয় স্রোতস্বতী তীরে।
সুপ্রভার সম্মতি পেয়েছি,
আপনার অনুমতি পেলে
শুভকর্ম সুসম্পন্ন হবে।

বিবাহ সহজকর্ম নয়।
স্থির চিত্তে শুদ্ধ দেহে
বধূকে বরণ করতে হয়।
সে হবে গৃহের লক্ষ্মী
সংসারে সাম্রাজ্ঞী।
সে হবে না কামনার অগ্নিতে আহুতি।

সে মর্যাদা অবশ্যই
দেব সুপ্রভাকে।

তার আগে তোমাদের
হয়ে গেছে দৃষ্টি বিনিময়।
শুভদৃষ্টি হয় জানি বিবাহ বাসরে,
শুভদৃষ্টি—সেই দৃষ্টি
পবিত্র সুন্দর।
সে দৃষ্টিতে দীপ জ্বলে
অন্তর অঙ্গনে।
সেই অনির্বাণ দীপ
থাকে প্রজ্বলিত
আমৃত্যু অন্তরলোকে।
(সামান্য সময় স্থির থেকে)
তারুণ্যের কামনা বিহ্বল দৃষ্টিপাতে
তোমাদের মনোবিনিময়,
তা কখনো শুদ্ধ নয়
বৈদিক বিচারে।
সুপ্রভাকে পেতে যদি চাও
বর্ষকাল ভোগ কর বিরহবেদনা।
সেই বিরহের অগ্নি
দগ্ধ করবে যৌবনের উদগ্র কামনা।
(কিছুক্ষণ নীরব থেকে)
তুমি যাবে বহুদূর গন্ধর্বনিবাসে।
বর্ষযাপন হবে সেখানে তোমার।
অক্ষয় হৃদয় নিয়ে ফিরবে যেদিন,
সেদিন করব বৎস কন্যা সম্প্রদান।

ঋষিবর, কিভাবে পৌঁছানো যাবে
গন্ধর্বনিবাসে?

দেবতাত্মা হিমালয়ে লক্ষ্য রেখে
শুরু হোক পথ চলা।
ধ্রুবতারকাটি দেখে পাবে দিশা
নিশীথের অন্ধকারে।
মানস সরসী আছে হিমালয় পারে,
স্নানে শুদ্ধ হবে তুমি
সে পুণ্য সলিলে।
সম্মুখে তুষার শুভ্র কৈলাস পর্বত,
মহাদেব জেনো সেথা নিত্য বিরাজিত।
হরপার্বতীর পদে ভূমিষ্ঠ প্রণাম রেখো
সশ্রদ্ধ অন্তরে।
চলে যাও আরো কিছু পথ,
দূর থেকে দেখা যাবে
অতি শুভ্র প্রাসাদের চূড়া—
ঘন নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে।
মেঘেদের স্বপ্নময় খেলা
সারাবেলা প্রাসাদটি ঘিরে।
মনে হবে আবর্তক মেঘ শীর্ষে
ভাসমান প্রাসাদ তরণী।
প্রাসাদের দ্বারী
কাঞ্চন বরণী এক রূপবতী নারী।
তার হাতে দেবে তুমি,
আমার লিখিত পত্রখানি
সাঙ্কেতিক ভাষাতে যা লেখা।
তারপর যা কিছু ঘটবে
সেজন্য প্রস্তুত থেকো তুমি।
বর্ষপরে দেখা হবে এই তপোবনে,
তখন তোমার এই বিবাহ প্রস্তাব
বিবেচিত হবে।

আশীর্বাদ চাই দেব এই শুভকাজে।

ফিরে এসে যখন দাঁড়াবে
সম্মুখে আমার,
তখন বর্ষিত হবে আশীর্বাদ
উভয়ের পরে।

বর চেয়ে নেব প্রভু
যদি কিছু থাকে আমাদের মনোমত।

অবশ্যই তাও পাবে,
সানন্দে দিলাম প্রতিশ্রুতি।
(পত্রসহ তাপসকুমারের প্রস্থান)

মিলনে উৎসুক এক তরুণ হৃদয়
হংসবলাকার মত
নগ-নদী-নগরী পেরিয়ে
উড়ে চলে গেল সেই গন্ধর্বনগরে
ঋষি নির্দেশিত পথে।
মেঘলোকে স্বপ্নের প্রাসাদ,
সেই প্রাসাদের দ্বারী
নয়নসুভগ এক নারী
ঋষি বদান্যের পত্র নিয়ে গেল
অন্তঃপুরলোকে।
ক্ষণকাল পরে
স্বপ্নের শতেক পরী গান্ধর্বী লীলায়
চলে এল প্রাসাদের সজ্জিত তোরণে,
নিয়ে গেল অতিথিরে
নীল বন, প্রমোদ কাননে।

সেখানে করাল স্নান
ঈষদুষ্ণ প্রস্রবণ জলে।
তরুণীর কোমল অঙ্গুলি সঞ্চালনে
দূর হল দীর্ঘ পথশ্রম।
নীলবন অতিথি নিবাসে
ভোজ্য এল থরে থরে।
পানীয় সুস্বাদু অতি সুধারসে ভরা
সর্বক্লান্তি হরা।
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা পর্যঙ্কে প্রস্তুত।
হাত ধরে তরুণীরা
সে শয্যায় তুলে দিল তাকে।
গৃহকোণে মণিদীপ
ছড়ায় নীলাভ দ্যুতি,
স্বপ্নময় সব।
নিদ্রার ছোঁয়ায়
নিমীলিত হল দুই আঁখি।
তরুণীরা করে সেবা
পালাক্রমে রাত জেগে জেগে।
বাতায়ন পথে ভেসে আসে
নিশীথের কুসুম সুবাস,
জোনাকিরা নৃত্যের লীলায়
স্বপ্ন ফিরি করে।

কার করস্পর্শ লাগে ললাটে আমার,
আধো ঘুম আধো জাগরণে
মনে হয় সে যেন এসেছে,
কণ্ঠে বকুলের মালা মৃদু গন্ধে ভরা।

এ মালা তোমার দেওয়া
প্রিয়তম সুদূর প্রবাসী।
বক্ষে তব মুছে গেছে
চন্দনের স্নিগ্ধ আলিম্পন।

তুমি কি রেখেছ মনে
প্রবাসী প্রিয়াকে?
ললাটের হাতখানি বুকে টেনে নিয়ে
আদরে সোহাগে তারে
ভরে দেয় তাপসকুমার।
কবোষ্ণ নিশ্বাস কার বুকে এসে পড়ে,
তাপস জড়ায় তারে
আশ্লেষে সোহাগে।
নিদ্রা টুটে যায়,
অষ্টাবক্র উঠে বসে শয্যার ওপর।
প্রবীণা রমণী এক
প্রসাধিত নানা অঙ্গরাগে
মুকুতার মালা পরে চূড়াকৃত বেণী
চেয়ে আছে তার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে।
তরুণীরা কক্ষতলে নিষন্ন নিদ্রায়।

সঙ্কুচিত হল দেহ, ভারাক্রান্ত মন।
ক্রিমিকীট কিংবা সরীসৃপ
দেহস্পর্শ করে গেলে
ঘৃণার যে আক্ষেপ শিহরে
অষ্টাবক্র হল সেই বোধের শিকার।
শয্যা ছেড়ে গৃহতলে দাঁড়াল রমণী,
তখনো মোছেনি তার সব অঙ্গরাগ,
উদীচী আমার নাম, মূর্তিমতী উষা
আমার আঁধার গর্ভ থেকে
প্রতিদিন জন্ম নেয় আলোর পুরুষ।
হে তাপস, আমার এ বাহুপাশে
নিশিযাপনের, কোনও গ্লানি যেন পীড়া না দেয় তোমাকে।
নবোদিত অরুণের মত
প্রতিটি প্রভাতে হবে নব অভ্যুদয়।
প্রতিনিশি প্রতীক্ষায় থেকো
নব অনুরাগিণী তন্বী পাবে তুমি শয্যার সঙ্গিনী।

সংবৎসর একে একে আসবে তাহারা,
কেলি কলাবতী কন্যা
করে যাবে চিত্ত বিনোদন।
আমি শিক্ষাগুরু তাহাদের,
প্রথম রজনী তাই কাটালে আমার সঙ্গে
কামকলা কেলি কুতূহলে।

আশ্রমে ফেরার কোনও
পথ নেই খোলা,
তাহলেই পরাভব মেনে নিতে হবে।
মহর্ষি বদান্য জয়ী হলে
এ পরাজিতের হাতে
কন্যা সমর্পণ, অসম্ভব।

প্রত্যহ প্রভাতকালে প্রকৃতি কোমল।
শাখাপত্র ভেদ করে
সূর্যের ভৃঙ্গার থেকে ঝরে পড়ে
সুবর্ণ কণিকা ঝলকে ঝলকে।
আলোর ধারায় হয়
প্রভাতের স্নান সমাপন।
কুসুম সুবাসবহ মন্দ মন্দ বায়ু
সুবাসিত করে প্রাণমন।
ইচ্ছা হলে কোনও দিন
কমল সরসী নীরে স্নান সন্তরণ।
ফুটন্ত কমলদলে
কখনো বা ফুটে ওঠে
কমল আননগুলি রূপবতীদের,
কৃষ্ণভ্রমরেরা ওড়ে আঁখির তারায়।
সে এক আশ্চর্য খেলা
জলতলে সন্তরণ।

অজস্র মীনের স্পর্শে
রোমাঞ্চিত দেহ।
কখনো মীনের দল
ভেসে ওঠে জলের ওপর।
সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে
তারা সব হয়ে যায়
কলাবতী গন্ধর্ব-কুমারী।

দিনে রাতে এই সঙ্গ পরশ এড়িয়ে
কোথায় পালানো যাবে,
অষ্টাবক্র ভাবে মনে মনে।
কৈলাস পর্বত ঘিরে যত জনপদ
সবই খ্যাত শিবভূমি নামে।
তাই,
অষ্টাবক্র ভাবে—
যতই প্রবল হোক মদনের লীলা,
ধ্বংস তার অনিবার্য শিবকোপানলে।
হে প্রভু প্রমথনাথ শিব চন্দ্রচূড়
মদনান্তক মহাদেব শূলপাণি
রক্ষা কর এ অধমে,
মদনের শরাঘাত ব্যর্থ যেন হয়।

নিশাকাল নিয়ে আসে শত প্রলোভন
বাতাসে বাঁশিতে আর চন্দ্রের কিরণে
কে যেন ছড়ায় সম্মোহন।
সুধীর চরণে বাজে নূপুরের ধ্বনি,
সে ধ্বনি নীরব হয় শয্যা পরে এসে।
শুধু অঙ্গুলির খেলা চলে কতক্ষণ।
অষ্টাবক্র খোঁজে মনে মনে
এর থেকে মুক্তির উপায়।

প্রতি স্পর্শে মনে হয় তার
এ হস্তের আলিম্পন
তার প্রাণপ্রিয় প্রেমিকার।
এইভাবে চুম্বনে সোহাগে
ভোর হয় মধুরাত।
তাপসকুমার দেখে,
বাতায়ন পথে
শূন্যলোকে কে যেন মিলায়।
ঋষি বদান্যের কন্যা
সারা রাত বুকের ওপরে
নর্মলীলা বিলাস কৌতুকে খেলা করে
ভোরের ছোঁয়ায়,
মুখ ঢেকে কুয়াশার শুভ্র ওড়নায়,
সারস পাখির মত
দক্ষিণ দিগন্তে উড়ে যায়।
স্নানে পানে ভোজনে শয়নে
দ্বিধাহীন তরুণ তাপস
গান্ধর্বীকন্যার মুখে
দেখে শুধু,
ঋষিকন্যা সুপ্রভার ছায়া,
উদভ্রান্ত প্রেমের এক হৃদয়হরণ
ভানুমতী মায়া!

সুপ্রভা?
পিতা।
বৎসর সমাপ্ত হতে পক্ষকাল বাকি,
শর্ত মত অপেক্ষা করব আমি সে কাল অবধি।
তার পূর্বে শুভলগ্ন দেখে
আহ্বান করব আমি স্বয়ংবর-সভা।
সে সভায় প্রবেশের অধিকার
পাবে শুধু বনবাসী শুদ্ধাচারী
ঋষিপুত্রগণ।

শর্ত সমাপ্তির দিনে
সুসজ্জিত স্বয়ংবর-সভার বাসরে
আবির্ভূত হবে একে একে
দীপ্তিমান বেদবিদ ঋষিকুমারেরা।
তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে
নির্বাচন করে নিয়ো জীবনসঙ্গীকে,
কণ্ঠে তার মাল্যদান করে
মহানন্দে বেদবিধিমতে
শুরু কর গার্হস্থ্যজীবন।
তপোবন ধন্য হবে
সুরক্ষিত রবে অগ্নি,
নিষ্ঠায় সম্পন্ন হবে
হোমকর্ম আদি।
তুমি হবে ঋষিবধূ
সুকল্যাণী সর্বচিত্তজয়ী।
আরো শোন সমাচার
দুঃখ পাবে বলে,
বলিনি তোমাকে এতদিন
সুগুপ্ত সংবাদ।
(চঞ্চল ও উৎকর্ণ হল সুপ্রভা)
গন্ধর্বলোক থেকে নীলাম্বর পথে
এসে গেছে লিপিলেখা
পারাবত-দূতের মাধ্যমে।
গন্ধর্বলোকের
শ্রেষ্ঠ গণিকা-আলয়ে
অষ্টাবক্র আছে মহাসুখে।
সেবাযত্নে সে এখন
ভুলে গেছে আশ্রমের
কষ্টলব্ধ সকল সাধনা।
তার প্রেমে ছিল শুধু আসক্তি প্রবল,
বিবাহে হৃদয় যুক্ত হয়,
সেখানে কর্তব্য, ব্রত।
আসক্তির অশুভ আগুনে
কোন কর্ম সিদ্ধ নয় সেথা।

পরম কল্যাণময়ী কন্যা তুমি
শুদ্ধচিত্তে কর নির্বাচন
মনোমত জীবনসঙ্গীকে।

বিক্ষত অন্তরে
ক্রন্দন সম্বল করে
ঋষিকন্যা চলে গেল
তপোবন তরুচ্ছায়ে আপন কুটিরে।
অলিন্দে রয়েছে তোলা
বকুল কুসুম মালা,
যে ফুল দিয়েছে তাকে প্রেমিক তাপস।
বিশুষ্ক হয়েছে ফুল
তবু বুকে তার
সুমিষ্ট সৌরভটুকু সযত্নে রেখেছে।
স্মৃতি বকুলের বাস
বুকভরা কান্নার সঞ্চয়
সুরভিত স্মৃতি ঘিরে
নিশি দিবা ওড়ে প্রজাপতি
গুঞ্জন বিহীন অনুরাগে
মনে হল, দেয় বিসর্জন
স্মৃতির সঞ্চয়গুলি স্রোতস্বতী নীরে।
কেঁদে ওঠে মন পরক্ষণে
জড়ায় স্মৃতির লতা সারা দেহ ঘিরে।
কত স্বপ্ন কত স্পর্শ
দিবসরজনী ঘিরে কুসুম ফোটান
লতিকার বৃন্তে বৃন্তে।
প্রবাস যাত্রার লগ্নে
এসেছিল প্রেমিক তাপস
এ পর্ণকুটিরে সাক্ষাতের তরে।
সেদিন সে প্রেমিকের
বক্ষ জুড়ে এঁকে দিয়েছিল
চন্দনের চারু-আলিম্পন।

বলেছিল প্রিয়তম,—
তোমার স্পর্শকে বুকে ধরে
যাব আমি হিমগিরি পারে,
মহর্ষি-বর্ণিত সেই গন্ধর্বনগরে।
অজ্ঞাত সে কর্মকাণ্ড,
অজানা সে দেশ,
পাব না বৎসরকাল প্রিয়ার সন্দেশ।
তবু জানি আছ তুমি
আমার অন্তরে অনুক্ষণ
আমার সকল কাজে,
তোমার নীরব সমর্থন।

এ কী ঝঞ্ঝা আমার জীবনে,
কোথা থেকে কৃষ্ণমেঘ
ছেয়ে ফেলে আমার ভুবন
বিদ্যুতের সর্পিল ছোবল
লেগেছে আমার বুকে,
কলেবর কাঁপে থর থর
বিশুষ্ক অধর।
শান্তি নেই প্রবাহিণী নীরে,
স্বস্তি নেই শীতল সমীরে
শুধু দাহ সারাদেহ জুড়ে।
ঋতম্ভর জনক আমার
তাঁর বাক্যে অবিশ্বাস-অসম্ভব।
তাই তাঁর সত্য বাক্য নিতে হবে মেনে
নতশীরে। নিজের সকল ইচ্ছা
বিসর্জন দিয়ে।

পত্রপুষ্পে রচিত তোরণ।
বৃক্ষগুলি শাখা-বাহু মেলে
আমন্ত্রিত অতিথি—সুজনে
করে আবাহন।

নৃত্য করে ময়ূরময়ূরী
পুষ্পিত অশোক তরুতলে।

সারাক্ষণ পিককুহরণ
মুখরিত আশ্রমকানন।
কৃষ্ণসার মৃগযূথ করে বিচরণ
গাত্রে গাত্রে মাখামাখি
সোহাগ-মিলন পরস্পরে।

সারি সারি উপবিষ্ট
সুদর্শন তাপসকুমার।
ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীরা
সারাক্ষণ সেবায় নিরত তাহাদের।
সপত্র চম্পকপুষ্প
শোভাপাচ্ছে প্রার্থীদের
করাঙ্গুলি মাঝে।
চন্দন কুমকুমে সুচর্চিত প্রশস্ত ললাট।
শুধু উৎকণ্ঠার চিত্র
নয়নে আননে।
বধূবেশে সুসজ্জিতা
অপরূপা ঋষিকন্যা
সুপ্রভার হাতে বরমাল্য দোলে।

গজেন্দ্রগামিনী চলে লীলাভরে
পতি নির্বাচনে।
কার মুখ খুঁজে ফেরে
দুটি আঁখি তারা!
কার তরে বুকে ওঠে হাহাকার ধ্বনি!
সপ্ত সাগরের ঢেউ!
সারি সারি মুখগুলি
উজ্জ্বল সুন্দর, দীপ্ত প্রভাময়।
নিত্য হোমাগ্নিতে শুদ্ধ
লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণগুলি।
একে একে দৃষ্টি থেকে
সরে যেতে থাকে
তৃষাতপ্ত তাপসেরা।
এক বুক কান্না নিয়ে
সুপ্রভা প্রবেশ করে
নদীতীরে অরণ্যকুটিরে।
লুটায় শয্যার পরে,
হৃদয় বিক্ষত তার স্মৃতির দংশনে।

স্বয়ম্বর সভা মাঝে যেতে হবে ফিরে
প্রত্যাবর্তনের পথে
নির্বাচিত হবে একজন,
তারই কণ্ঠে পরাবে সে মালা।
মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি
সে মুহূর্তে ভরাবে ভুবন।
নব তাপসের হাত ধরে
চলে যেতে হবে তাকে
নতুন আশ্রমে।
স্মৃতির বিশুষ্ক পাতাগুলো
শীতের অঙ্গণে
হাহাকার ধ্বনি তুলে
লুটোপুটি খাবে।

শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই
ভেসে এলো তরতাজা বকুলসুবাস
বাতায়ন পথে।
চকিতে ফেরাল আঁখি
স্বয়ম্বরা ঋষিকন্যা।
বিস্ময়ে বিহ্বল!
এসেছে সে ফিরে
বৎসরান্তে হিমবন্ত পরিক্রমা শেষে।

এনেছে সে আশ্রম কুটির থেকে
তার বড় প্রিয়
দীর্ঘ পুষ্ট প্রলম্বিত
বকুলের মালা।
অশ্রুতে অস্বচ্ছদৃষ্টি,
সুপ্রভার ব্যাকুল আহ্বান,
কোথা তুমি প্রিয়তম
আমার পরমধন,
কাছে এসো, নাও এই
বরমাল্যখানি।
তোমার বকুলমাল্যখানি
হোক বিনিময়।

সভাস্থলে এলো দুজনায়
অপূর্ব যুগলমূর্তি।
সচকিত স্বয়ম্বর সভা,
আনন্দের ধ্বনি ওঠে
সভা মধ্যস্থলে।
সমবেত মুনিকুমারেরা
হস্তধৃত মাল্য দিয়ে
বরবধূ করল বরণ।
দ্বেষশূন্য দৃষ্টি মেলে
প্রত্যক্ষ করল সেই যুগলমিলন।
নমস্কার সম্ভাষণ আলিঙ্গন শেষে
ফিরে গেল তাপসেরা
নিজ নিজ আশ্রম কুটিরে।

মহর্ষি ছিলেন অপেক্ষায়
শূন্য হলে সভাস্থল
আবির্ভূত হলেন সহসা।
কলেবর কম্পান্বিত
তীব্র অপমানে,
রক্তবর্ণ চক্ষু যেন অগ্নির গোলক।

(যুগলে অগ্রসর হয়ে প্রণতি নিবেদন)
অষ্টাবক্র বলে মুনিবর
আশীর্বাদ করুন সন্তানে,
বর্ষকাল গন্ধর্ব নিবাসে
কাটিয়ে ফিরেছি আমি
শর্ত পূর্ণ আজ।

শর্ত ছিল, ফিরে এলে
আশীর্বাদ দেব তোমাদের,
বেশ তাই হবে—
'কামনা রহিত হও' এই আশীর্বাদ।
(শিহরিত হল নবদম্পতি। কামনা শূন্য
জীবন যে অকল্পনীয়। সামান্যসময়
পরামর্শের পর অষ্টাবক্র)
প্রভু আশীর্বাদ শিরোধার্য,
আর এক প্রার্থনা,
কথা ছিল বর চেয়ে নেব।

বর দিতে প্রতিশ্রুত আমি,
কি বর প্রত্যাশা বল?

'মৃত্যু যেন এইক্ষণে
হয় আমাদের, এই বর চাই।'

স্তম্ভিত বদান্য ঋষি
ভূলুণ্ঠিত সর্ব অহংকার।
উৎসারিত হৃদয়ের
স্নেহসুধাধারা।
বক্ষে চেপে দুজনায়
মহর্ষি বলেন,
এতদিনে মহাভ্রম হল নিরসন।
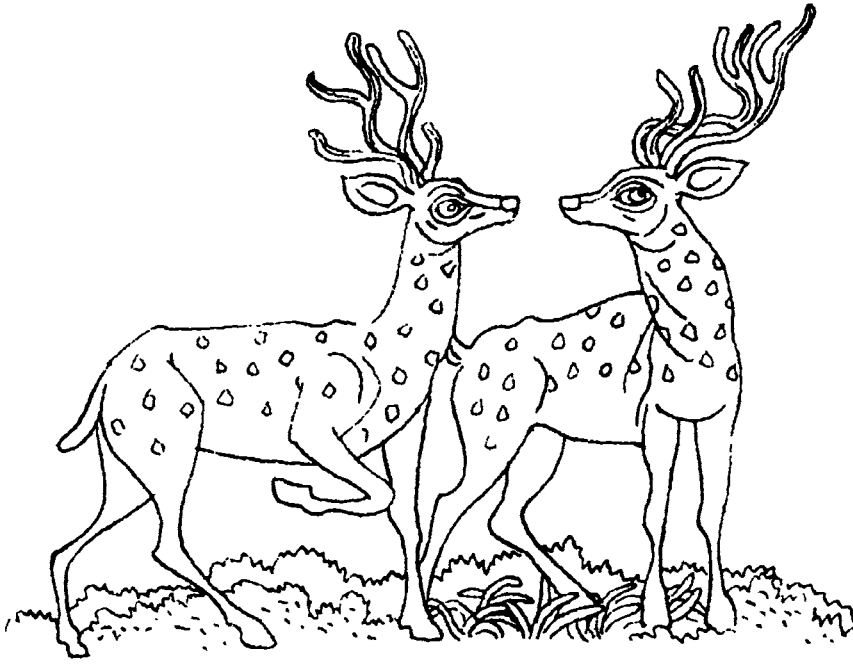
সৃষ্টির আদিতে আছে কামনার বীজ,
সেই বীজ সৃষ্টি করে মহামহীরুহ।
পত্রপুষ্প ফলে পূর্ণ প্রাণ-তরুবর।
এই রস রসায়ন স্রষ্টার নিদান।
জীবকুল সঞ্জীবিত এই মহারসে।
চল কন্যা, চল বৎস
দিয়ে আসি তোমাদের নতুন সংসারে।